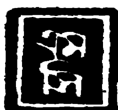
ভালোবাসা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ



মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভালোবাসা খুব পুরনো। আবার খুব নতুনও। কিন্তু ভালোবাসা কী? শোনা যায়, মিস্টিক সন্তদের ঈশ্বরদর্শনের অনুভূতি নাকি অনির্বচনীয়। ঈশ্বর বিশ্বাসী না হয়েও এর একটা ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। মানুষের শরীর কাটাছেঁড়া করে কি মন খুঁজে মেলে? অথচ মনের আশ্রয় তো শরীরই।

শরীরে মন আছে। মনে আছে ভালোবাসার বোধ, যা ওইরকম অনির্বচনীয়। এই সংকলনের উপাখ্যান-গুলিতে সেই আশ্চর্য এবং অনির্বচনীয় বোধকে নানা দিক থেকে অন্বেষণের একটা চেষ্টা আছে মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

ভালোবাসা সিরিজের অন্যান্য গ্রন্থ

সমরেশ মজুমদারের
ভালোবাসা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
ভালোবাসা

প্রফুল্ল রায়ের
ভালোবাসা

শেখর বসুর
ভালোবাসা

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের
অন্যান্য গ্রন্থ

নগ্ন নির্জন হাত
বিষাক্ত সুন্দর ফুল
বসন্ত রাতের ঝড়

অজয় দাশগুপ্ত

বন্ধুবরেষু



উপন্যাস

বনশ্রী নেহাত তাস নিয়ে খেলা করার মতো ভিউফাইণ্ডারে চোখ রেখে এইসব ভাঙাচোরা ঐতিহাসিক স্থাপত্যের টুকরো-টুকরো দৃশ্য দেখছিল। সেই সময় তার চোখে পড়ল বিশাল দেউড়ির মাথায় বটের চারা মুড়িয়ে খাচ্ছে নান্নু মিয়ার সেই দুর্ধর্ষ খাসিটা, যার নাম কেরামত খাঁ এবং একটা হাঁটু তুলে ডুয়েল লড়তে ডাকলে যে সুভোগ্য খাবার ফেলেও সাড়া দিতে কসুর করবে না। তার ফলে হেমন্তও যেন একটা করার মতো কাজ পেয়ে গেছে এখানে এসে। ওকে দেখলেই সে ডুয়েল লড়তে ডাকবে। টাটু ঘোড়ার মতো অতিকায় খাসিটার মস্করা সে টের পেয়ে গেছে। কেরামত খাঁর ঢু মারার কেরামতি অজ-সম্প্রদায়-সুলভ।' সেই যে সংস্কৃত শ্লোক আছে 'অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে···।' ব্যাপারটা সত্যি সত্যি লঘুক্রিয়ায় না দাঁড়ালে হেমন্তকে একটা হাঁটু গুনাগারি দিতে হত।

বনশ্রী বলে উঠল—ইস্! তোমার কেরামত খাঁ কোথায় উঠেছে! যদি পড়ে যায়!

হেমন্ত ব্যাপারটা দেখেই হন্তদন্ত হয়ে বলল—সর্বনাশ! ওখানে উঠল কী ভাবে?

বনশ্রী ভিউফাইণ্ডারে চোখ রেখেই বলল—শোন। এখন কিন্তু ওকে হাঁটু দেখিও না। দেখলেই ঝাঁপ দেবে হয়তো! ইস্! কার্নিসে কীভাবে পা রেখেছে—চুন-বালি ঝরে পড়ছে! ধসে গেলেই ব্যস্!

—ঠিকই বলেছ। বলে চিন্তিত হেমন্ত নান্নু মিয়াকে খুঁজল। লোকটা একটু আগে খাকি হাফপেণ্টুল পরে ওপাশে পীরের দরগায় শুকনো পাতা ঝাঁট দিচ্ছিল। এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। হেমন্ত বলল—ছাগলটাগলের বুদ্ধিসুদ্ধি শুনেছি ভীষণ কম। অজবুদ্ধি বলে একটা কথা আছে জানো নিশ্চয়। তবে বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচুতে ওঠাটা ওদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। পাহাড়ী এলাকায়···

তার কথা থেমে গেল একটা ছেলের হাসিতে। নান্নু মিয়ারই সেই ধাড়িবাজ খচ্চর ছেলেটা। সবসময় যাকে বাবার তাড়া খেয়ে ভাগতে হয়। আর কী বিশ্রী গালাগালি চলে দুজনে! ছেলেটা আবার ফক্কড়ও কম নয়। এই বয়সেই পেকে লাল। জানলার ফুটোয় চোখ রেখে সায়েব-মেমসায়েবের ব্যাপার স্যাপার দেখতে তার খুবই আগ্রহ। এবং এই দোষটার জন্যেই হেমন্ত তাকে দেখলেই চোখ পাকিয়ে তাড়া করে।

হেমন্ত ধমক দিল—আবার এসেছিস তুই? ভাগ্ এখান থেকে।

ছেলেটার মুখে দুষ্টু হাসি। কয়েক পা পিছিয়ে গেল। বনশ্রী বলল—এই! দেখছিস তোদের খাঁ-সায়েব কোথায় উঠেছে? নামিয়ে আন্ গে না!

—গিরবে না। ছেলেটা খাসিটাকে দেখতে দেখতে বলল। মেমসাব, ও প্যালেসের উপরে ভি চড়ে যায়। ওই দেখছেন, ঘাসের জঙ্গল হয়েছে প্যালেসের উপ্‌রে—ও ঘাস খেতে ভি যায়। বহুৎ তাকতওয়ালা জানোয়ার!

হেমন্ত মুখ ভেংচে বলল—খুব হয়েছে! তুই ভাগ্‌ তো এখান থেকে!

খালি নোংরা গা, পরনে ছেঁড়া হাফ পেন্টুল, নাম্নু মিয়ার ছেলেটা হঠাৎ নাগরিক অধিকার তুলে রুখে দাঁড়াল।—এ তো গবরমেন্টের জায়গা আছে, সাব। আপনি ঘুমবেন, হামি ভি ঘুমব।

হেমন্ত রেগে থাপ্পড় তুলেছিল। বনশ্রী বলল—আঃ! কী ছেলেমানুষী করছ ওর সঙ্গে! চলো, আমরা ওদিকে কোথাও যাই।

বনশ্রী পা বাড়াল। তারপর ফের ঘুরে বলল—তোর নাম কী রে?

হেমন্ত বলল—ওকে আস্কারা দিও না। আরও পেয়ে বসবে।

বনশ্রী গ্রাহ্য না করে একটু হাসল। তারপর বলল—এই! কী নাম তোর?

নাম্নু মিয়ার ছেলে গম্ভীরমুখে জবাব দিল—হামি ডিব্বু আছি, মেমসাব।

—ডিব্বু! বাঃ, ফাইন! বনশ্রী হাল্কা চালে বলল। তা শ্রীমান ডিব্বু, ওদিকটায় ওগুলো কী দেখা যাচ্ছে? ওই যে অনেকগুলো গম্বুজ?

—বারা গম্বুজকা মসজিদ আছে।

—যেতে দেবে তো আমাদের?

—যাইয়ে না।···মুহূর্তে ডিব্বুর মুখে সেই দুষ্টু হাসিটা একবার ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল। ইহা বড়া এক্‌ শের্‌ হ্যায়। খোদার শের আছে মেমসাব।

হেমন্ত গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বনশ্রী মাঝে মাঝে এরকম হ্যাংলামি করে। হ্যাংলামি ছাড়া আর কী? গোড়া থেকেই বোঝা গেছে, ছোঁড়াটা ডেঁপো শুধু নয়—হয়তো চোরও। তাকে আস্কারা দেওয়ার কোন মানে হয়? অথচ বনশ্রী যেন হেমন্তকে দেখিয়ে-দেখিয়ে ঠিক তাই করছে। আরও অনেক ব্যাপারে বনশ্রীর এই অদ্ভুত আচরণ কাল বিকেল থেকে তার চোখে পড়ছে। হেমন্ত যা বলছে, তার উল্টো করার ঝোঁক পেয়ে বসেছে যেন। অথবা এখানে অনেকটা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। তাই।

বারো গম্বুজের মসজিদে খোদার বাঘ আছে শুনে বনশ্রী হাসতে শুরু করেছিল। হেমন্ত চাপা গলায় বিরক্তি প্রকাশ করল—আঃ! কী হচ্ছে! চলে এস না।

বনশ্রী শুনেও শুনল না। বলল—হ্যাঁরে ডিব্বু, ভূতও নিশ্চয় আছে?

ডিব্বু মাথা দোলাল। ঠোঁটের কোনায় সেই দুষ্টুমিটা ভাঁজ হয়ে ফুটেছে।—জী হাঁ মেমসাব। জিন আছে। একদম সাদা জিন। টুরিস্ট সায়েব লোগোঁকা মাফিক স্রিফ্‌ সাদা-সফেদ।···মেহী মেমসাব, আপনার ওই সায়েব তো বাংগালী বাবু আছে। হামারভি চামড়া উন্‌হির চাইতে সাদা আছে, দেখে লিন। টুরিস্ট সায়েব লোকদের চামড়া হামার চাইতে ভি সফেদ, জী হাঁ।

বনশ্রী হাসির চোটে নুয়ে পড়ছিল। ঘুরে পা বাড়িয়ে বলল—কী ভীষণ দুষ্টু ছেলে রে বাবা! শুনলে—কী বলল? এতটুকু ছেলে!

হেমন্ত জবাব দিল না। বনশ্রী এগিয়ে গিয়ে ফিসফিসে ওর হাত ধরতেই পিছন থেকে ডিম্বু চেঁচিয়ে উঠল—আচ্ছাসে পাকাড়কে লে যাইয়ে মেমসাব! ভাগ্ যায়েগা!

বলেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নান্নু মিয়ার চেরা গলার চীৎকার শোনা গেল—এ্যাই হারামী! এ্যাই শালালোগ! মারকে মু তোড় দেগা! কাঁহা যাতা বে? ইধার আ যা উল্লুককা বেটা উল্লুক কাঁহেকা!

ডিম্বুও চিলচ্যাঁচানিতে সাড়া দিল—চোওপ বে বুঢ্ঢা খবিস! খালি ফাড়তা ঔর ফাড়তা! এক ঢেলাসে আঁখ অন্ধা কর্ দেগা শালাকো!

বনশ্রী বলল—ওদের বাবা-ছেলের সম্পর্কটা বড্ড স্ট্রেঞ্জ। তাই না? দুজনেই সমান খিস্তি চালায়। ওদের লাইফটা কেমন যেন!

হেমন্ত হাঁটতে হাঁটতে বলল—তোমার পছন্দসই কি?

—কী পছন্দসই?

—ওদের লাইফটা। ওদের খিস্তি।

বনশ্রীর হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল হেমন্ত। বনশ্রী ফের ওর একটা হাত নিয়ে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলল—ভ্যাট! আমি কি তাই বলছি?

—কী বলছ তাহলে?

বনশ্রী গ্রাহ্যই করল না কিছু। বলল—জানো? আমার বড্ড অদ্ভুত লেগেছে—ওরা অত নোংরা গালাগালি করে, ঢিল ছোঁড়েও দেখেছি পরস্পর, অথচ গঙ্গার ঘাটে দেখেছি বুড়ো ছেলেটার গায়ে সাবান জল দিচ্ছে। মুখোমুখি বসে দিব্যি খাচ্ছে। আসলে আমরা যেটা এ্যাবনর্মাল ভাবছি, ওদের যেন সেইটাই নর্মাল।

হেমন্ত ভাবছিল, বনশ্রীর এসব আচরণকে সে এ্যাবনর্মাল ভাবছে—অথচ এই হয়তো ওর নর্মাল ব্যাপার। কারণ, সিরিয়াস আলোচনার ভঙ্গীতে এসব কথা বলছে বনশ্রী। চমৎকার সারল্য ওর বাক্যে এবং চোখেমুখে ফুটে রয়েছে। খুব সহজে বনশ্রী যে কোন ব্যাপারে রিঅ্যাক্ট করে না, তা হেমন্ত বরাবর দেখেছে।

এ কথা ভেবেই আপাতত হেমন্তের ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে গেল। সে হাসল।—এখানে দেখছি সব কিছুই এ্যাবনর্মাল! ব্যাটা কেরামত খাঁয়ের কেরামতিটাও।

বনশ্রী ওর হাত ছেড়ে হঠাৎ দাঁড়াল। বাঁদিকে গঙ্গা—এ জেলায় যার নাম ভাগীরথী, এই চৈত্রেও কুলেকুলে ভরা, ডানদিকে প্রশস্ত ফাঁকা চত্বর—যার ঠিক মধ্যিখানে একটা বিশাল কামান উল্টোদিকে অর্থাৎ সেই দেউড়ির দিকে মুখ করে রয়েছে। ওটার পিছনে ঘিঞ্জি বাজার। বনশ্রী আবার ভিউফাইণ্ডারটা চোখে রেখে ঘুরে-ঘুরে দেখতে-দেখতে সামনে দূরের গম্বুজগুলোতে দৃষ্টি ফেলল। গম্বুজগুলোতে ফাটল ধরেছে এবং ঘাস গজিয়ে রয়েছে। তার আশেপাশে ঘন

গাছগুলিও চোখে পড়ছে। এক কোণে একটা উঁচু মিনার দেখা যাচ্ছে। মিনারে দুজন যুবক বসে সিগারেট টানছে। বনশ্রীর দিকে তারা হাত নাড়ছে, হেমন্ত টের পাচ্ছে না। বনশ্রী পাচ্ছে। কারণ তার চোখে এই দূরবীন। বনশ্রী নিঃশব্দে হাসল।

তাদের সামনে টানা ধ্বংসস্তূপ। একখানে সরু একফালি পথ করা হয়েছে। সেই পথের শুরুতে একটা ঝাঁকড়া যজ্ঞডুমুর গাছ। হেমন্ত ছায়া পেয়েই দাঁড়াল। খুব একটা গরম পড়েনি। কিন্তু রোদ বেশ উজ্জ্বল। সে সিগারেট বের করে বলল —কী বলছিল যেন ছোঁড়াটা? হাত ছাড়বেন না মেমসাব—ভেগে যাবে, না কী যেন?

বনশ্রী দেখল, হেমন্ত হাসছে। বনশ্রী বলল—ও বলতে চেয়েছিল, ভূত বা বাঘের ভয় আছে। তাই পাছে তুমি আমায় একা ফেলে রেখে পালিয়ে যাও···

হেমন্ত ওর কাঁধে হাত রেখে বলল—তুমিও তাই ভাবো নাকি?

বনশ্রী ওর চোখে-চোখে তাকিয়ে বলল—সিচুয়েশান এলে প্রমাণ হবে।

—তার মানে আমায় তুমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না?

—কেন বিশ্বাস করতে পারছি না?

—পারছ না। হেমন্ত কাঁধ থেকে হাত তুলে নিয়ে যজ্ঞডুমুরের একটা পাতা ছিঁড়ল। আঠা ঝরতে থাকল। বনশ্রী তাই দেখে ওকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর হেমন্ত ফের বলল—আমার যোগ্যতা সম্পর্কে তুমি এখনও ডিসিশান নাওনি!

—তাহলে তোমার সঙ্গে এলুম কেন?

হেমন্ত ওর মুখের দিকে সোজা তাকাল না, কোন আক্রমণ বা ক্ষোভ নেই। খুব সহজ আর শান্ত একটা প্রশ্ন বনশ্রীর। হেমন্ত কথাটার জবাব দিতে পারল না সরাসরি। শুধু বলল—হয়তো জাস্ট সাইট-সিন-এ এসেছো! যেভাবে টুরিস্টরা আসে।

বনশ্রী বলল—অমন করে বোলো না। শুনতে বিশ্রী লাগছে। তারপর হাসল সে।···তারও বেশি খানিকটা গড়িয়েছে নয় কি?

—যেমন?

—ছদ্মবেশ পরে এসেছি।

হেমন্ত ভেতরে চমকাল সঙ্গে সঙ্গে। তার চোখে মুহূর্তে ঝলসে উঠল বনশ্রীর সিঁথির এক চিলতে সতর্ক সিঁদুর। অপ্রস্তুত হেসে বলল—ওটা সামান্য ব্যাপার।

—আমার কাছে অসামান্য হতেও পারে। আমি মেয়ে।

বনশ্রীর সেই সহজ আর শান্ত ভাবটা এই বুঝি চিড় খাচ্ছে এতক্ষণে, হেমন্ত হো-হো করে হেসে উঠল।—আহা! জাস্ট একটা কথা। তাছাড়া ধরো, তোমায় শাঁখাটাখা পরতেও ইনসিস্ট করিনি—কিংবা তুমি পরো নি। পরলে অবিশ্যি সত্যি

ব্যাপারটা অনেক দূরই গড়াত।

বনশ্রী নিষ্পলক তাকিয়ে বলল—আজকাল শাঁখা অনেকে পরে না। কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। কিন্তু আমরা কি সত্যি নিছক সাইট-সিন-এ এসেছি?

আবার হেমন্ত ওর কাঁধে হাত রেখে বলল—তুমি সিরিয়াস হয়ে উঠছো। ছেড়ে দাও। আসার শুরু থেকে এই দুটো দিন তো বেশ নরম্যাল ছিল সব। সেইজন্যেই বলেছিলুম, এখানে সব এ্যাবনর্ম্যাল। চলো ঘোরা যাক।

হেমন্ত টের পাচ্ছিল উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না—দুজনের মধ্যে একটা দুমুখো কাঁটা রয়ে গেছে। একটুতেই দুজনকে একই সঙ্গে খোঁজা লাগছে। কলকাতায় এই কাঁটাটা টের পাওয়া যায় নি। তার চেয়েও বড় কথা, সেখানে চারপাশে যেন বড্ড খবরদারি ছিল। ভিড় ছিল। অনেক রকম সমস্যা ছিল। এখানে সে-সব কিছু নেই। একেবারে স্বাধীনতা। কানায় কানায় পূর্ণ স্বাধীনতা স্রোত। এই স্রোতে ভাসবার জন্যে ভিড়ের মানুষ হা পিত্যেশ করে। অথচ ভাসবার সুযোগ পেলে দেখে, ব্যাপারটা মোটেই তেমন সহজ নয়।

হেমন্তের মতো মানুষের কাছে তো একেবারেই সহজ ছিল না। চল্লিশ পেরোলে আর এ্যাডভেঞ্চারের ঝুঁকি নেওয়া নিরাপদ নয়। তাছাড়া হেমন্ত স্বভাবে ভীরু। সে সাবধানে চারদিক দেখেশুনে হাঁটতে অভ্যস্ত। দাড়ি কেটে একটু স্নো গালে ঘষে হঠাৎ দ্বিধায় পড়ে গেছে, মুখটা খুব বেশি উজ্জ্বল দেখালে হয়তো আপিসের লোকে তার দিকে বারেবারে তাকাবে! অতএব পরে রুমালে ঘষে তুলে ফেলতে চেষ্টা করেছে। আর লাম্পট্য—মনে মনে সব ভীতু পুরুষের মতোই সে লাম্পট্যে তুখোড়। কিন্তু কোন অনাত্মীয় যুবতী মেয়ের দিকে সামনাসামনি তাকিয়ে সে কথাই বলতে পারে না।

এসব কারণে হয়তো মনের ভেতর দিনে দিনে আগুন জমে গিয়েছিল এবং সব পুরুষ মানুষই সে আগুন পরিণত বয়সে অন্য কাজে ব্যবহার করে থাকে। কেউ ধর্মকর্মে, কেউ রাজনীতিতে, মিছিলে, দাবি-দাওয়ায়। হয়তো বা কেউ গোপনে বেশ্যাবাড়িও যায়। হেমন্ত কিছুই পারছিল না। তাই বলা যায়, বনশ্রীকে কুড়িয়ে না পেলে বেচারা জমানো আগুন নিয়ে মুশকিলেই পড়ে যেত।

হেমন্ত আড়ালে একটু হাসল। কুড়িয়ে পাওয়া ছাড়া আর কী? এ তো তার প্রেমের বয়স নয়। গম্ভীর মুখে দিনকাল কাটাতে কাটাতে হঠাৎ পায়ের কাছ থেকে কার পড়ে যাওয়া টাকা তুলে নেওয়ার ব্যাপার।

একটা ভাঙ্গা খিলানের দিকে আনমনে তাকিয়ে হেমন্ত সেই দিনটার কথা দ্রুত ভেবে নিল। যে দিনের প্রত্যেকটি সেকেন্ড তার মনে আছে। আপিসে কোনার দিকে টেবিলে হেমন্ত বসে। পিছনে একটা জানলা আছে। তার সাটার সব সময় বন্ধ থাকে। কারণ, নিচে তেমাথা রাস্তা এবং ট্রাফিক পুলিশ প্রায়ই আনমনা হয়ে যায়। তার ফলে একসঙ্গে গাড়িগুলো তিতিবিরক্ত হয়ে যাচ্ছেতাই চ্যাঁচামেচি শুরু

করে। দু-চার মিনিট অন্তর এই উপদ্রব। শব্দে হেমন্তের এলার্জি আছে। বেশি আলোও সে সইতে পারে না। অথচ পৃথিবী হেমন্তের এক্তিয়ারে চলে না।

সে একজন সিনিয়ার বিলক্লার্ক। রাজ্যের লোকের টাকাকড়ি পাওনা থাকে সরকারের কাছে। হেমন্ত নিছক 'গ্র্যান্ট এ্যান্ড সাবসিডি'র ব্যাপারটা ডিল করে। এসব হচ্ছে সরকারের করুণার অবদান। তাই তার কাছে যারা আসে, তাদের মুখে কাকুতিমিনতির ভাবটা প্রচণ্ড রকমের। হেমন্ত অবশ্য কড়া কথা পারতপক্ষে বলে না কাউকে। কিন্তু 'শান্তিপথ' আশ্রম নামে শহরতলীর একটা প্রতিষ্ঠানের গ্রান্ট-ইন-এডের একটা বিল নিয়ে একদিন তাকে কড়া কথা বলতে হয়েছিল। বলেই বিস্ময়করভাবে একটা কড়া কথা শুনে বসল। হেমন্ত অবাক।

—এমনভাবে বলছেন, যেন টাকাটা নিজের পকেট থেকেই দিতে হচ্ছে। আশ্চর্য তো!

হেমন্ত তাকিয়ে ছিল কয়েক সেকেণ্ড। সেই প্রথম বনশ্রীকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেছিল সে। শান্তিপথ আশ্রমের সুনাম আছে। স্বয়ং বিভাগীয় কর্তা সে আশ্রমের সর্বাধ্যক্ষের মহাভক্ত। তাই বরাবর আশ্রমের বিলের টাকা শিগগির পেমেণ্টের জন্যে পাস করে দিতে হয়। এবার বিলেই সামান্য একটু গণ্ডগোল ছিল। সেটুকু শুধরে নিয়ে পরের দিন আসতে বলেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আবার একটা নতুন ভুল ধরা পড়েছিল।

বনশ্রী প্রথম দিন আসে নি। ওর সঙ্গের দুটি মেয়ে এসেছিল। দ্বিতীয় দিনের ভুল নিয়ে বিরক্তি দেখালে পাল্টা জবাব এল এবং হেমন্ত আবিষ্কার করল বনশ্রীকে।

হেমন্তের কি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়া গোছের ব্যাপার ঘটেছিল? হেমন্ত-আরও কড়া কিছু বলবে কী? উল্টে হেসে ফেলেছিল। আসলে বনশ্রীর বয়স ওর সঙ্গিনীদের চেয়ে কম এবং তার কথায় বাচ্চা মেয়ের ঝাঁঝ ছিল। দুটো চোখে সুদূর-প্রসারী মায়াও যেন ছিল। বনশ্রীর চোখে সত্যি কী একটা আছে, বরাবর লক্ষ্য করেছে হেমন্ত।

হেমন্ত হেসে ফেলেছিল।—টাকা নিজের পকেট থেকে দেব না এবং আপনারাও নিজের পকেটের জন্যে নেবেন না। আমরা দুপক্ষই নিমিত্তমাত্র। সেই হয়েছে মুশকিল।

বনশ্রীর সঙ্গিনীরা হকচকিয়ে গিয়েছিল। বিলক্লার্কের হাসি দেখে তারা তখন আশ্বস্ত হয়েছে এবং বনশ্রীর পাঁজরে খোঁচা মেরেছে একজন। বনশ্রী বলেছিল—কিসের মুশকিল?

—পরের টাকা বলে। হেমন্ত সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলেছিল।

বনশ্রী ঠোঁটের কোনা কামড়ে বলেছিল—পরের টাকা কোথায়? এ থেকে আমাদেরই মাইনে দেওয়া হবে। এ তো স্কুলের গ্র্যাণ্ট।

হেমন্ত তক্ষুনি সহানুভূতি দেখাবার ভঙ্গীতে নড়ে উঠেছিল—আহা, তা

বলবেন তো !

ঝটপট বনশ্রীর জবাব।—বলব কী? বিলেই লেখা আছে। রিমার্ক কলাম দেখুন না।

—সরি। হেমন্ত ফের হেসেছিল। তারপর ঘড়ি দেখে বলেছিল—এবেলা তো আর পেমেণ্ট সম্ভব নয়। সই হতে-হতে ক্যাশ বন্ধ হয়ে যাবে। প্লীজ, আগামী কাল ফার্স্ট আওয়ারে আসুন। কথা দিচ্ছি, হয়ে যাবে।

বনশ্রী যেন জয়ের গর্ব নিয়ে ওর সঙ্গিনীর দিকে তাকাল। হেমন্ত ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল। যুবতীটি অবিবাহিতা। দেখতে একটু রোগা হলেও স্বাস্থ্যবতী বলা যায়—অর্থাৎ আজকাল যাকে বলা হয় স্লিম ফিগার। ডিমালো মুখে নাকের রেখাটা জোরালো এবং নিচের ঠোঁট একটু পুরু। ভুরু ও চোখ মিলে একটা তীব্রতা আছে টর্চের আলোর মতো। সেদিনের মতো শেষবার চোখে চোখ পড়তেই হেমন্তের বুকের ভেতর ধক্ করে উঠেছিল।—চলি বলে বনশ্রী ঘুরে পা বাড়ালেও হেমন্তের দৃষ্টি সরল না। অনেক টেবিল আর ফাইলের পাহাড় বনশ্রীর দুপাশে—সে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং তখনই হেমন্তের মনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে এসেছিল, যেন পাহাড়ের উপত্যকায় একলা হেঁটে যাচ্ছে একটি যুবতী। হেমন্তকে অ্যাফিসের বাকি দিনটা সেই দৃশ্যের ভুতে পেয়ে রইল।···

পরদিন হেমন্ত একটু সেজেগুজেই আপিসে এসেছিল। বনশ্রীরা কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে দশটায় এল। ওদের চা খাওয়াতে ভোলে নি হেমন্ত। পেমেণ্ট হয়ে যায় সওয়া এগারোটাতে। চেক নিয়ে ওরা যখন চলে যাচ্ছে, সহৃদয় সিনিয়ার বিলক্লার্ক বারান্দায় পেছন থেকে ডেকে বলেছিল—পেয়ে গেছেন তো?

বনশ্রী ঘাড় নেড়ে একটু হেসেছিল।—অনেক ধন্যবাদ।

—কিন্তু পিছু না ডাকলে ধন্যবাদটা পেতুম না !

বনশ্রী একটু বিব্রত হয়েছিল নিশ্চয়। কিন্তু তক্ষুনি স্মার্ট হয়ে বলেছিল—আবার তো আসতে হবে। তখন বরং ডবল থ্যাংকস্ দিয়ে যেতুম।

হেমন্ত করিডোরে দাঁড়িয়েছিল সেদিন—অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক। ভাবছিল, কী যেন আছে ওর মধ্যে, কিছুতেই ভুলতে দেয় না।···

এভাবেই আলাপ বনশ্রীর সঙ্গে হেমন্তের। বস্তুত, পৃথিবীতে অসংখ্য বড়-বড় ঘটনা সামান্য তুচ্ছ একটা উপলক্ষ থেকেই তো সৃষ্টি হয়।

কিছুদিন পরে আবার শান্তিপথ আশ্রমের অন্য একটা বিলের ব্যাপারে বনশ্রী এসেছিল। সেবার একা এসেছিল। হেমন্ত বুঝতে পেরেছিল, বনশ্রী কেন একা এসেছে। বনশ্রীর সঙ্গে তার একটুখানি আলাপ—এবং পুরুষমানুষ হলেও যে-কেউ ওই আলাপটুকুর অছিলায় বিলক্লার্কের কাছে কাজ পেতে আসার সুযোগ ছাড়বে না।

সেবার হেমন্ত ঝুঁকি নিয়েছিল। বিল সই করাতে দেরি ছিল। বড়সায়েব তখন

আছেন কনফারেন্স রুমে। ঘড়ি দেখে হেমন্ত বলেছিল—ততক্ষণ বরং চা খান। আমারও টিফিন করার ব্যাপার আছে। ক্যান্টিনে যাব। আপত্তি না থাকলে…

বনশ্রী শান্তভাবে বলেছিল—কতক্ষণ দেরি হতে পারে?

—তা ঘণ্টাখানেক তো বটেই। ততক্ষণ চুপচাপ একা এখানে বসে থাকার চেয়ে…

পুরো কথা বলতে হেমন্তের পক্ষে দ্বিধা আছে। তার বুক কাঁপছিল রীতিমতো। এ তো দস্তুরমতো রিস্ক নেওয়া।

কিন্তু বনশ্রী উঠেছিল—তাই চলুন।

ঘর থেকে বেরোবার সময় হেমন্তের সাহস ছিল না পিছু ফিরে সহকর্মীদের দিকে একবার তাকায়। করিডোরে পাশাপাশি যেতে-যেতে হেমন্ত বলেছিল—আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানি না।

বনশ্রী নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে হেমন্ত নিজের নামটাও শুনিয়ে ছেড়েছিল। তারপর—আপনার নামটা ভারি সুন্দর তো! রেয়ার নেম! বনশ্রী! বাঃ!

তারপর ক্যান্টিনে ঢুকতে গিয়ে—আমার নামটা কিন্তু ভীষণ কমন। আর হেমন্ত বললেই কেমন একটা ডাল সিজনের ব্যাপার মনে হয় না?

বনশ্রী বলেছিল—কেন ডাল সিজন?

—শরৎ এবং শীতের মাঝামাঝি আর কী! এবং হেমন্ত নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে খুন।

কোনার দিকে নিরালা টেবিল খুঁজে দুজনে বসেছিল। তারপর অনেক এলোমেলো কথাবার্তা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। হেমন্তের মনে আছে সব। এতদিন পরে ভাবতে অবাক লাগে, হঠাৎ কী অসাধারণ সাহস হেমন্তের মধ্যে এসে গিয়েছিল।

—শান্তিপথে কদ্দিন আছেন? হেমন্ত জিগ্যেস করেছিল।

—কদ্দিন আছি মানে? বনশ্রী ঠোঁটের কোনায় হেসে বলেছিল। আপনি নিশ্চয় আমাকে অনাথ-টনাথ ভাবছেন?

—না, না। তা কেন? বলছি, আপনার চাকরির কথা।

—হ্যাঁ, চাকরি। সে প্রায় বছরখানেক হয়ে গেল।

—নাম শুনে তো মনে হয় যথেষ্ট শান্তি-টান্তি আছে ওখানে। হেমন্ত রসিকতা করেছিল। ভালই আছেন—প্রচুর শান্তি!

—গিয়ে দেখে আসতে পারেন শান্তির বহরটা। হুঁ, শান্তি না ছাই!

—সে কী! সাধুসন্তরা আছেন যেখানে…

বাধা দিয়ে বনশ্রী বলেছিল—মোটেও না। আপনি আশ্রম শুনেই বুঝি সাধুসন্তের কথা ভাবছেন? মোটেও না।

—তবে?

—এক ভদ্রলোকের অনেক জমিটমি ছিল। সরকার দখল করে নেয় পাছে, তাই

একটা ফিকির করে আশ্রম নাম দেওয়া হয়েছিল। কুটিরশিল্প, ইস্কুল এসব ব্যাপার। সেলাইয়ের কাজও আছে। আসলে কী জানেন? ভদ্রলোক রিটায়ার্ড পলিটিসিয়ান ছিলেন।

—ছিলেন মানে? এখন নেই? বিলে সই করেন, তাঁরা কে?

—ট্রাস্টবোর্ডের চেয়ারম্যান। সে-ভদ্রলোকও রাজনীতির পাণ্ডা। নামে আশ্রম —আড়ালে টাকা রোজগারের ফন্দি! মেম্বারদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাচ্ছে।

হেমন্ত অবাক হয়ে বলেছিল—কী সর্বনাশ!

বনশ্রী হেসে চাপা স্বরে বলেছিল—তাই বলে গভর্মেন্ট গ্র্যান্টের বিল নিয়ে গোলমাল করবেন না কিন্তু। তাতে বিপদে পড়ব আমরাই। মাইনে পাব না।

হেমন্ত একটু হেসেছিল।—না, না। আমার কী? আমার হাত দিয়ে গভর্মেন্টের লক্ষ লক্ষ টাকা কতভাবে জলে পড়ছে বুঝতে পারি। পেরেই বা আমার করার কী আছে? সমাজের বিগম্যানদের কারবার সব। আমাদের মতো সামান্য লোক নাক গলালে স্ম্যাশড্ হয়ে যাব। কী বলেন?

বনশ্রী ছোট্ট রুমালে ঠোঁট আনমনে মুছে বলেছিল—যা বললুম, ওদের বলে দেবেন তো? তাতে আর কিছু হবে না—আমার চাকরিটা যাবে।

হেমন্ত ব্যস্ত হয়ে বলেছিল—পাগল! বললুম না—আমার কী? ইয়ে—কোথায় থাকেন জিগ্যেস করা হয় নি।

—বেহালায়। আপনি?

হেমন্ত চোখ বুজে বলেছিল—শ্যামবাজারে।

মিথ্যা বলেছিল হেমন্ত। কেন হঠাৎ এই মিথ্যাটা বলেছিল, তখন টের পায় নি। এখন এতদিন বাদে মনে হয়, মানুষের জীবনে সব ঘটনার পিছনে কী যেন একটা শক্তি আছে। ওই মিথ্যেটা না বললে আজ হয়তো বনশ্রী এবং তার জীবনে এমন কিছু ঘটত না। ঘটত অন্য রকম।

তবে হেমন্ত এখনও জানে না, বনশ্রীও তার ঠিকানা সত্যি বলেছিল—না মিথ্যে! ওরা কেউ কারও ঠিকানায় গিয়ে হাজির হবে, এমন তাগিদ থাকার সুযোগ ছিল না। কারণ ক্যান্টিনে সেই আলাপের বা ঘনিষ্ঠতার পর যতবার দুজনে মেলামেশা করেছে, সবই আগেভাগে প্রোগ্রাম মতো। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পরস্পরের জন্যে অপেক্ষা করেছে ওরা। এভাবেই কত ভালবাসার খেলা চলছে আজকাল।...

তৃতীয়বার বনশ্রী এল, হেমন্ত তাকে ফের ক্যান্টিনে নিয়ে গেল, এবং পরদিন ইভনিং শোতে ছবি দেখার প্রস্তাব দিল। বনশ্রী না করে নি।

পরে বনশ্রী বলেছিল—তোমাকে প্রথম দিন দেখেই বড্ড মায়ায় পড়ে গিয়েছিলুম।

—কিসের মায়া?

—মনে হয়েছিল, ভদ্রলোকের কোথায় যেন একটা শূন্যতা-টূন্যতা আছে।

তোমার কেমন যেন ভেকাণ্ট লুক! আয়নায় দেখে নিও।

বল কী! হেমন্ত কার্জন পার্কের ঘাসে ঘষটে জ্বলন্ত সিগারেট নিবিয়ে বলেছিল। আমার ভেকাণ্ট লুক!

—কেন! এতে অবাক হবার কী আছে?

—বলো না। চাকরি চলে যাবে। সিনিয়ার বিলক্লার্কের পক্ষে ব্যাপারটা ডিসকোয়ালিফাইং! হেমন্ত খুব হেসেছিল। তারপর বলেছিল—আর তোমার চোখের ব্যাপারটা বলতে অনুমতি দাও।

—হুঁ। দিলুম।

—হরাইজেণ্টাল লুক!

—তার মানে?

—সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি আর কী? বড় করে অনেকটা জায়গা ছড়িয়ে তাকানো। নির্দিষ্ট কিছু দেখছ না। অথচ সবকিছুই দেখছ!…

এভাবেই দিনে-দিনে এগিয়ে যায় দুজনে। যখন দেখা হয় না, তখন ফোন আসে। বলা বাহুল্য, ফোন এসেছে বনশ্রীর কাছ থেকেই। হেমন্ত ওকে শান্তিপথ আশ্রমে ফোন করতে পারে না। নিষেধ ছিল।

বনশ্রীর সঙ্গে ক্যাণ্টিনে বসাটা অফিসে রটে গিয়েছিল। হেমন্ত বলত—আরে না, না! আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়া। মানে বোনটোন আর কী! এবং ফোন এলে অফিসের রাজেনবাবু চেঁচিয়ে ডাকতেন—হেমন্ত! মনে হলো তোমার সেই ডিসট্যাণ্ট রিলেশন!

সারা আপিস ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে। চল্লিশোত্তর সিনিয়ার বিলক্লার্কের মুখ লাল। কিন্তু কিছু করার নেই। সে ততদিনে মরীয়া হয়ে উঠেছে।

এক সন্ধ্যায় ভিকটোরিয়ার দিকে গিয়ে দুজনে গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিল প্রায়। ভাগ্যিস পুলিশ কাছাকাছি ছিল। বনশ্রীর মাথায় সিঁদুর নেই। একটু মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। সেটা ম্যানেজ করে হেমন্ত সেদিনই অধৈর্য হয়ে বলেছিল—বনশ্রী! এভাবে কোন মানে হয় না। আমরা অন্যায় তো কিছু করছি না! কলকাতার অবস্থা দিনেদিনে যা হচ্ছে, এরপর বিয়ে করা বউ নিয়েও কোথাও বসা যাবে না। ধরো, তুমি যদি বউ হতে—একই ব্যাপার ঘটত। তাই জাস্ট এ প্রপোজাল…

বনশ্রী আনমনে বলেছিল—কী?

—অবশ্য তোমার আপত্তি থাকলে আলাদা কথা।

—আহা, শুনিই না।

—কোথাও বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে?

স্পষ্ট জবাব দিতে বনশ্রীর কিছুটা দেরি হয়েছিল। হেমন্ত বলেছিল—যাবে না, তাই না? অবশ্য আমার এটা আশা করাই ভুল।

বনশ্রী আস্তে বলেছিল—যেখানেই যাবো, একই প্রব্লেম হবে।

—হুঁ। আমরা যেহেতু এখনও বিয়ে করিনি, হানিমুনের প্রশ্ন ওঠে না !···বলে হেমন্ত বোকাবোকা মুখে একচোট হেসেছিল।

—কিন্তু বেড়াতে কোথায় যাবে শুনি ?

—তুমি রাজী হলে সিলেক্ট করা যাবে। একথাটা বলার পর হেমন্তের বুক কাঁপতে শুরু করেছিল। তার উরু থেকে পায়ের তলা অব্দি পাথরের চেয়ে ভারি হয়ে উঠেছিল।

বনশ্রী বলেছিল—কিন্তু তোমার বাড়িতে কী বলে যাবে ?

—বাড়ি ? বাড়ির কথা তো বলেইছি। আমি ফ্রি। শুধু তোমার প্রব্লেমটাই ভেবে দেখ। বাবা-মাকে কী বলবে ?

—কী বলব ?

বনশ্রী তার গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই রাতের গাছের ছায়া হেমন্তকে সুযোগ দিল—কিন্তু হেমন্ত এত কাঁপছিল যে বনশ্রীর হাতটা হাতে নেওয়াও তার পক্ষে কণ্টকর হল। হেমন্ত ভাবছিল—আসলে বয়সই একটা বড় ব্যাপার। চল্লিশের পর মানুষ সবকিছু হিসেব করে নিজের ভাগে বেশিটা পেতে চায়। বনশ্রীর কাছে অনেক বেশি পেতে চাচ্ছে তাই। অথচ পেয়ে গেলে কীভাবে সামলাবে ঠিক করতে পারছে না।

বনশ্রী যেন অসহায় প্রশ্ন করল—কী বলব ? হেমন্ত একটু ভেবে বলেছিল—বলবে তোমাদের অর্গানিজেশনের কাজে বাইরে যাচ্ছ !

—যাঃ ! বিশ্বাস করবে না কেউ !

হেমন্ত আকাশ-পাতাল হাতড়ে বলেছিল—ধরো কোন আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছ ?

—সে তো আরও মারাত্মক !

হেমন্ত অভিমান দেখিয়ে বলেছিল—হুঁ, বুঝেছি। তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ !

বা রে ! কিসের ভয় তোমাকে ?

—যে-ভয় মেয়েদের পাওয়া উচিত।

বনশ্রী তার পাঁজরে খোঁচা মেরে বলেছিল—যাঃ। শুধু অসভ্যতা।

—বনশ্রী ! হেমন্ত সিরিয়াস হয়ে বলেছিল। আমি সাধুসন্ত নই, তা ঠিক। কিন্তু সম্ভবত আর তত ইয়ং নই যে সেলফ-কনট্রোল থাকবে না ! সে-সময়টা পার হয়েগেছি।

বনশ্রী রেগে গিয়েছিল একথায়।—আমি ওসব ভাবিনি !

—তাহলে কী ভাবছ ? ফ্যামিলি—মানে বাবা-মায়ের ব্যাপারটা তো ? ঠিক আছে। যদি পরে ওঁরা কিছু আঁচ করেন, আমরা বিয়ে করে ফেলব।

হেমন্ত ফের একটা অসাধারণ সাহস দেখিয়ে বসেছিল বলা যায়। কথাটা বলে সে নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাতের ঢিলের মতো তার কথা হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।

বনশ্রী অবশেষে বলেছিল—কয়েকটা দিন ভাবতে দাও।···

সেই কয়েকটা দিন হেমন্তের যা গেছে ! আপিসে গিয়ে সারাক্ষণ বনশ্রীর ফোনের

প্রতীক্ষা। ফোন বাজলেই হেমন্ত চমকে উঠে তাকিয়েছে বড়বাবুর টেবিলের দিকে। বড়বাবু কার সঙ্গে চাপা হেসে কথা বলছেন দেখে ভেবেছে, বনশ্রীর সঙ্গে এ'ড়ে রসিকতা করছেন না তো?

বনশ্রীর ফোন এল চারদিন পরে বেলা চারটেয়। মেট্রোর নিচে থাকছি—চলে এস।

হেমন্ত গেল। বনশ্রীর প্রথম কথা তাকে দেখেই—পরশু থেকে চারদিনের ছুটি নিলুম! কোথায় যাবে, বলো।···

দুই

বনশ্রী যেতে যেতে একটু দাঁড়াল। কাঁটাঝোপে থরেথরে জংলী ফুল ফুটে আছে। সাদা পাপড়ি, মধ্যিখানে বেগুনী ছোপ, হলুদ সূচলো পরাগ। সে বলল—এগুলো কী ফুল বলতো?

হেমন্ত দামাল ছেলের মতো পটাপট তিনটে ছিঁড়ে নিয়ে এল।—পরিয়ে দিই! বলে সে বনশ্রীর চুলের পেছনে আটকে দিল একটা। বনশ্রী দ্বিতীয় ফুলটা ওর হাত থেকে নিয়ে শুঁকে দেখল। গন্ধ নেই। তৃতীয় ফুলটা গুঁজতে গিয়ে হেমন্ত চমকাল। বাঁ-দিকে প্রাগৈতিহাসিক ম্যামথের মতো দেখতে একটুকরো বিশাল দেয়ালের মাথা থেকে নান্নু মিয়ার পুত্র চিলচিৎকার করে উঠল—হাঁ জী! ও জী। মুহব্বত করতে হো জী?

সঙ্গে সঙ্গে হেমন্ত পায়ের কাছ থেকে ইটের টুকরো তুলে ছুঁড়ে মারল। বনশ্রী হকচকিয়ে গিয়েছিল। ঢিলটা ছুটে গেলে সে বলল—এই! লাগবে ওকে!

ছেলেটা হনুমানের দক্ষতায় তক্ষুনি দেয়াল আঁকড়ে ওপাশে ঝুলে নিজেকে বাঁচিয়েছে। হেমন্ত রাগে লাল হয়ে বলল—ওর বাবাকে বলে হবে না। পাটোয়ারি-জীকে বলতে হবে। বাঁদরামির একটা সীমা আছে!

বনশ্রী আগের মতো হাসতে হাসতে হেমন্তের হাত ধরে টানল।—ছেড়ে দাও! ছেলেটা সত্যি বড্ড পেকে গেছে।

হেমন্ত ফুলটা নিজের অজান্তে গুঁড়ো করে এগোল। স্তূপ, তার ওপর ঘাস আর আগাছার ঝোপঝাড়, মধ্যিখানে সরু একফালি রাস্তা। রাস্তাটা সম্ভবত টুরিস্টদের কথা ভেবেই করা হয়েছিল। এখানে বাঁদিকের ভাগীরথী আর দেখা যায় না। ডাইনে একটু দূরে উঁচুতে শহরের জলের ট্যাংকটা দেখা যাচ্ছে। তার পাশে জৈনমন্দিরের পেতলের চূড়া উজ্জ্বল রোদে ঝকমক করছে। বনশ্রী বলল—জৈন-মন্দিরে যাওয়া হল না যে? কথা ছিল না আজ প্রথমেই ওখানে যাব?

হেমন্ত বলল—ওটা নাকি অনেক দূরে। পাটোয়ারিজী বিকেলে জীপে নিয়ে যাবেন বলেছেন।

দূরত্ব হিসেব করে বনশ্রী বলল—ধাঃ! ওই তো! তারপর সে ভিউফাইণ্ডারে মন্দিরটা দেখতে থাকল।

হেমন্ত দেখল, বনশ্রীর চুল থেকে ফুলটা পড়ে গেল। কিন্তু সে কুড়োতে ব্যস্ত হল না। বাঁদরটা আবার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। পাটোয়ারিজীকে বলতেই হবে। নান্নু লোকটা অবশ্য খুব ভাল। বিনয়ী। আদব-কায়দা প্রচুর। ও যে সত্যি সত্যি খানদানী পরিবারের লোক, তা বেশ বোঝা যায়। ওর বাবাকে নাকি লোকেরা মন্নুনবাব বলত। অথচ লোকটা ঘোড়ার গাড়ি চালানো কোচোয়ান ছিল। আবার কালোয়াতী গানেও তার নাকি নামটাম ছিল। তার বাবা আন্নুমিয়া নবাব ছিল, প্যালেসের খানদানী নবাববংশধর। যৌবনে গায়ে জরিদার আচকান চড়িয়ে উষ্ণীষ পরে কালেক্টরিতে যেত বৃত্তির তন্‌কা আনতে। ওই একটি দিন স্বয়ং কালেক্টার তাকে সেলাম দিতেন। এসব পাটোয়ারিজীর মুখে শোনা। আর পাটোয়ারিজীও—হেমন্ত অবাক হয়ে দেখেছে, নান্নুমিয়াকে বেশ আদব-কায়দা করে কথা বলেন। এই ঐতিহাসিক শহরে সবই বড্ড অদ্ভুত লেগেছে হেমন্তের।

কিন্তু ওই ডেঁপো ছোঁড়াটা তাদের পিছনে লেগেছে কেন? বনশ্রীর দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ও কি আঁচ করেছে কিছু? হেমন্ত অবাক হল একটু। ছোঁড়াটার বয়স দশ-বারো বছরের বেশি হতেই পারে না। বনশ্রী আর হেমন্তের সম্পর্ক টের পাওয়া ওর পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কার পক্ষেই বা সম্ভব? পাটোয়ারিজীর চোখেও ধুলো দেওয়া গেছে যখন!

বনশ্রী বলল—তুমি কথা বলছ না!

হেমন্ত হাসবার চেষ্টা করে বলল—নাঃ! কথা বলব না কেন?

—ছেলেটাকে নেগলেক্ট না করলে তুমি কিন্তু সত্যি পাগল হয়ে যাবে! বলে বনশ্রী হাসতে লাগল। তুমি যত রি-অ্যাক্ট করবে, ও তত পেয়ে বসবে।

হেমন্ত সায় দিল।—ঠিকই বলেছ। অতটা ভেবে দেখিনি:…বলে সে গলার স্বর একটু চাপা করল।—আচ্ছা, কাল দুপুরে পাটোয়ারিজী ঘর দেখিয়ে দিয়ে যখন চলে গেলেন, তখন আমরা…মানে আমি কি খুব বেশি অসভ্যতা করছিলুম?

বনশ্রী অন্যদিকে তাকিয়ে বলল—মনে পড়ছে না। কেন?

—জাস্ট তোমাকে একবার চুমু খেয়েছিলুম।

—হবে। কেন?

—তারপর তো জানলায় উঁকি দিতে দেখলুম ছোঁড়াটাকে। আমাদের…মানে আমার একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

বনশ্রী কিছু বলল না। ভিউফাইণ্ডারে চোখ রাখল। সামনে গম্বুজগুলো খুঁটিয়ে দেখতে থাকল।

হেমন্ত বলল—আমার ধারণা গতরাতে আমরা যা সব বলেছি, এবং যা কিছু করেছি, ছোঁড়াটা আড়ি পেতে শুনেছে। অবিশ্যি আলো নেভানো ছিল।

—এই ! গম্বুজগুলো কিন্তু একসময় রঙীন ছিল ! ধুয়েমুছে গেছে ।

—সকালেও শুওরের বাচ্চা এসে আড়ি পেতেছিল । সেকেলে অদ্ভুত সব জানলা । নিচের খড়খড়িতে যথেষ্ট ফাঁক আছে ।

—মাঝখানের গম্বুজের মাথায় ওই চাঁদটা সোনার না পেতলের বল তো ?

—তোমাকে আদর করছিলুম । হঠাৎ ইমটইশান—মনে হল, পুবের জানলার নিচের ফুটোয় একটা চোখ । বাঁদরের বাচ্চাটা হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল । রিভলবার থাকলে গুলি করে মারতুম ।

বনশ্রী আদুরে গলায় বলে উঠল—আমার সোনা ! লক্ষীটি ! ওসব বলে না ; এস, আমরা এই বারো না তের গম্বুজের ভেতরে গিয়ে বসি কোথাও । পা ধরে গেছে ! আঃ এস না !

হেমন্ত এগোল । কিন্তু সেই ম্যামথের মতো দেয়ালে ছোঁড়াটাকে খুঁজতে ছাড়ল না । ও নেই । পিছনে কচি বটের চারা উঁকি মারছে । হয়তো শেকড় ধরে নেমে গেছে । হেমন্তের মেজাজ আর কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না । এই অদ্ভুত আপদের কথা কে কল্পনা করতে পারে ? ফেউয়ের মতো একটা ছোঁড়া তাদের পিছনে ঘুরছে যেন সারাক্ষণ—প্রতি মুহূর্তে নজর রেখেছে । পাটোয়ারিজীকে বলতেই হবে ।

তবে ভুলটা হয়েছে গোড়াতেই । নান্নু মিয়ার খাসি কেরামত খাঁয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে গিয়ে বেশ খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েছিল কাল । খাসিটার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন মানুষের মতো । কাল সারা বিকেল গঙ্গার ধারে পাটোয়ারিজীর বাগানবাড়ির—যে বাড়িতে তারা উঠেছে, তার লনে হেমন্ত ছেলেমানুষের মতো খেলা করেছে কেরামত খাঁয়ের সঙ্গে । কেরামত খাঁয়ের একঘেয়ে লেগেছে । চুলে যাবার চেষ্টা করেছে । নান্নুর বেটাকে হুকুম করেছে হেমন্ত—উস্‌কো কাম পাকারকে লে আও ! ছোঁড়াটা খাসিটার গলার চামটি ধরে টেনে এনেছে । আবার হাঁটুতে ঢুঁ মারার খেলা জমে উঠেছে । বনশ্রী মার্বেলের সিঁড়িতে বসে খুব উপভোগ করছিল । হেসে খুন হচ্ছিল । আর বনশ্রীকে আরও বেশি আনন্দ দিতেই হেমন্ত ভুলে গিয়েছিল যে কিছুক্ষণ আগে ছোঁড়াটা জানলায় উঁকি মেরে হাসছিল ।...

বনশ্রী বলল—এই ! ভেঙে পড়বে না তো ?

হেমন্ত চমকে উঠে তাকাল । বিরাট এলাকা জুড়ে মস্‌জিদের দেয়াল—আর তার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফটক রয়েছে । তারা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে । দেয়াল যেমন, তেমনি ফটকটাও যথারীতি ফাটলধরা । এখানে পাথর পেয়েছিল কোথায় ? পাটোয়ারিজী বলছিলেন—পূর্ণিয়া এলাকা থেকে আনা হয়েছিল । কিন্তু আনা হল কী ভাবে ? পাটোয়ারিজীর দ্রুত জবাব—কেন ? হাতির সাহায্যে । ঘোড়া আর খচ্চরও পাথর বইতে পারে । এখনও এলাকার পাহাড়ী লোকেরা ঘোড়া-গাধা-খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে জাঁতা আর শিলনোড়া বেচতে আসে । শীতের সময় ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে যতদূর যাবেন দেখবেন গাঁয়ে গাঁয়ে মেলা

বসেছে। মেলায় বিহারী জাঁতাওলারা এসে জুটেছে। ওই সময় রাঢ়ে ফসল ওঠে কিনা। তবে আজকাল জাঁতাটাতার প্রচলন কমে গেছে। ময়দাপেষা মেসিন বসেছে। ইলেকট্রিসিটির যুগ।…

অতীত আর বর্তমানের বিবিধ খবর রাখেন পাটোয়ারিজী। এই ভূতের শহরে ওঁর দাপট আছে বুঝেছে হেমন্ত। পেট্রোল পাম্প, গ্যারেজ, আবার লোহা সিমেণ্ট ইত্যাদি দালানের জিনিসপত্র—এমন কি সুরকি কল আর ইটেরও কারবার আছে ভদ্রলোকের। কলকাতা গিয়ে বলে আসতেন—ও এলাকায় শুধু বলবেন, লক্ষ্মণ সিং পাটোয়ারিজীর বাড়ি যাব—দেখবেন ম্যাজিকের খেলা লেগে যাচ্ছে। তিন পুরুষের বাসিন্দা এখানে। প্রায় বাঙালী হয়ে গেছেন। দুর্গাপুজো লক্ষ্মীপুজো করেন বাড়িতে। আবার ঝুলনপূর্ণিমায় রাসের মেলাও বসান। হ্যাঁ, ছোঁড়াটার উৎপাতের কথা পাটোয়ারিজীকে বলতেই হবে।

হেমন্ত দেখল, বনশ্রী কিন্তু হনহন করে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। ভেতরে উঁচু ফাঁকা চত্বর, আর চারদিকে সারবন্দী ভাঙাচোরা পাথরের ঘর। ঘরের ওপর গম্বুজ। গম্বুজগুলো ধসে না পড়লেও ফাটল ধরেছে। চত্বরে পাথর বসানো ছিল একসময়। জায়গায়-জায়গায় পাথর নেই—গর্ত হয়ে রয়েছে। কাশঝোপ আর জঙ্গল গজিয়েছে। বনশ্রী যেভাবে যাচ্ছে, হেমন্তের মনে হল বাধা দেওয়া উচিত। সাপটাপ থাকতে পারে। কিন্তু বনশ্রী চত্বরের একটুখানি এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘুরে বলল—ডিম্বুটা বলছিল, বাঘ আছে। নিশ্চয় থাকে।

হেমন্ত বলল—চলে এস। ভেতরে বসা যাবে না।

বনশ্রী ফিরে এসে বাঁ দিকে ঘরগুলোর ভিতরে পা পাড়াল। বলল—এস না! ঘরগুলো দেখি।

তখন হেমন্তকে যেতে হল। বনশ্রীর চেহারায় হঠাৎ কেমন যেন চঞ্চলতা ফুটেছে। নাকি হেমন্তেরই চোখের ভুল! ঘরগুলোর কোন কপাট নেই। বড় বড় দরজা আর জানলা হাঁ করা। একটা ঘরের ভেতর দিয়ে সবগুলো ঘরে যাওয়া যায় এবং চারদিক থেকেই ঘরে আসা যায়। মেঝেয় ধুলো-ময়লা আর ছাগলের কিংবা বুনো জন্তু ও চামচিকের নাদি পড়ে আছে। যে-ঘরের মাথায় গম্বুজ, সে-ঘরে ঢুকতে ভয় না-করে পারে না। দক্ষিণের জানলা দিয়ে কাছেই নদী দেখা যাচ্ছে। জানলাটার দুপাশে ও উপরের দেয়ালে অজস্র নাম আর অশ্লীল কথা লেখা আছে। বনশ্রী পড়ে দেখে রাঙামুখে হাসল।

—কী অসভ্য সব!

হেমন্ত পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল—আমাদের নাম লিখে রাখা উচিত কিন্তু। জাস্ট দা লাভার্স রিচ্যুয়াল্!

হেমন্ত যেন সত্যিসত্যি লিখে ফেলবে, এভাবে দেয়ালের মুখোমুখি দাঁড়াতেই বনশ্রী ওকে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল। বলল—ছেলেমানুষী কোরো না!

হেমন্ত হাসতে-হাসতে বলল—কেন ? তোমার চেনাজানা লোকের চোখে পড়বে ভাবছ ?

—পড়তেও পারে।

—অসম্ভব। প্রথম কথা, বনশ্রী নামে অনেক মেয়ে থাকতে পারে। দ্বিতীয় কথা, তোমার চেনাজানা লোকেরা হেমন্ত নামে কাকেও চেনে না। তৃতীয় কথা, এ ঘরে তেমন কেউ কস্মিনকালে ঢুকবে না—আমরা যেমন ঢুকেছি। আর ঢুকলেও দেয়ালে নাম পড়া শুরু করবে বলে মনে হয় না।

বনশ্রী আনমনে বলল—সবকিছুই হতে পারে। অসম্ভব বলে কিছু নেই।

হেমন্ত একটু ক্ষুব্ধ হল।—এত লুকোছাপার মানে হয় না। এসে অব্দি লক্ষ্য করছি, তুমি ভিড় এড়িয়ে থাকছ। যেন—এই বুঝি কে চিনে ফেলল! অত ভয় করার কী আছে ?

—আছে। তুমি বুঝবে না।

হেমন্ত জেদ ধরে বলল—না। বুঝব না। আমি তো বলেইছি, সব রিস্ক্ আমার। এমনকি তুমি চাইলে সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারটা সেরে ফেলব। সে তুমি কালীবাড়িতে গিয়ে চাও, কিংবা রেজিস্ট্রেশন! তুমি তো আইনত সাবালিকা।

বনশ্রী হাসি দিয়ে ওকে চুপ করাতে চাইল।—আঃ! আবার সেই শুরু করলে ? আমি তো তোমাকে চাপ দিই নি ? দিয়েছি কোনদিন ?

—দাও নি ঠিকই। কিন্তু এমন লুকোচুরি খেলাও আর ভাল লাগে না।

—লুকোচুরি কোথায় দেখছ ?

—নয় ? এই স্বামী-স্ত্রী সেজে বাইরে যাওয়া!

ওকে থামিয়ে দিয়ে বনশ্রী আগের মতো হেসে উঠল।—সাজব কেন—আমরা তো আসলে স্বামী-স্ত্রীই!

—কিন্তু তখন বললে যে ছদ্মবেশ পরে এসেছ!

—ওটা কথার কথা।...বলে বনশ্রী ওর হাত ধরে টানল।

অবুঝ বালকের মতো হেমন্ত বলল—ঠিক আছে। কিন্তু বলে দিচ্ছি, এবার ফিরে গিয়েই রেজিস্ট্রেশনটা সেরে নেব। এবার তুমি টালবাহানা করলে বুঝব...

বনশ্রী কথা কেড়ে বলল—টালবাহানা কিন্তু আমি কখনও করি নি!

—আমি করেছিলুম বলছ ?

—ভেবে দেখ।

—আরে সে তো তখন প্র্যাক্‌টিক্যাল কতকগুলো কারণ ছিল, তাই। টাকা-পয়সার অসুবিধা চলছিল। তারপর যখন কথাটা তুললুম, তুমি বললে যে তোমার ছোটভাই বাচ্চুর রেজাল্টটা বেরিয়ে যাক্।

—সেও তো আমার প্র্যাক্‌টিক্যাল কারণ, ঠিক তোমারই মতো।

—বেশ। এবার ফিরে গিয়ে আশা করি আমাদের কারুরই তেমন কোন কারণ থাকবে না।

বনশ্রী আস্তে বলল—কে জানে।

হেমন্ত কথাটা লুফে নিয়ে বলল—কে জানে মানে? থাকবে বলছ?

—আমি জানি না। তুমি প্লীজ ওসব কথা আর তুলো না এখন!

বনশ্রীর কথার সুরে বিরক্তি ছিল। হেমন্ত তা আঁচ করে একটু বিব্রত বোধ করল। জেদ করে অনেকদূর তলিয়ে গিয়েছিল। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সে শুকনো গলায় হাসল।—সত্যি বড্ড দুর্বোধ্য তুমি! এত কাছে মুখোমুখি থেকেও তোমার কোন কথা বুঝতে পারিনে।

বনশ্রী বলল—আঃ! আবার?

—না।...বলে হেমন্ত সিগারেট বের করল।

কিন্তু আবহাওয়াটা যে একটু অপরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তা সে টের পাচ্ছিল। মানুষের মনে যেন একজন নিরপেক্ষ সত্যদ্রষ্টা আছে। মানুষের জন্মের সঙ্গে হাত-পা-মুখ এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো তাকে নিয়েই পৃথিবীতে আসতে হয়। সেই নিরপেক্ষ সত্যদর্শী পর্যবেক্ষণে জানে হেমন্তের আসল ব্যাপারটা কী। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে ভেসে সে হেমন্তকে প্রশ্ন করছিল—বনশ্রীকে কি সত্যি সত্যি তুমি বিয়ে করতে চাও? নাকি বেচারাকে প্রতারণা করে যাচ্ছ সমানে? ওকে নিছক উপভোগ করে স্ফূর্তি ওড়ানোর ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী? এই যে বলছ, ফিরে গিয়েই আনুষ্ঠানিক কর্মে নামবে—এ কি তোমার একটা প্রতারণা নয়? কারণ তুমি জানো, তেমন কিছু করা তোমার পক্ষে সত্যি অসম্ভব। ফিরে গিয়ে 'তোমাকে আবার চরম মুহূর্তে একটা অছিলা দাঁড় করাতে হবে। তবে ভাগ্যিস, বনশ্রীরও যেন কী অসুবিধা আছে কোথাও। সে তোমাকে তীব্র চাপ দিচ্ছে না—দেয় নি এখনও। হয়তো ফিরে গিয়েও সে তেমন কোন চাপ দেবে না। অথচ মনের কথা, দুজনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি লোভ আছে। প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করো তোমরা পরস্পরের প্রতি। একে ভালবাসা বলতে পারো, বলো। আবার যৌনতা বলতেও পারো। কিন্তু তোমরা যে পরস্পর আসক্ত, তা প্রমাণিত হয়েছে। দুজনে নিঃসংকোচে শারীরিক ব্যাপারে লিপ্ত হতেও দ্বিধা করো নি। যদিও তোমরা সতর্ক, পাছে প্রকৃতি কোন বিপদ এনে ফেলে।...

হেমন্ত বনশ্রীর হাত থেকে ভিউফাইন্ডারটা নিয়ে সামান্য দূরে ভাগীরথী দেখতে থাকল। এখানে নদী বাঁক নিয়েছে। কানায়-কানায় জল বইছে। পাটোয়ারিজী বলছিলেন, আগে জল অনেক নিচে নেমে যেত, মার্চে। এখন ফরাক্কার ফিডার-ক্যানেল থেকে জল ছাড়া হচ্ছে। তাই বারোমাসই নদী ভরা থাকবে। সামনে নবাবী আমলের একটা ঘাট দেখা যাচ্ছে। দুধারে লোহার তিনটে ফ্রেমের মাথায় কাঠের তিনকোণা ছত্র। ছত্রের তলায় গোল চত্বর। চত্বরে কে বসে রয়েছে একা।

ট্যুরিস্ট বলেই মনে হচ্ছে। একলা বসে আছে কেন লোকটা? হেমন্ত বলল—অদ্ভুত তো!

বনশ্রী আনমনে বলল—কী?

—ঘাটে একটা লোক বসে আছে।

—তা কী হয়েছে?

—লোকাল লোক নয় মনে হচ্ছে। ব্যাগ আছে সঙ্গে। একা ওখানে বসে কী করছে ব্যাটা?

বনশ্রী ওর হাত থেকে ভিউফাইণ্ডার কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল—সবাই তোমার মতো প্রেমিকা পাবে কোথায়?

হেমন্ত বলল—ঠিক বলেছ। আমি ভাগ্যবান।

বনশ্রী ভিউফাইণ্ডার চোখে রেখে লোকটাকে দেখতে থাকল। হেমন্তের সিগারেট শেষ হওয়া অব্দি সে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে হেমন্ত বলল—কী ব্যাপার?

বনশ্রী জবাব দিল না। চোখ থেকে ভিউফাইণ্ডার নামালও না।

হেমন্ত বলল—কী দেখছ অত?

বনশ্রী তবু জবাব দিল না।

হেমন্ত বলল—চেনা কেউ নাকি?

এবার বনশ্রী চোখ থেকে ভিউফাইণ্ডার নামাল এবং হেমন্তের দিকে ঘুরে একটু হাসল শুধু। কিন্তু তার মুখের সেই প্রাণবন্ত ভাব এবং চাকচিক্য আর এতটুকু নেই। তাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি শুকনো এবং শূন্য। পায়ের কাছে শাড়ির নিচের অংশ যেন কাঁপছে। হেমন্ত অবাক হয়ে বলল—কী ব্যাপার?

বনশ্রী ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত নিয়ে চাপা গলায় বলল—আমার শরীরটা কেমন করছে। হঠাৎ যেন…

হেমন্ত অন্যহাতে ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ব্যস্তভাবে বলল—কী ব্যাপার, খুলে বলবে? লোকটা কে? ওকে দেখেই কি ভয় পেলে? আশ্চর্য তো!

বনশ্রী জোরে মাথা দোলাল। অস্ফুটস্বরে বলল—না, লোকটা নয়। আমার হঠাৎ মাথা ঘুরছে। হঠাৎ কেমন যেন…

সে হেমন্তের বুকে মুখ গুঁজল। হেমন্ত তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—বনশ্রী! বনশ্রী!

সেই সময় পিছনে কোন ঘরের ভেতর প্রতিধ্বনিময় স্বরে নাম্নুমিয়ার ছেলেটা ফের চেঁচিয়ে উঠেছে—ক্যা জী? মুহব্বত করতে হো! সেই সঙ্গে খিলখিল হাসি। হেমন্ত তক্ষুণি বনশ্রীকে ছেড়ে ঢিল কুড়োবার চেষ্টা করতেই বনশ্রী পড়ে যাচ্ছিল নোংরা মেঝের।

হেমন্ত ধরে ফেলল অবশ্য। বনশ্রী মূর্ছিত হয়েছে। হেমন্ত হাঁটু দুমড়ে বসে পড়েছিল। তার দুই উরুর ওপর বনশ্রীর মাথাটা তুলে রেখে সে বিভ্রান্তভাবে ফের

ডাকল—বনশ্রী! বনশ্রী!

ওদিকে ছোঁড়াটার হাসি থেমে গেছে। হেমন্ত এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে দেখল, সে ওপাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। হেমন্ত প্রায় গর্জন করে বলল—ভাগ্ শুয়ারকা বাচ্চা!

ছোঁড়াটা নির্বিকার মুখে বলল—চেল্লাচ্ছেন কাহে জী? সাদা জিন দেখে মেমসাব বেহুঁশ হয়েছে। এক মিনাট। হামি পানি আনছে। চুপ সে বৈঠিয়ে। তখন হামি বলেছিল না, এখানে জিন আছে?

বলেই সে খরগোশের মতো দৌড়ে অদৃশ্য হল। নির্জন স্তব্ধ ঘরগুলোতে তার পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে মিলিয়ে গেল দূরে। তারপর বনশ্রী চোখ খুলল। হেমন্ত ভয়ে-ভয়ে ডাকল—বনশ্রী! বনশ্রী! হেমন্তের মনে ছোঁড়াটা এতক্ষণে সত্যিসত্যি ভূতের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। বনশ্রী আস্তে আস্তে উঠে বসল। তারপর বলল—ঠিক হয়ে গেছে। চলো!

হেমন্ত তাকে সাহায্য করার আগেই সে উঠে দাঁড়াল। তারপর ফের বলল—চলো।

তিন

হেমন্ত যেখানে বনশ্রীর চুলে ফুল গুঁজে দিয়েছিল, সেখানে ডিম্বুকে দেখা গেল জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এনামেলের তোবড়ানো বদনার নল থেকে কয়েকবার জল ছল্‌কে পড়ল। তার মুখটা নির্বিকার। চাহনি নিষ্পলক। ঠোঁটের কোনায় সেই দুষ্টু কিংবা জ্যাঠামির হাসিটা একটুও নেই।

হেমন্ত মুখ ভেংচে বলল—মহাগুণবান ব্যাটা! তারপর বনশ্রীকে জিগ্যেস করল—মুখেটুখে জল দেবে নাকি?

বনশ্রী মাথা দোলাল শুধু। তখন হেমন্ত হাত তুলে গর্জাল—ভাগ্ ব্যাটা।

—পানি লাগবে না জী? ডিম্বু বলল। কেত্তা দূরসে লায়া হাম্!

—আনতে বলি নি। ভাগ্ এখন! হেমন্ত বনশ্রীর কাঁধে হাত রেখে ছোঁড়াটাকে পেরিয়ে গেল। হাসতে থাকল সে।—ব্যাটার এদিকে বড্ড হুঁশ দেখছি! সত্যি সত্যি জল এনে হাজির।

বনশ্রী কোন কথা বলল না। পিছন থেকে ডিম্বু বলল—ঠিক আছে। বারাগম্বুজের সাদা জিন যব ফিরভি খেল দেখায়েগা, তব্ মালুম হোগা—হাঁ! আভি তো পয়লা কিসিমকা—হাঁ।

সে তার আপন মনে বকবক করতে করতে জলটা ফুলের ঝোপে ঢেলে দিল। তার পর শূন্য বদনাটা নাচাতে-নাচাতে ঝোপঝাড় ভরা ঢিবির ওপর দিয়ে চলে গেল। বিষণ্ণ হতাশ তার প্রস্থান।

হেমন্ত বলল—আর কোন কষ্ট হচ্ছে না তো তোমার ?

বনশ্রী বলল—না।

—ঘর অব্দি হেঁটে যেতে পারবে তো ?

—পারব।

প্যালেসের বিশাল চত্বরে এসে তারা ডানদিকে ঘুরল। কয়েকটা ছোট্ট দল টুকরো-টুকরো ছড়িয়ে এদিকে-ওদিকে ঘুরছে। ওরা ট্যুরিস্ট তা বুঝতে দেরি হয় না। পাটোয়ারিজী বলছিলেন—সিজন এখন প্রায় চলে গেছে। শীতে এলে দেখতেন সে কী ভিড়! এসব জায়গা ফেরিওয়ালাদের ভিড়েই ভরে যেত। মরশুমী হাঁসের মতো যাওয়া আসা।

সোজা দক্ষিণে ভাগীরথীর দিকে এগিয়ে পূবে ঘুরল ওরা। ডাইনে নিচে ভাগীরথী। পাড়বরাবর সেকেলে রাস্তার দশা জীর্ণ। খোয়া ছড়িয়ে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে রয়েছে। দুধারে গাছগুলোয় অবশ্য বসন্তের পালিশ পড়েছে। সামনে বিশাল ফটক পড়ল। তারপর বাঁদিকে পীরের মাজার—যেখানে নান্নুমিয়া শুকনো পাতা ঝাঁট দিচ্ছিল। কিন্তু এখন তাকে দেখা গেল না। ফটকের পিছনে নদীর ধারে পাটোয়ারিজীর বাগানবাড়ি। পাঁচ একর জায়গার ওপর একতালা এই কুঠিবাড়িটা বানিয়েছিল কোন ইংরেজ। মেঝে ও দেয়ালের কিছুটা মার্বেল পাথরে বাঁধানো। সবুজ নকশা আছে। লোহার গেট দিয়ে ঢুকে সামনে পড়ে উঁচু মার্বেল সোপান। সেখানে বনশ্রী একটু দাঁড়াল। তার নাকের ডগায় ও চিবুকে ঘামের ফোঁটা জমেছে। হেমন্ত বলল—ধরব ?

বনশ্রী ঘাড় নাড়ল। কিন্তু হেমন্তের একটা হাত ধরল। দশটা ধাপ উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। একসময় হেমন্তের হঠাৎ মনে হল, বনশ্রীর তাহলে কি হার্টের অসুখ আছে ?

দরজায় তালা ঝুলছিল। হেমন্ত তালা খুলল। প্রথম ঘর ছোটখাট হলঘরের মতো। তার দুদিকে তিনটে করে ঘর। নদীর ধার ঘেঁষে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটায় ওরা আছে। বাকী ঘরগুলো নাকি থাকার অযোগ্য। পাটোয়ারিজী বলছিলেন পাঁচটা ঘরেই তালা আটকানো আছে।

ওদের ঘরে আসবাব তেমন কিছু নেই। কোনার দিকে—যেদিকে নদী, একটা নিচু এবং সেকেলে 'ইংলিশ' খাট আছে। ফোমের গদী, গাঢ় নীল হলুদ নকশাকাটা জয়পুরী চাদরে ঢাকা। পাশে গোল ছোট্ট একটা টেবিল। টেবিলে সাদা ফুলআঁকা নীল ঢাকনা আছে। তার ওপর কাঁসার সুদৃশ্য ফুলদানি। সকালে নান্নুমিয়া একগাদা ফুল এনেছিল বনশ্রীর ফরমাসে। সেগুলো এখনও ঝকমক করছে। বাকি আসবাব বলতে একটা আলনা, একটা ভারি মেহগিনি চৌকো টেবিল আর তিনটে চেয়ার। একটা বেতের আরামকেদারা। আর কিছু না। পাটোয়ারিজী নাকি মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকেন। কখনও হেমন্তদের মতো কোন অতিথিবান্ধব।

পুরোনো বাথরুম অব্যবহার্য। এঘরের পুবের দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামলেই খোলামেলায় দশ মিটার দূরে বাথরুম। সেটা ক'বছর আগে বানানো হয়েছে।

টেবিলের ওপর হেমন্তের মাঝারি স্যুটকেস আর বনশ্রীর কিটব্যাগ পাশাপাশি বসে আছে। আলনায় হেমন্তের প্যান্ট, পাজামা, পানজাবি আর তোয়ালে ঝুলছে। বনশ্রীর শাড়ি সায়া আর ব্লাউজের মধ্যে আত্মগোপনকারী ব্রেসিয়ার ঝুলছে।

ড্রেসিং টেবিল নেই। পশ্চিমের দেয়ালে একটা বড় আয়না টাঙানো আছে। তার নিচের খোপে শুধু বনশ্রীর ট্যালকাম পাউডার। একটা সাবানদানি। সাবানটা ছিল নতুন। তার মোড়ক এখনও জানলার বাইরে নিচের ঘাসে পড়ে আছে।

হেমন্ত ঘরে ঢুকে জানলাগুলো খুলে দিল। ফ্যান চালিয়ে দিল। বনশ্রী তখন খাটে এলিয়ে পড়েছে। মাথার তলায় দুটো বালিশই টেনে নিয়েছে। তার মুখে করুণ একটা হাসি। হেমন্ত টেবিলের তলা থেকে জলের কুঁজো বের করে গ্লাসে জল ঢালল। বনশ্রীর কাছে এসে বলল—নাও।

বনশ্রী জল খেলে সে গ্লাসটা রেখে এল। খাটে তার পাশে বসল। একটু ঝুঁকে আস্তে বলল—বলো, কী হয়েছিল?

বনশ্রী বলল—কিছু না। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠেছিল।

—তুমি অনেকক্ষণ ধরে লোকটাকে দেখছিলে।

—হ্যাঁ।

—কে ও?

—জানি না তো।

—জানো না, অথচ তুমি…

বনশ্রী হাসল,—ধ্যাট্। ও কিছু না। আমার মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠেছিল।

—কাকতালীয় বলছ। কিন্তু তুমি অতক্ষণ ওকে দেখছিলে।

বনশ্রীর হাসি মুছে গেল। একটু বিরক্তি ফুটে উঠল তার মুখে। বলল—আমার আর কোন প্রেমিক নেই।

হেমন্ত একটু অপ্রস্তুত হেসে বলল—না, তা বলছিনে। কিন্তু অতক্ষণ কী দেখছিলে?

—লোকটার গায়ের রঙ ফ্যাকাসে। কতকটা সাদা।...বনশ্রী আস্তে বলল।

—হ্যাঁ, আমারও যেন তাই মনে হয়েছিল।

—হ্যাঁ, সায়েব নয়। সেই যে কী বলে…

—এ্যালবিনো। মায়ের পেট থেকেই ওইরকম সাদা রঙ নিয়ে জন্মায়। এ্যালবিনো চাইল্ড বলা হয়। ওরা এতটুকু গরম বা ঠাণ্ডা সইতে পারে না, চোখ পিটপিট করে—তাকাতে কষ্ট হয়।

বনশ্রী আবার হাসল।—ডিম্বু বারোগম্বুজের সাদা ভূতের কথা বলছিল।

এবার হেমন্তও হোহো করে হেসে উঠল।—তাই বলো। তোমার দেখছি

দিনদুপুরেই ভূতের ভয়। কাল রাতেও কেমন যেন চমকে উঠেছিলে! নদীর ধারে যখন বসেছিলুম।

বনশ্রী বলল—ভূতটুত দেখিনি। তবে গা ছমছম করছিল।

হেমন্ত আদর করে ওর কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিল এবং গালে আঙুল বোলাতে থাকল। বলল—যদি তোমার সত্যি খারাপ লাগে, অন্য কোথাও চলে যাব। এখনও দুদিন ছুটি হাতে আছে। তোমারও তো আছে!

—আছে। কিন্তু কোথায় যেতে চাও?

হেমন্ত একটু ভেবে নিয়ে হাল ছেড়ে দিল। বলল—মুশকিল! তেমন কোন্ ভাল জায়গার নাম মনে পড়ছে না। যেতে হলে আবার কলকাতা ফিরতে হয়! তারপর আগামীকাল আবার বেরোতে হয়। তার মানে আজ রাতটা কলকাতার কোন হোটেলে কাটাতে হবে।

বনশ্রী আপত্তি জানাল—না। হোটেল-টোটেল নয়। সে বিশ্রী ব্যাপার!

—বিশ্রী কেন?

বনশ্রী জবাব দিল না। হেমন্ত বুঝতে পারছিল, হোটেল সম্পর্কে চালু গুজব বনশ্রীর নিম্নমধ্যবিত্ত নীতিবোধকে পীড়িত করে। অথচ তার এমন করে চলে আসা এবং হেমন্তের সঙ্গে থাকার ব্যাপারটা ভালবাসা নামে খুব পুরনো এবং প্রসিদ্ধ ধারণার সস্নেহ আড়াল পায়। তাই বলে এ মুহূর্তে হেমন্ত বনশ্রী সম্পর্কে কোন হীন ধারণাকে মনে জায়গা দিতে অনিচ্ছুক। সে নিজেই বা কোন্ সাধুপুরুষ?

হেমন্ত বলল—বেশ। ধরো, তুমি আজ রাতে বাড়ি ফিরলে। তারপর কাল সকালে সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে গেলে। আমি অপেক্ষা করলুম। তারপর…

বাধা দিয়ে বনশ্রী বলল—তোমার পক্ষে যা সম্ভব, আমার পক্ষে নয়। বাবা-মাকে বলে এসেছি, অফিসের মেয়েদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি। ফিরব ফিফটিন্থ। এখন আবার ফিরে গিয়ে নতুন কৈফিয়ৎ দিয়ে বেরুনো সহজ নয়।

হেমন্ত শেষ চেষ্টার সুরে বলল—তুমি তো স্বাধীন!

বনশ্রী বলল—হ্যাঁ, স্বাধীন। ওরা আমার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন, তাই যা অবলিগেশান ওঁদের। কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে আঘাত পাবেন না? তুমি বলো। আফটার অল, আমি তো ছেলে নই—মেয়ে।

হেমন্ত চুপচাপ সিগারেট ধরাল। টানতে থাকল। বাইরে বসন্ত ঋতুর পাখিরা ডাকছিল। কোথায় নান্নুমিয়ার গলা শোনা যাচ্ছিল। হয়তো ছেলেকেই গালাগালি করছে। সারাক্ষণ ওই ওর স্বভাব।

বনশ্রী বলল—এখানে থাকতে আমার খারাপ লাগছে, বলব না। ভালই তো। বেশ নির্জন। শুধু একটা ভয়।

—কী?

—বাইরের লোক আসে অনেক। দৈবাৎ চেনাজানা কারও চোখে পড়তে পারি।

—আজকাল কেউ কারও জন্যে মাথা ঘামায় না।

—ঘামাতেও তো পারে। কারণ, তুমি তো জান, আমার অফিসটা চালায় শান্তিপথ আশ্রম। কর্তৃপক্ষ ভীষণ গোঁড়া। মেয়েদের ব্যাপারে কেউ এতটুকু কান ভারি করলে চাকরি থাকবে না।

হেমন্ত রাগ দেখিয়ে বলল—থাকল না তো বয়ে গেল। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে আসবে।

—তারপর? আমার ফ্যামিলির দায়িত্ব কে নেবে? আমার ভাই বাচ্চুর পড়ার খরচ কে চালাবে?

—আমি নেব। তোমাকে মাসে-মাসে টাকা দেব।

বনশ্রী হাসবার চেষ্টা করে বলল—কেন?

হেমন্ত ঝটপট বলল—আমার কর্তব্য।

—তোমার টাকা নেব কেন?

—আহা! যদ্দিন ফের তোমার একটা কিছু না জোটে, তদ্দিন · বাধা দিয়ে বনশ্রী বলল—তোমার কাঁধে বুঝি বার্ডেন নেই?

—তোমার মত অতখানি নেই, সে তো তুমি জানো।

বনশ্রী উঠে বসল।—ও কথা থাক। আর যে জন্যেই হোক, ওসব কথা বলার জন্যে আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি।

হেমন্ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এ মুহূর্তে তার ইচ্ছে হল বনশ্রীকে চুমু খাবে, কিন্তু সেই ডেঁপো ছোঁড়াটার কথা মনে পড়ায় আর এগোল না। সে উঠে গিয়ে প্রত্যেকটা জানলার কাছে ঘুরে নিঃসন্দিগ্ধ হল। কিন্তু ততক্ষণে ইচ্ছেটা নিভে গেছে, যেমন দপ করে জ্বলেছিল, তেমনি হঠাৎ।

বনশ্রী ঘড়ি দেখে বলল—সাড়ে দশটা বাজে। স্নান করে নিই। তুমি?

হেমন্ত বলল—আমিও করব। কী বিশ্রী গরম পড়ে গেছে এ ় মধ্যে!

বনশ্রী ঘড়ি খুলে রেখে আলনা থেকে রাতের শাড়িটা নিল। বলল—এই! আমি কাপড় বদলাব। তুমি পাশের ঘরে যাও।

হেমন্ত হাসল।—চোখ বুজে থাকছি।

—না। তুমি হলঘরে যাও।

—আহা, এই আমি ঘুরে বসছি বরং!

বনশ্রী এসে ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে হলঘরের মধ্যে ঠেলে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করল। হেমন্ত নিরাসক্ত এখন। সে শূন্য হলঘরে পায়চারি করতে থাকল। সদর দরজা আটকানো আছে। হলঘরের মেঝের মার্বেল জায়গায়-জায়গায় ফেটে গেছে। অপরিচ্ছন্ন। দেয়ালে অনেক শূন্য হুক। একদা অনেক ছবি ছিল বোঝা যায়। পাটোয়ারিজী বলছিলেন—মাঝে মাঝে বাগান-বাড়িতে এলে

আগের ট্রাডিশান মেনে গানের আসর বসাই এ ঘরে। এখানে নবাব-ফ্যামিলিতে এক ভদ্রলোক আছেন—নামকরা ক্লাসিক গাইয়ে। মীর্জা ইম্তাজ খাঁয়ের নাম শোনেন নি ? হেমন্ত শোনে নি। সে ক্লাসিক গানের ভক্ত নয়—কিছু বোঝেই না। তো নবাবফ্যামিলির লোকেদের দুর্দশা দেখলে এখন কষ্ট হয়। ভাঙা কেল্লাবাড়ির মধ্যে জঙ্গল গজিয়েছে। সেখানে সব খোপরি বানিয়ে কোনমতে বেঁচে আছেন। মেয়েরা কড়া পর্দা মানে। জাতপাতের রীতিও খুব কড়া। মেয়েরা বুড়ি হয়ে মরে যাবে,—সেওভি আচ্ছা বাইরে বেজাতের সঙ্গে শাদি দেবেন না। হেমন্ত এসব শুনে অবাক হয়েছে। নবাব শব্দে তার প্রকাণ্ড মোহ ছিল। গুঁড়ে হয়ে গেছে। প্যালেসের ভেতরটা দেখার প্রোগ্রাম আছে আজ বিকেলে। পাটোয়ারিজী এসে নিয়ে যাবেন।

এইসময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল এবং নান্নুমিয়ার গলা শোনা গেল—সাব! বড়াসাব! হামি নান্নুমিয়া আছে!

হেমন্ত দরজা খুলল। বলল—এস মিয়াসাব! তোমাকে খুঁজছিলুম। স্নানের জল ভরা হয়েছে ?

—জী হাঁ বড়াসাব। নান্নুমিয়া আদাব দিল। তো বড়াসাব, হামার লেড়কা বলল, মেমসায়েব বারাগাম্বুজমে বেহোঁশ হয়েছিল। হামি ওকে বকল। আভি শুনেই হামি চলে আসল বড়াসাব। কৈ ডাগদারবাবুকো ভি বোলাবেন তো বলুন।

হেমন্ত বলল—আরে না, না! তোমার ছেলেটা বড্ড ফাজিল। ওকে শাসন করা দরকার। বুঝেছ ? বড্ড ফাজিল!

নান্নুমিয়া করুণ হাসল।—জী হাঁ বড়াসাব। তো কী করব হামি বলেন ? বুড়া হয়েছি—পারি না। মেমসাব আচ্ছা তো বড়াসাব ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিছু হয়নি। শোন, একটু পরে স্নান করার পর আমরা খেতে বেরোব। কাছাকাছি ভাল হোটেল কোথায় আছে বলছিলে যেন ?

—নেহী বড়াসাব! পাটোয়ারিবাবু আপনাদের লিয়ে বন্দোবস্ত্ করেছে না ? হামি সাথ-সাথ লিয়ে যাবে। বোলেন তো রিকশো ভি ডেকে আনবে।

হেমন্ত বনশ্রীর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে বলল—সে আবার কোথায় ?

—ট্যুরিস্ট লজমে। নজদিগে আছে বড়াসাব। হুই—হুঁয়াপর!

হেমন্ত ব্যস্তভাবে বলল—না, না। বরং তুমি খাবার এনে দিও। একটা টিফিন কেরিয়ার যোগাড় করো। দুটো প্লেটও চাই। ওরা না দেয়, পাটোয়ারিজীর বাড়ি থেকে নিয়ে এসো।

নান্নুমিয়া 'ঠিক হ্যায় বড়াসাব' বলে ফের আদাব দিয়ে চলে গেল। হেমন্ত দরজা বন্ধ করে ঘুরে দেখল, সদর ঘরের দরজায় বনশ্রী এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলল—খাবার আনতে বলে ভালই করেছ। আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব হত।

হেমন্ত হাসল।—পাটোয়ারিজী লোকটির ভদ্রতায় কিন্তু বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করছি। একবেলা ওর বাড়িতেও খাওয়াবে। আমার অস্বস্তি লাগছে।

বনশ্রী বলল—কেন ?

—মেয়েদের চোখে নাকি সবই ধরা পড়ে। অবশ্য, তুমিই বলতে পার সেটা। বলে হেমন্ত এগিয়ে গেল। ওর কোমর ধরে ঘরে ঢুকল এবং দরজা বন্ধ করল।

বনশ্রী স্নানের জন্য অন্য দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছিল। কিন্তু হেমন্তের টানে তাকে দাঁড়াতে হল। সে অস্ফুটস্বরে বলল—আঃ। ছাড়ো।

হেমন্ত মুখ নামাতে গিয়ে চোখের কোণা দিয়ে একটা জানলা লক্ষ্য করল। তারপর দ্রুত বনশ্রীর গালে ঠোঁট ঠেকিয়েই তুলে নিল। নামুমিয়ার পুত্র তাকে ক্রমশ নার্ভাস করে তুলেছে। সত্যি হাত পা বুক কেমন কাঁপছে হেমন্তের। উরুদুটো ভারি মনে হচ্ছে।

বনশ্রী দ্রুত গিয়ে ওপাশের দরজা খুলল। সিঁড়ির ধাপ দিয়ে হাল্কা পায়ে নেমে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ডাইনে নিচু পাঁচিলের ওদিকে তাকিয়ে রইল।

হেমন্ত দরজার বাইরে গিয়ে সেদিকে তাকিয়ে বলল—কী ব্যাপার? আবার সাদা ভূত দেখতে পাচ্ছ নাকি ?

বনশ্রী ঘুরে একটু হেসে তক্ষুণি দ্রুত স্নানঘরে গিয়ে ঢুকল। এই দ্বিতীয়বার হেমন্তের মনে হল, ঠিক তখনকার মতোই বনশ্রীর মুখটা হঠাৎ রক্তশূন্য দেখাচ্ছিল যেন। তাড়া খাওয়া ভীত জন্তুর ভাব।

হেমন্তও ঝটপট্ ঘরে ঢুকে খাট থেকে ভিউফাইণ্ডার নিয়ে দক্ষিণের জানলায় গেল। ভিউফাইণ্ডারে চোখ রাখতেই ভেসে উঠল ভরা নদীর উদ্বেলিত প্রাচুর্য। চৈত্রের জোরালো হাওয়া শুরু হয়েছে। ওপারে ঘনসবুজ গাছপালার মধ্যে পাড়া-গাঁয়ের ছবি আঁকা রয়েছে। ডাইনে ও বাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে নদীর পাড় বরাবর খুঁজল হেমন্ত। কেউ কোথাও নেই। তখন সে পুবের জানলায় এল। পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পোড়ো বাড়ি আর বসতি এলাকার দিকে এখানে-ওখানে ভিড় দেখা যাচ্ছে। বিশাল বটতলায় একটা খেয়াঘাট চোখে পড়ছে। কিন্তু তেমন সন্দেহজনক কাকেও দেখতে পেল না সে।

এ কি তাহলে বনশ্রীর কোন নিছক ভঙ্গী? হেমন্ত ভিউফাইণ্ডার নামিয়ে এক হাতে ধরে রাখল। অন্যহাতে জানলার রড ধরে ভাবতে থাকল।

কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যা অনিবার্য হয়ে ওঠে, পরস্পরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস—তা কি আছে দুজনেরই? হেমন্ত ভাবল, এতক্ষণে দৃঢ় বিশ্বাসটার দিকে তাকাবার সময় এসেছে। নিছক মজা লুটতেই আসা নয় তো? নিছক মেয়েমানুষ নিয়ে লাম্পট্য? হেমন্ত একটু অপ্রস্তুত হল। তা কেন? বিশ্বাসের ব্যাপারটা যত গোলমেলে হোক্, বনশ্রীকে তো সে সত্যি ভালবেসেছে।

আর বনশ্রীর ভালবাসাও গভীর গভীরতর, তার প্রমাণ হেমন্তের কাছে থরথরে

খাজানো প্রত্যক্ষ এবং জোরালো। মেয়ে হয়ে এভাবে তার সঙ্গে চলে আসা, স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকা, একই বিছানায় শোয়া, এবং শরীর। এখনও এদেশে মেয়েদের পক্ষে যা চরম পরম বিত্ত।

হেমন্ত বিহ্বল হল। তাহলে কেন 'দৃঢ়বিশ্বাসের' প্রশ্ন? এরপর কী হবে, তাই নিয়েই কী? হ্যাঁ, তাই নিয়েই প্রশ্ন এবং তা ভবিষ্যতের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। হেমন্ত একটু পরে বিরক্ত হয়ে উঠল। জানলার কাছ থেকে সরে এল। বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। চিত হয়ে শুয়ে পা নাচাতে থাকল। চোখ বন্ধ। দুই হাত শিয়রে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছে। সে ঠিক করল, যা হবে হোক্। ঘটতে থাক্। বেপরোয়া ভাসবে। কিন্তু আবার মাথার মধ্যে প্রশ্ন উড়ে এল একটু পরেই।

কাল রাতের ব্যাপারটা। একই বিছানায় বনশ্রীর শুয়ে পড়াটা। অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে এরকম বাইরে চলে আসার হঠকারিতা নিশ্চয় আছে—কিন্তু শরীর! বনশ্রী যেন শারীরিক ব্যাপারে অভ্যস্ত। তার শারীরিক ভঙ্গীতে কিছু সুপরিচিত লক্ষণ ছিল। হেমন্ত বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল প্রায়। সিগারেট ধরিয়ে পূবের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। বনশ্রীর এখনও স্নান হয় নি। দশ মিটার দূরে বিশাল আকাশের নিচে পাটোয়ারির স্নানঘরটা নির্জন আর স্তব্ধ। বনশ্রীও কি তার মতো কিছু ভাবছে স্নান ফেলে? হেমন্ত টের পেল এতক্ষণে তার সামনে বনশ্রীর চেহারা নিয়ে আসলে একটা তীব্র প্রশ্ন দাঁড়িয়ে রয়েছে—কে এই বনশ্রী?

বনশ্রী দু'দুবার ভয় পেয়েছে, তাতে কোন ভুল নেই। প্রথমবার ভয়টা ছিল সাংঘাতিক। আকস্মিকতার আচমকা আঘাতে সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়বার ভয়টা যেন সইয়ে নিতে পেরেছে। নিশ্চয় কাকেও দেখে ভয় পেয়েছে সে। কে লোকটা?

হেমন্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে স্নানঘরের দরজায় গেল। ডাকল—বনশ্রী!

সাড়া এল—হয়েছে। একমিনিট।

না, এবার তাহলে ফিট হয় নি। হেমন্ত নিশ্চিত হয়ে সরে এল। বাগানের ঘাসে একবার পায়চারি করে ঘরে ফিরল। তারপর বনশ্রীও ফিরল। হেমন্ত তখন প্যান্টশার্ট ছেড়ে পায়জামা পরছে। খালি গা।

বনশ্রীর মুখে আলতো হাসি সত্ত্বেও হেমন্তের মনে হল কী দুর্ভাবনার ছায়া পড়ে আছে। হেমন্ত হাসবার চেষ্টা করে বলল—ভাবছিলুম, আবার সাদা ভূত দেখে ফিট হয়ে গেলে নাকি!

বনশ্রী চুল থেকে তোয়ালে খুলে বলল—তুমি স্নান করবে না?

—করব।

—কী হয়েছে তোমার?

—কেন? কী হবে?

বনশ্রী আর কিছু বলল না। শাড়ি ঠিকঠাক করে নিতে ব্যস্ত হল। ওর চুলের

দিকে হেমন্ত তাকিয়ে থাকে। কী বিশাল লম্বা চুল। চুলের গন্ধটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। হেমন্ত রাতের মতো আবিষ্ট হচ্ছিল। বনশ্রী চুলে কী মেখে এসেছে, কেমন একটা সোঁদা গন্ধ!

হেমন্ত বলল—আমি বরং গঙ্গায় স্নান করে আসি। ওখানে ঘাট আছে।

বনশ্রী মুখ টিপে হাসল।—হুঁ, যাও। পবিত্র হয়ে এসো। ইচ্ছে থাকলেও আমার পবিত্র হবার সাহস নেই। যা গভীর জল!

হেমন্ত বলল—আমি সাঁতার জানি।

তার পর বনশ্রীর হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে বেরুল। বনশ্রী বলল—সাবান?

—থাক। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

হেমন্ত হলঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে বনশ্রী দরজাটা বন্ধ করে একমিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তার পর আস্তে-আস্তে এ ঘরে ফিরল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে সে লক্ষ্য করল সিঁদুরটা আর নেই। মুখে সাবান দেবার সময় যেন নিজের অজান্তে সাবানের ফেনা ঘষেছে সিঁথিতে। ভুরু কুঁচকে নিজের সিঁথি দেখতে থাকল সে।

হেমন্ত কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে, সে টের পেয়েছে। একটু উদ্বিগ্ন হল বনশ্রী। আর সেই সময় ওপাশে বাগানের দিকের জানলায় ডিম্বুর মাথার ওপরটা চোখ অব্দি দেখা গেল। বনশ্রী তাকাতেই সে ধুপ্ করে নেমে গেল। তখন বনশ্রী সেই জানলার কাছে গিয়ে ডাকল—ডিম্বু।

তখন নান্নুমিয়ার পুত্রের চাকচিক্য দেখে বোঝা যায় স্নান করেছে। টেড়ি বাগিয়েছে লম্বা চুলে। কিন্তু উদোম গা এবং সেই একই নোংরা ছেঁড়া হাফ-পেন্টুল। রোদে ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে সে মিটিমিটি হাসছিল।

বনশ্রী ডাকল—ডিম্বু শুনে যা।

—সাব মারবে। নেহি যাবে মেমসাব।

—ধুর বোকা! সায়েবটায়েব নেই। আয়, শোন না।

—সাচ?

—হ্যাঁ। স্নান করতে গেছে তোর সায়েব। ঘরে আয় না।

ছোঁড়াটা ভয়ে-ভয়ে পুবের দরজায় এসে দাঁড়াল। তারপর উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখে নিঃসংশয় হল। আস্তে পা বাড়িয়ে সে ভেতরে চলে এল। ঘরের ভেতরটা ঘুরে-ঘুরে দেখতে থাকল।

বনশ্রী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলল—তুই অমন করে কী দেখিস রে ডিম্বু?

ডিম্বু ভীষণ লজ্জা পেল।—কুছ নেহি জী মেমসাব।

—ভ্যাট্! তুই অমন করে উঁকি মারিস কেন?

ডিম্বু মুখ তুলে ফচকেমি করে এক মিনিট হেসেই মুখ নামাল।

বনশ্রী তা গ্রাহ্য করল না। বলল—আচ্ছা ডিম্বু, তুই তো সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছিস। কোন সাদা লোক দেখেছিস? ভীষণ সাদা। না—না, সায়েব নয়। একরকম লোক থাকে না? যাদের গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে সাদা—তার ওপর একটু-আধটু কালো ছোপ…মানে…বুঝতে পারছিস না আমার কথা? মায়ের পেট থেকেই অমন হয়।

ডিম্বু জোরে মাথা দুলিয়ে বলল—জী হাঁ মেমসাব। ওহি তো সাদা জিন আছে। আদমি বন্‌কে ঘুম করে। আপনার মালুম হোবে আদমি, লেকিন উও তো জিন!

—বেশ। তাই হল। আজ তেমন কাকেও দেখেছিস?

—জী হাঁ দেখা।

বনশ্রী সোজা হয়ে বসল—সত্যি দেখেছিস?

—আঁখকে কিরিয়া মেমসাব। আভি দেখা—এক দো ঘণ্টা আগে ভি দেখা।

—বারো গম্বুজের পিছনের ঘাটে?

—জী, জী। দেখতে হাম জোর ভাগা। ছোঁড়াটা হাসতে থাকল।

—ওই পাঁচিলের ওপাশে দেখছিস?

—জী মেমসাব। নহবতখানামে। উও দেখিয়ে নহবতখানা।

বনশ্রী নহবতখানা কোথায়, দেখার জন্য উঠল না। বলল—তুই তোর বাবাকে এত গাল দিস কেন রে?

ডিম্বু মুখ ভেংচে বলল—উও বহুত হারামী লোক আছে। হামাকে গালি দেয়।

—আহা! তোর বাবা তো বটে।

—ছোড়িয়ে জী! বাবা, না ডাবা আছে!

—হ্যাঁ রে, তোর মা নেই?

ডিম্বু মাথা দুলিয়ে বলল—উও ভি বহুত খচ্‌রি লড়কি ছিল। দেখিয়ে না, হামকো ক্যায়সা মারা। বলে সে ঘুরে পিঠ দেখিয়ে দিল। পিঠে একটা ক্ষত-চিহ্ন।

বনশ্রী বলল—নিশ্চয় দুষ্টুমি করেছিলি।

ডিম্বু সেকথার কোন জবাব দিল না। সে ঘুরে জানলার কাছে গিয়ে বাগান দেখতে থাকল।

বনশ্রী বলল—সেই সাদা লোকটাকে আগে কখনও দেখেছিস?

—জী নেহী মেমসাব।

—আজই প্রথম দেখলি তো?

—জী।

বলেই সে চেঁচিয়ে উঠল—ও বে শালা! পাটোয়ারিজীকো বোল দেগা! ভাগ্

—ভাগ্। তারপর খরগোশের মতো দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাগানের দিকে।

বনশ্রী উঠে গিয়ে দেখল, একটা ছেলে বাগানের কোনায় কচি আমগাছের দিকে ঢিল তুলেছিল। ডিম্বুকে দেখেই সে নিচু পাঁচিলে উঠে পড়েছে। তার পর লাফ দিয়ে ওপাশে পড়ল। একটু পরে ডিম্বুও সেভাবে পাঁচিল পেরিয়ে চলে গেল। তারপর বাগানে নির্জনতা। কোথায়-কোথায় কোকিল ডাকছে। গাছের পাতায় শুকনো পাতা সরিয়ে এক ঝাঁক ছাতারে পাখি পোকা খুঁজে খাচ্ছে। তারপর একটা ঘূর্ণি এল কোনাকুনি পাতা উড়িয়ে নিয়ে। ঘূর্ণিটা পাঁচিলের ওপারে যেতেই অনেকটা উঁচু অব্দি ধুলো উঠে গেল। বাগানের গাছের পাতায় তখনও তোলপাড় চলেছে।

বনশ্রী ঠোঁট কামড়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। হেমন্ত স্নান করে ফিরতে বড় বেশি দেরি করছে যেন। একা থাকা মানেই নিজের মুখোমুখি হওয়া। ডিম্বুটা এসে পড়েছিল, সেও চলে গেল। স্নানঘরে এতক্ষণ একা নিজের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হয়েছে। সে এক প্রচণ্ড ঝড় গেছে। আবাব সেই ঝড়টা আসছে।

পুবের বাগানের দিকের দরজাটা সে দ্রুত বন্ধ করে দিল। কপাটে পিঠ রেখে দীর্ঘ আধমিনিট দাঁড়াল। তারপর সরে বিছানার পাশে এল।…

হেমন্ত কিছু একটা আঁচ তো করেছেই—এবং করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কীভাবে ওকে সব খুলে বলবে, সে ভেবে পাচ্ছে না। সব শুনে হেমন্ত নিশ্চয় বলবে—আগে কেন বলো নি? তুমি আমাকে ঠকাতে চেয়েছিলে।

আর হেমন্ত তাকে ঘৃণা করবে। ঘৃণা না করে পারেই না। অথচ বনশ্রীর ভালবাসায় তো এতটুকু খাদ নেই। হেমন্তকে প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকে সে নির্ভরযোগ্য মনে করেছিল। ওর মধ্যে একটা ডালপালাওলা বড় গাছের অস্তিত্ব আছে যেন। সব কিছুতে ওর প্রখর দৃষ্টি—বনশ্রীর ভালমন্দে সুখদুঃখে যেন ওর প্রচণ্ড আগ্রহ আর সহানুভূতি এতদিন টের পেয়েছে বনশ্রী। আসাব সময় ট্রেনে বনশ্রীর কাপড় থেকে কয়লার গুঁড়ো সাফ করে দেওয়ার মধ্যে বনশ্রী একধরনের সাংসারিক নিষ্ঠার আভাস পেয়েছে। খাওয়ার সময় ওর এত যত্ন। বনশ্রীর স্বাস্থ্যের দিকে ওর অত দৃষ্টি। অথচ একটু আগে বনশ্রী মূর্ছিত হয়ে পড়ল, হেমন্ত তারপর যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল। কোন হইচই করল না, ডাক্তার ডাকার কথাও তুলল না।…

নাকি দুজনের পরিচয় ফাঁস হবার ভয়ে?

বনশ্রী ঠিক ধরতে পারছে না। খালি মনে হচ্ছে, হেমন্ত খুব বুদ্ধিমান ও খরদৃষ্টি বলেই একটা কিছু আঁচ করেছে।…

বনশ্রীর মাথাটা ঘুরে উঠল। সে তক্ষুনি খাটে বসল। তারপর একেবারে শুয়ে পড়ল।

চার

বনশ্রী দরজা খুলতে দেরি করছে দেখে হেমন্ত একটু ভয় পেয়েছিল, আবার অজ্ঞান হয়ে যায় নি তো? বনশ্রীর সম্ভবত ফিটের অসুখ আছে, তাকে বলে নি। থাকা তো স্বাভাবিকই। হেমন্ত আর একটু ঘুরে বাগানের দিকে গেল। জানলায় উঁকি মেরে দেখল, বনশ্রী চোখ বুজে শুয়ে আছে। সে ডাকল—বনশ্রী! বনশ্রী!

আরও কয়েকবার ডাকার পর বনশ্রী চোখ খুলল। চোখ লাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর সে হুড়মুড় করে উঠে বসল। হেমন্ত বলল—কী ব্যাপার? ঘুমচ্ছিলে?

অপ্রস্তুত হেসে বনশ্রী দরজা খুলে দিল। হেমন্ত ফের বলল—অনেকক্ষণ থেকে ডাকছি। তারপর ঘুরে এদিকে এলুম। দেখি, শুয়ে আছ।

—তোমার দেরি দেখে ঘুমিয়ে নিচ্ছিলুম।

হ্যাঁ, একটু দেরি হয়েছে।

—এতক্ষণ সাঁতার কাটছিলে নাকি?

হেমন্ত ভিজে কাপড় বদলাচ্ছিল। বলল—তোমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে!

বনশ্রী জোরে মাথা দোলাল।—না অসুস্থ হব কেন? বলে সে চাপা হাসল। ফের বলল—সারারাত তো ঘুমোতে দাওনি। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল।

হেমন্ত বাইরে গিয়ে তারে কাপড় মেলে দিয়ে এল। তারপর চুল আঁচড়াতে থাকল চুপচাপ। তার পর চিরুনী থেকে চুল থাক করে ফেলতে গিয়ে হাসল।—আমার চুল পাকতে শুরু করেছে লক্ষ্য করেছ? এই দেখ। বলে একটা সাদা চুল বেছে বনশ্রীর চোখের সামনে ধরল।

বনশ্রী চুলটা নিয়ে একবার দেখে হাসতে হাসতে বাইরে ফেলে দিল। বলল—খুঁজলে হয়তো আমারও না পাবে এমন নয়। এমন সবারই পাকে।

—কে জানে! কিন্তু আমি তোমাকে বয়স লুকোই নি। এই মার্চে বেয়াল্লিশে পড়েছি।

—আমিও কম নই। তোমাকে আমিও বয়স লুকোই নি।

—বত্রিশ বলেছ। বত্রিশ হয়তো নয়…

—কত শুনি?

—পঁচিশ-টচিশ।

—তার চেয়ে বলো কুড়ি-টুড়ি! শুনে মন নেচে উঠবে।

—হুঁ, তাই দেখায় তোমাকে।…বলে হেমন্ত খাটের পাশ দিয়ে ঘুরে দক্ষিণের জানলায় গেল।

বনশ্রী হেমন্তকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল। দূরবর্তী অঞ্চলে ঝড়বৃষ্টির আভাস যেমন মেলে দিগন্তে হঠাৎ-হঠাৎ দুচারবার ঝিলিকে এবং ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্বাদে,

অথচ এখানে গুমোট স্তব্ধতা ও গরম—তেমন কিছু কি দেখতে পাচ্ছে হেমন্তের মধ্যে? বনশ্রী এ মুহূর্তে মনে মনে মাথা কোটার মতো ভাবছিল, ওকে সব খুলে বলব—সব। কিচ্ছু লুকোব না। ও কি বুঝবে না? ও তো আমাকে ভালবাসে। আমিও ওকে ভালবাসি। তাই না নিজেকে উজাড় করে যা ছিল সবই তুলে দিতে চেয়েছি ওকে? এতটুকু বাধা রাখিনি। এতটুকু গোপন করিনি নারীর কাছে পুরুষের যা প্রাথমিক পাওনা?

হেমন্ত বলল—গঙ্গার ধারে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল।

বনশ্রীর আবেগের ওপর বিরাট পাথরের মতো কথাগুলো এসে পড়ল। কতকটা অস্ফুট চিৎকারের ভাষায় বনশ্রী বলল—সাদা লোকটা?

—সাদা লোকটা। দ্যাট অ্যালবিনো ম্যান।

বনশ্রী মুহূর্তে সহজ ও শান্ত হয়ে গেল।—বাইরের, না লোকাল ম্যান?

—বাইরের। কলকাতার।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বনশ্রী মনে মনে তৈরি হয়ে বলল—তারপর?

—ওর সঙ্গে গল্প করতে-করতেই এত দেরি।

—কিসের গল্প?

হেমন্ত ঘুরে কেমন হাসল।—এই ঐতিহাসিক জায়গার দ্রষ্টব্য স্থান সম্পর্কে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে।

বনশ্রী এক পা এগিয়ে বলল—মিথ্যে বলছ কেন?

—তুমিও বলেছ, তাই।

বনশ্রী মুখ নামাল। একটু পরে যখন মুখ তুলল, তখন ওর নাসারন্ধ্র স্ফীত। নাকের ডগায়, কপালে ও থুতনিতে ঘামের ফোঁটা। তার ঠোঁট কাঁপছে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। আরও কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর ভাঙা গলায় বলল—আমাকে ক্ষমা করো।

সে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। একটু দাঁড়াল। তারপর জানলার কাছে গেল। তারপর জানলা দিয়ে বাগানের দিকে তাকাল। হেমন্ত বলল।—কী?

—আমি কি চলে যাব?

—কেন?

—আমি মিথ্যাবাদী।

হেমন্ত দ্রুত এসে তার সামনে দাঁড়াল। তার দু কাঁধে হাত রেখে বলল—তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমার কাছে তোমার পিছনের সব ব্যাপার মিথ্যা। আমার কাছে একমাত্র সত্য যা—তা তুমি। যদি কেউ বলে, তোমার শুধু স্বামী নয়—ছেলেমেয়েও আছে, আমার একটুকু খারাপ লাগবে না। কারণ তো বললুম, তোমাকে—শুধু তোমাকেই আমি চেয়েছি। এখন চাইছি। সারাজীবন চাইব।

বনশ্রী ওর বুকে মুখ গুঁজল। ভাঙা গলায় বলল—আমার সবটাই মিথ্যে নয়।

তুমি বিশ্বাস করো।…

হলঘরের সদর দরজায় নান্নুমিয়ার ডাক শোনা গেল—বড় সাব? হামি নান্নু আছি।

হেমন্ত বলল—খাবার এসে গেছে।

বনশ্রী বাগানের দিকের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। হেমন্ত হলঘরে ঢুকল।

নান্নুমিয়া একটা মস্তো টিফিন কেরিয়ার এনেছে। দুটো প্লেটও এনেছে। তাকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ দিল না হেমন্ত। বলল—ঠিক আছে। তুমি ওবেলা এসে এগুলো নিয়ে যেও। নান্নুমিয়া চলে গেল।

হেমন্ত ডাকছিল—বনশ্রী! এগুলো ধরো।

বনশ্রী একটু ইতস্তত করে হলঘরে গেল। তারপর নিঃশব্দে টিফিন কেরিয়ার আর প্লেট দুটো নিয়ে এল। হেমন্ত সদর দরজাটা বন্ধ করল।

এ ঘরে এসে হেমন্ত বলল—আশা করি, এখন ক্ষিদের সময় ওসব কোন কথা তুলবে না। বলবে না যে ক্ষিদে নেই। আফটার অল, ছেলেমানুষী করার বয়স দুজনেই পেরিয়েছি।

হেমন্ত ওর হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসাল। বনশ্রী কুণ্ঠিত স্বরে বলল—তুমি তো দেখেছ, আমার ক্ষিদে কম। খাই কতো কম! প্লীজ, জোর কোরো না। বমি হয়ে যাবে।

হেমন্ত বলল—জোর করব না। শুধু বলব, যা কিছু ঘটুক—আমরা হাসি মুখে উড়িয়ে দেব সব।

বনশ্রী কিছু বলল না। তার মুখে এখন নির্বিকার শান্ত ভাব, দৃষ্টি ঠাণ্ডা। সে গৃহিণীর মতো পারিপাট্যে টিফিন কেরিয়ার থেকে প্লেটে খাবার সাঁজাতে থাকল। হেমন্ত দেখল, নিজের প্লেটে খুব কম ভাত নিল বনশ্রী। রাতেও প্রায় এমনি খেয়েছিল। জীবনের ভেতরে গণ্ডগোল থাকলে খাওয়ার মতো আবশ্যিক ব্যাপারেও মানুষ উদাসীন হয়ে পড়ে। হেমন্ত মমতায় আপ্লুত হয়ে ফের বলল—ঠিক আছে। যা পারবে, খাও। কিন্তু মাইণ্ড দ্যাট, শরীর একটা ভাইটাল জিনিস। তাই না?

বলেই সে চোখে একটু অশালীন ঝিলিক তুলে হাসতে থাকল। বনশ্রীর মনে হল, হেমন্ত তার শরীরকেই হয়তো বেশি ভালবাসছে।…

যতক্ষণ খাওয়া চলল, আর কোন কথা হল না। বাগানের দিকের দরজায় গিয়ে ওরা একে-একে আঁচাল। তারপর হেমন্ত তোয়ালেতে হাতমুখ মুছে সিগারেট ধরাল। বিছানায় এসে বসল। বনশ্রী একটা চেয়ার টেনে কাছাকাছি বাগানের দিকের দরজার মুখোমুখি বসল।

টিফিন কেরিয়ারটা টেবিলের ওপরই রাখা আছে। এঁটোগুলো প্লেটে তুলেছে বনশ্রী। দুটো প্লেট টেবিলের তলায় রেখেছে। টেবিলে জল ছড়িয়ে হাতেই

মুছেছে। হেমন্ত খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে। রাতে এই সংসারীপনা বা গৃহিণীসুলভ পারিপাট্য দেখে হেমন্ত একটু অবাক হয়েছিল। এখন আর অবাক হবার কিছু নেই।

বনশ্রী বলল—ড়িম্বুটা এলে ভাল হত। অনেক খাবার থেকে গেল।…বলে সে চেয়ার থেকে উঠে বাইরে গেল। সিঁড়ির ওপরকার মার্বেল চত্বরে দাঁড়িয়ে বাগান খুঁজতে থাকল।

হেমন্ত বলল—ছেড়ে দাও!

—তোমাকে কিন্তু বড্ড ভয় পায়! এখন ডাকলেও আসবে না হয়তো।

হেমন্ত হাসল।—উলঙ্গ রাজার গল্পটা মনে পড়ছে! আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, আমাদের মধ্যে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে, যা ওই ছোঁড়াটারও চোখে পড়েছে?

—তা কেন? অনেক ছেলের হয়তো একটা বিশ্রী কৌতূহল থাকে। পুরুষ ও মেয়েদের প্রাইভেট ব্যাপার সম্পর্কে।

হেমন্তের মনে হল, বনশ্রী পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়েছে এতক্ষণে। হেমন্ত বলল—কে জানে! উলঙ্গ রাজার গল্প আছে। কমবয়সীদের চোখে হয়ত অনেক কিছু ধরা পড়ে।

বনশ্রী বাগানের দিকে দৃষ্টি রেখেই বলল—তোমার পাটোয়ারিজীর চোখকে ফাঁকি দিতে পেরেছি বলে মনে করো তো?

—হুঁউ। কারণ, লোকটা টাকাপয়সার ব্যাপারে যত ধূর্ত। অন্য ব্যাপারে বোকা।

—আর তুমি তো সবেতেই বোকা!

হেমন্ত দেখল, বনশ্রী একটু হাসল। হেমন্ত বলল—কেন, কেন?

—আমাকে তুমি ধরতেই পারো নি?

—হুঁ, পেরেছিলুম।

বনশ্রী দ্রুত ঘুরে বলল—পেরেছিলে? কী পেরেছিলে?

হেমন্ত সতর্ক হল!—থাক গে। ছেড়ে দাও। আমাদের সবকিছুর ওপরে ভেসে থাকতে হবে। জীবনটা যেহেতু জটিল ব্যাপার। এবং শর্ট। এবং আমি দ্রুত যৌবনের বিকেলে পৌঁছে যাচ্ছি।

বনশ্রী জেদ ধরে বলল—আমি মরিয়া হয়ে গেছি। বল, কী ধরতে পেরেছিলে?

অগত্যা হেমন্ত হাসতে হাসতে বলল—দিনদুপুরে অশালীন কথাবার্তা বলা কি উচিত?

—এখন দুজনের মধ্যে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন ওঠে না।

—কিন্তু কথাটা অশালীন।

—হোক্। বলো।

—আঃ, ছেড়ে দাও না। বলবার কী? ও এমনি কথার কথা।

—না। বলো, কিভাবে ধরতে পেরেছিলে যে আমি অবিবাহিতা নই?

—প্লীজ বনশ্রী।

—না, আমি শুনতে চাই।

হেমন্ত হাল্কা সুরে বলল—জাস্ট এ জোক্।

—বলো।

—ওঃ! তুমি বড্ড সীরিয়াস হয়ে উঠলে বনশ্রী।

—হ্যাঁ। তুমি বলো।

হেমন্ত দুম্ করে বলল—মানে, ব্যাপারটা শারীরিক। শারীরিক ভঙ্গীর মধ্যে কুমারী মেয়ের আড়ষ্টতা ছিল না। আর এ ব্যাপারটা আমার অবাক লাগছিল। মনে হচ্ছিল, তুমি এতে অভ্যস্ত।

সে চুপ করল। বনশ্রীও চুপ করে আছে। বাগানে কোথাও তীব্রস্বরে ঝিঁঝিপোকা ডাকছে। আর মাঝে মাঝে বাতাসের শব্দ। দু একবার কোকিলের ডাক। এখানে প্রচুর কোকিল। আমের শেষ মুকুল শেষ গন্ধ দিয়ে ঝরে যাচ্ছে।

তারপর বনশ্রী ঘরে ফিরল। বলল—দরজাটা আটকে দিচ্ছি।

—দাও।

বনশ্রী তার পাশ দিয়ে বিছানায় উঠে গেল। শুয়ে পড়ল। হেমন্ত খাটের মাথার দিকে মাথাটা রেখে পা ছড়াল। তারপর বলল—রাগ করলে তো?

বনশ্রী চোখ বুজে ছিল। বলল—না। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে এসব?

—কী?

—কুমারী মেয়েদের আড়ষ্টতা, না কী বললে!

—ওটা ইনটুইশান!

—বিশ্বাস করি না।

—তাহলে বলব, সেক্সলজি পড়ার জ্ঞান।

—তাও বিশ্বাস করি না।

তাহলে তুমিই বলো!

—তুমি রাগ করবে।

—তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, করব না। হেমন্ত ওর একটা হাত নিল।

—আমারও মনে হচ্ছিল, তুমি ওসব ব্যাপারে অভ্যস্ত!

হেমন্ত শুকনো হাসল।—আমার চরিত্রদোষ আছে বলছ?

—না।

—তবে?

—বিবাহিত পুরুষের সবকিছু আমি জানি কি না।···বনশ্রী চোখ বুজে ছিল,

এবার সেই অসহায় শান্ত হাসি ঠোঁটে রেখে বলল কথাটা।—আমি জানি সব। তাদের শরীর—এবং তখন কীসব হয়…। শেষ কথাটা শ্বাসপ্রশ্বাসে মিশে গেল।

হেমন্ত বিছানায় কনুই রেখে এবং হাতের তালুতে মাথা রেখে তার দিকে ঘুরে বলল—সত্যি বলছ? তোমার তাই মনে হচ্ছিল?

—হ্যাঁ। বনশ্রী ফের শ্বাসপ্রশ্বাসে মিশিয়ে কথা বলল—ঠিক তাই মনে হচ্ছিল।

হেমন্ত হাত থেকে মাথা নামিয়ে বিছানায় চিত হয়ে শুলে। দুজনের মধ্যে প্রায় কুড়ি ইঞ্চি ফারাক। বনশ্রী নিজের মাথা তুলে একটা বালিশ ওর মাথার তলায় গুঁজে দিল। হেমন্ত বাধা দিল না। দুজনে একই ভঙ্গীতে চিত হয়ে শুয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে বনশ্রী আস্তে বলল—যা কিছু ঘটুক, আমি তোমাকে ভালবাসব। আমাব আর ফেরার পথ নেই। জীবনটা নিয়ে আমি জুয়া খেলতে নেমেছি।

হেমন্ত বলল—আমিও কি নয়?

—কে জানে!

—কে জানে নয়। আমারও আর ফেরার পথ নেই—যা কিছু ঘটুক। কারণ, সাবাটা জীবন—হোল লাইফ—আমাব সাবা যৌবন কীভাবে কাটছিল, তোমাকে বোঝাতে পারব না। চাকরিবাকরির ব্যাপারটা তুলছি না—আমার প্রাইভেট লাইফ। ওঃ, বীভৎস!

অস্ফুট হাসল বনশ্রী।—তোমাব বউ বুঝি খুব দজ্জাল মেয়ে?

হেমন্ত জবাব দিল না। সেও এবার চোখ বুজেছে।

—এ্যাডজাস্টমেন্টেব অভাব?

হেমন্ত চুপ করে থাকল।

বনশ্রী তার পাঁজরে আঙুলের গুঁতো দিয়ে বলল—বলো না! আমার খারাপ লাগবে না। তুমি আমার কথা তো সবই জেনে গেছ। তোমারটা শুনতে চাই। জানা দরকাব। বলো!

হেমন্ত বলল—তোমার তেমন কিছু আমি জানতে পারিনি। ভদ্রলোক বস্তুত আমাকে তেমন কিছুই বলেন নি। তুমি নিজেই ধরা দিয়েছ।

বনশ্রী বলল—আমার উপায় ছিল না। আমাকে ক্ষমা করো।

—ভদ্রলোক গঙ্গাব ধারে ঘোরাঘুরি করছিলেন। আমিই যেচে আলাপ করলাম। কথায় কথায় বললুম—আপনার কি কিছু হারিয়েছে? তখন থেকে লক্ষ্য করছি, গঙ্গার ধারে এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কী যেন খুঁজছেন! তো বললেন—দেখছেন তো! রোদে দেখতে বড্ড কষ্ট হয়। আমার ব্যাগ থেকে একটা দামী কাগজ পড়ে গেছে! তখন থেকে খুঁজছি!

বনশ্রী ওকে থামতে দেখেও কোন কথা বলল না।

হেমন্ত একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—ওঁকে সাহায্য করতে চাইলুম। ওদিকে নহবতখানা—এদিকে বারোগম্বুজের ঘাট অব্দি দুজনে ঘুরলুম। বারো-গম্বুজের ঘাটে সত্যি কাগজটা পড়েছিল।

—কী কাগজ? বনশ্রী এবার ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠল। তার ভুরু কুঁচকে গেল।

হেমন্ত তা লক্ষ্য করে বলল—একটা খাম। খামের মধ্যে একটা ফোটো ছিল। একটি বাচ্চা ছেলে আর তার মায়ের। আমি দেখতে চাইনি। নিজেই দেখালেন।

—তুমি নিজের পরিচয় দিয়েছিলে?

—না। বলেছিলুম, লোকাল লোক।

—তোমাকে ছবি দেখালেন কেন?

—জানি না।

—ব্যাপারটা সাজানো মনে হয় নি তোমার?

—না তো! কেন?

—ওকে যত সরল ভাবছ, তত নয়।

হেমন্ত হাসল।—দেখে এবং কথা বলে তেমন কিছু মনে হয় নি।

—তুমি জিগ্যেস করো নি, কেন এখানে এসেছে?

—হুঁউ। নিছক ট্যুরিস্ট।

—আমাদের আনাচে-কানাচে ঘুরছে। তবু কিছু বুঝতে পারছ না? বনশ্রীর কণ্ঠস্বর তিক্ত শোনাল। এবার তার কণ্ঠস্বরে চেপে রাখা কান্নার আভাস। অবশ্য সে স্থির—এতটুকু নড়ছে না।

হেমন্ত বলল—তুমি এখানেই আসছ, একথা কি কাকেও বলেছিলে?

বনশ্রী একটু চুপ করে থাকার পর বলল—একজনকে বলেছিলুম। বলার দরকার মনে করেছিলুম। কারণ, দৈবাৎ এ্যাক্‌সিডেণ্টে যদি পড়ি—কিংবা কিছু, বাবা-মা অন্তত জানবেন—তাই। তাছাড়া আমার মনে হয়েছিল, বাইরে খানিকটা দূরে যাচ্ছি তো—কাকেও জানিয়ে রাখা উচিত।

—কাকে জানিয়েছিলে?

—তুমি তাকে দেখেছ। প্রথম দিন আমার সঙ্গে তোমার অফিসে গিয়েছিল। শর্বরী মিত্র নামে মেয়েটি—বেঁটে, একটু গোলগাল।

—ওকে কতটা বলেছ?

—সামান্যই। আমার জীবনের অনেক ব্যাপার ও জানে।

হেমন্ত কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল—তোমার জীবনের অনেক ব্যাপার আমি এখনও জানি না।

একথায় বনশ্রী প্রথমে আবেগে অস্থির হয়ে নড়ে উঠল, যেন নিজেকে আর সামলাতে পারছে না—তারপর চাপা কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলল। অনেকটা সামলে নিতে পেরেছে এভাবে এবং রুগ্ন মানুষের কণ্ঠস্বরে বলল—এইটে বাদে তোমাকে আর যা

সব বলেছি, একটুও মিথ্যা নয়। কিন্তু জানি, আর তো তুমি আমাকে বিশ্বাস করতেই পারবে না।

হেমন্ত হাল্কা স্বরে বলল—আমার কাছে এখন তুমি ছাড়া আর সবকিছু মিথ্যা। যে-তুমি এখানে আমার এত কাছে আছ, সেই তুমির কথাই বলছি।

তারপর হেমন্ত ওকে কাছে টানল এবং সতর্কতার জন্যে কোন জানলায় সেই অকালপক্ক ছোঁড়াটা উঁকি দিচ্ছে কি না দেখেও নিল। বনশ্রী বাধা দিল না। কিন্তু হেমন্ত তত শক্তি প্রয়োগ করে নি, যাতে দুটো শরীরই এক হয়ে যায়। তার ফলে বনশ্রীর মাথাটাই যা এল তার বুকের ওপর এবং বনশ্রীর চিবুক বিদ্ধ হল তার বুকে। ছ সাত ইঞ্চি ব্যবধানে দু'জোড়া চোখ পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে রইল। দুজনে দুজনের শুধু চোখ দুটোই যা দেখতে পাচ্ছিল। আর বাকিটা অস্পষ্ট—একটা প্রতিভাসের মতো।

বনশ্রী বলল—কয়েক মাস ওর কাছে থেকে বাবা-মায়ের কাছে চলে এসেছি। আমার ফেরার ইচ্ছে ছিল না। আর নেইও।

—তোমার ছেলে?

—ওর কাছে আছে।

—ছেলের বয়স কত এখন?

—সাতবছর তিন মাস।

—ছেলের জন্যে তোমার মন খারাপ করে না?

—অন্তুকে ও দেয় নি। দেবেও না কোনদিন।

হেমন্ত চুপ করে থাকল। তারপর তার মনে হল ছ'সাত ইঞ্চি দূরে একটা কিছু ঘটছে। সে দুহাতে বনশ্রীর মুখ তুলে ধরল। হুঁ, বনশ্রীর চোখে জল। এবং ইতিমধ্যে ফোঁটাগুলো গড়িয়ে পড়ছে। দুটো গালই দেখতে দেখতে ভিজে গেল। হেমন্তের দুটো তালুও ভিজল। তখন হেমন্ত বলল—চেষ্টা করব তোমার ছেলেকে যদি এনে দিতে পারি। বলো, করব চেষ্টা?

ভাঙা গলায় বনশ্রী বলল—তারপর তো ও আবার কেড়ে নিয়ে যাবে।

হেমন্ত খুব সাহসের সঙ্গে বলতে যাচ্ছিল—তুমি আমার কাছে থাকবে এবং তোমার ছেলেও থাকবে, কিন্তু বলতে পারল না। বালিশের পাশে হাত বাড়িয়ে সিগারেট খুঁজল।

বনশ্রী ওর বলতে যাওয়ার আবেগ এবং ঠোঁট ফাঁক করেই বন্ধ করে দেওয়া লক্ষ্য করেছিল। বলল—কী?

হেমন্ত প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে রাখল। বলল—জেলে দাও।

বনশ্রী দেশলাই নিল ওর হাত থেকে। জ্বালার চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্যানের হাওয়া ঘুরপাক খাচ্ছিল। তখন সে উঠে বসল এবং খাট থেকে নেমে গিয়ে সুইচ অফ্ করল। অগোছাল শাড়ি গুছিয়ে নিতে-নিতে বিছানার ধারে হেমন্তের পাশে

এসে বসল। দেশলাই জ্বালল। তিনবারে তার সিগারেট ধরাতে পারল হেমন্ত। বনশ্রী পাশে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে হেমন্ত একটু হাসল।—তখন তোমাকে একটা প্রকাণ্ড প্রতিশ্রুতি দিতে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আইন নামে ব্যাপারটা আছে।

বনশ্রীও একটুখানি হাসল।—আমি ডিভোর্সের জন্যে মামলা করতে পারি। তুমি তো পারছ না! আর তা করতে বলছিও না তোমাকে। বলবও না। কেন বলব? আমি হয়তো এত স্বার্থপর নই।

হেমন্ত বিব্রত মুখে তাকাল—তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না হয়তো।

—বলো না! বুঝতে চেষ্টা করব অন্তত।

—কষ্ট পাবে। আমাকে প্রতারক ভাববে।···সে দ্রুত বলতে থাকল। ভাববে নয়, ভেবেছ ইতিমধ্যে। তোমাকে দোষ দিইনে বনশ্রী। সত্যি আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার উপায় ছিল না। তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কী যেন ঘটে গিয়েছিল আমার মধ্যে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত যন্ত্রণা আর তৃষ্ণা—তৃষ্ণা আর যন্ত্রণা—তারপর সামনে এলে তুমি। নিজেকে বাগ মানাতে পারিনি।

বনশ্রী বলল—ওটা আমারও কথা।

উৎসাহে হেমন্ত বলল—কিন্তু বাকিটা আমার বেলায় কোয়াইট ডিফারেণ্ট।

বনশ্রী তাকাল ওর দিকে।

—তুমি তোমার স্বামীকে অস্বীকার করতে পেরেছ! তুমি তাকেও হয়তো ঘৃণাও করো। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে অস্বীকার করতে পারিনি। পারছি না। আর ঘৃণা—না, তাকে ঘৃণাই বা করতে পেরেছি কোথায়! করুণা করে আসছি বরাবর। হ্যাঁ, করুণা ছাড়া আর কিছু নয়। ওর বোকামি, ওর হঠকারিতা, ওর সবতাতে বাড়াবাড়ি—সবকিছুতে একসময় ক্ষেপে গেছি। ওর গায়ে হাতও তুলেছি কত সময়। তারপর অনুতপ্ত হয়েছি। ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। ওর জন্যে মমতা হয়েছে। কেন জানো? ওর কেউই নেই। না বাবা-মা, না ভাই-বোন,—কিংবা কেউ—যে ওকে আশ্রয় দিতে পারবে।···

হেমন্ত থামল। এত কথা বলার পর তার শ্বাসপ্রশ্বাসে স্বাভাবিকতার দরকার ছিল। আর বনশ্রীর চোখের দৃষ্টি যেন শূন্য, নিষ্পলক, অক্ষিকোটরে বসানো দুটো কাচের টুকরো। সে কোন কথা বলল না। স্থির বসে রইল।

হেমন্ত একটু পরে ফের মুখ খুলল।—তের বছর আগে শাশ্বতীকে আমি বিয়ে করেছি। না—প্রেমজ বিয়ে নয়। ওকে একবার দেখেই পছন্দ করেছিলুম। যাক্, তোমার খারাপ লাগছে।

বনশ্রী যেন জাগল। একটা হাত হেমন্তের বুকে আলতো করে রেখে বলল—না। বল। আমি শুনতে চাই।

হেমন্ত ওর সেই হাতটা নিল। হাতে সোনার কাঁকনটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে থাকল সে।—আমিও তখন বড় গরীব ছিলুম। মাসে একশো পঁচিশ টাকা মাইনে পেতুম। বাবা-মা বেঁচে ছিলেন। নাবালক ভাইবোন ছিল। অথচ হঠকারিতায় বিয়েটা করে বসলুম। তখন যে-অফিসে এল. ডি. ক্লার্কের চাকরি করি, সেই অফিসের এক ভদ্রলোকের সূত্রে যোগাযোগ ঘটেছিল। শাখীর বাবার বন্ধু ছিলেন ভদ্রলোক। শাখীকে নিয়ে ওর মা থাকত একটা বস্তি এলাকায়। খুব ট্রাজিক অবস্থা। স্কুল ফাইনাল দেবার আগেই শাখীর বাবা মারা যান। বেসরকারী চাকরি। কাজেই বুঝতেই পারছ! শাখীর আর পড়া হল না। যাই হোক, সে লম্বা কাহিনী। শাখীকে বিয়ে করে ফেললুম।

হেমন্ত আরেকটা সিগারেট বের করে আগের সিগারেটের আগুনে ধরিয়ে নিল। বুকে কিছু ছাই পড়ল। বনশ্রী সেগুলো দ্রুত সাবধানে সাফ করে দিল। বলল—বলো।

—শাখীর একটা এ্যামবিশান ছিল। আরও পড়াশোনা—এইসব। কিন্তু আমার ফ্যামিলিতে একগাদা লোক। মা অসুস্থ মানুষ। কাজেই সামলাতে হয়েছে। কিন্ত একটা অদ্ভুত ব্যাপার, শাখী হাসিমুখে সে-ঝামেলা সয়েছে। দারুণ গিন্নিপনা ওর বরাবরই। নিজে না খেয়ে দেওর-ননদদের খাইয়েছে। আমার তখন দুঃখকষ্টের দিন। সে পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। বনশ্রী, আমি অকৃতজ্ঞ নই। স্বার্থপর নই। দায়িত্ববান সংসারী মানুষ। বনশ্রী, তুমি যাই ভাবো, আমি দায়িত্ববান স্বামীও ছিলুম। হয়তো এখনও তাই আছি।...

বনশ্রী একটু হেসে হাল্কাস্বরে বলল—এবং দায়িত্ববান প্রেমিকও।

—কে জানে!

—আমি জানি।

—শাখীর এ্যামবিশান ছিল। আমার উচিত ছিল ওর প্রাইভেটে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেওয়া। হয়ে ওঠে নি। বিয়ের দুবছর পরেই ওর বাচ্চা হল। ছেলে।

বনশ্রী মুখে স্নেহের ভাব ফুটিয়ে সহজ স্বরে এবং হেসে বলল—নাম কী তোমার ছেলের?

—শুভ। শুভেন্দু...

—কোন্ ক্লাসে পড়ে?

—এবার ক্লাস সেভেন। একবছর ফেল করেছিল।...হেমন্ত তেতো মুখে বলল। ফেল করবে না কেন? দিনরাত্রি বাবা-মায়ে যা চলে! রাতদুপুরেও। হরিবল! বীভৎস!

বনশ্রী ওকথায় কান না করে বলল—আর ছেলেমেয়ে?

—ঋতু। মেয়ে। দুবছরের ছোট। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে। থ্রি।

—আর?

হেমন্ত দুঃখে হাসল।—পাগল! ওতেই তো অভিযোগের অন্ত নেই। ওর শরীর ওর রূপ আমি ধ্বংস করে ফেলেছি। ওর এ্যামবিশান পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিয়েছি!

—তোমার স্ত্রী নিশ্চয় সুন্দরী?

—তেমন কিছু নয়। মোটামুটি বাঙালী মেয়ে যেমন।...হেমন্ত সিগারেটের ছাই সাবধানে মাথার দিকে খাটের তলায় ফেলল। বলল—আরে! ফ্যানটা বন্ধ যে!

বনশ্রী মুখ তুলে ফ্যান দেখল। তারপর উঠে গিয়ে সুইচ টিপল। তাকে স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক দেখাচ্ছে এখন। পাশে এসে বসল। বলল—বলো।

হেমন্ত ঠোঁট উলটে বলল—আর কী! এই তো আমার শালা লাইফ! হেল! এদিকে চল্লিশ পেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হিসেব করতে বসে মাথা খারাপ হয়ে যায়। কতটুকু পেলুম? এত যে স্ট্রাগল করে-করে এতদিনে মোটামুটি খানিকটা সুখ সচ্ছলতা আনতে পেরেছি—কিন্তু তা আমার জন্যে নয়। আমার সংসারের জন্যে। আমি তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।

বনশ্রী আস্তে বলল—তোমার বউ ছেলেমেয়েদের দেখতে ইচ্ছে করছে!

—কেন?

—হয়তো তোমাকেই আরও নতুন করে দেখতে পাব, তাই।

—এর পরও তুমি কি আমাকে ভালবাসতে পারবে? পারছ?

—পারছি তো।

হেমন্ত উঠে বসল এবং সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে বলল—অসম্ভব। এরপর আমাকে ভালবাসা তোমার পক্ষে অসম্ভব। আমি তা বুঝি। তের বছর ধরে আমি স্ত্রীলোক নিয়ে ঘর করছি। যত পার্থক্য থাক স্ত্রীলোকে-স্ত্রীলোকে, কতকগুলো ফাণ্ডামেণ্টাল ব্যাপার আছে—যা কমন। আমি জানি, তুমি আমাকে ঘৃণা করছ। জানতুম যে ঘৃণা করবে। তবু এসব কথা বললুম তোমাকে। না বলে পারলুম না। আমার বিবেক বলল, কনফেস্ করা দরকার।

হেমন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তারপর শান্ত হল। ফের বলল—তুমি বিশ্বাস করতে পারো—কোন একসময় কনফেস্ করতেই হত—আমার স্বভাবটাই এরকম। আমি কিছু চাপা দিয়ে রাখতে পারি না। অস্বস্তি হয়। কষ্ট হয়।

বনশ্রী ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে আমার সঙ্গে তোমার এসব ব্যাপারেও তো ভদ্রমহিলার কাছে তোমাকে কনফেস্ করতে হবে! হবে না?

হেমন্ত শান্ত এবং গাঢ়স্বরে বলল—মানুষ কার কাছে কনফেস্ করে জানো না? সবার কাছে তো কনফেস্ করা যায় না।

—কিন্তু তুমি তো ওঁকে ফাঁকি দিচ্ছ! এই যে তুমি বাইরে এসেছ আমার সঙ্গে, ওঁকে বলেছ আপিসের কাজে যাচ্ছি। তাই না?

হেমন্ত তাকিয়েই মুখ নামাল। বনশ্রী একটা জবাব আশা করছিল—টের পেয়ে সে হাসবার চেষ্টা করে বলল—জানো তো? যুদ্ধে আর প্রেমে অন্যায় কিছু থাকতে নেই?

বনশ্রী বলল—না। তোমাকে ছোট ভাবছি না। আমিও তো তাই করেছি। তোমাকে মিথ্যে বলেছি। প্রতারণা করেছি। তার চেয়েও বড় কথা—যদি না অন্তুর বাবা হঠাৎ এখানে চলে আসত, আমি সব গোপন রাখতুম। তোমাকে সমানে ফাঁকি দিয়ে যেতুম!

হেমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করার ভঙ্গীতে বলল—ভুলে যেও না, বারবার বলছি—তোমার এই বর্তমান-তুমিটাই আমার কাছে সত্য। তোমার পিছনের তুমি আমার দৃষ্টির বাইরে। তাকে নিয়ে আমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তোমার কথাটা এখনও জানতে পারিনি, বনশ্রী। তুমি কী ভাবছ?

বনশ্রী স্বাভাবিক হাসল। তার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল—আমি উল্টো কিছু ভাবছি না।

—এরপরও আমাকে তোমার ভালবাসা সম্ভব হবে? আমার সংসর্গ বরদাস্ত করতে পারবে? পারবে এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকতে?

বনশ্রী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।—ওই দেখ, পাজি ছেলেটা এতক্ষণে ডিউটি দিতে এসেছে। জানলার নিচের ঘুলঘুলিতে ওর চোখদুটো দেখছ?

দ্রুত হেমন্ত দরজা খুলে ফেলল। তারপর বাগানের দিকের সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে গর্জাল—বাঁদর! হতচ্ছাড়া! দেখাচ্ছি মজা!

এসময় হেমন্তর অন্য মূর্তি। বনশ্রী দরজায় গিয়ে হাসতে থাকল। হেমন্তকে সার্কাসের ক্লাউনের মতো দেখাচ্ছে। ঘাসে ঢিল খুঁজছে সে। ডিব্বু একটু দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বনশ্রী বলল—তোমার কেরামত খাঁকে এনেছে! দেখতে পাচ্ছ না?

খাসিটা একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে জুলজুলে চোখে তাকিয়ে আছে। তার গলার ঘণ্টিটা টুংটুং করে বাজল দুবার। বাগানে বিকেলের ফিকে সোনালি রোদ ঢেকে অনেকগুলো ছায়া দাঁড়িয়ে রয়েছে এদিকে ওদিকে। ডিব্বু আঙুল তুলে হেমন্তের দিকে দেখিয়ে কেরামত খাঁকে বলল--যাঃ যাঃ! ঢু ঢু ঢু ঢু ঢু···

আর খাসিটা মাথা নামিয়ে হেমন্তের দিকে আসতে থাকল। হেমন্ত আজ কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। হাসতে হাসতে সিঁড়িতে উঠে এল তক্ষুনি। খাসিটা এসে সিঁড়ির নিচে দাঁড়াল। ডিব্বু চেঁচিয়ে উঠল—বড়াসাব ভাগ গিয়া! খাঁসাব জিৎ গিয়া! বড়াসাব···এ বাপ! কোন আয়া বে!

হঠাৎ যেন সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে নিচু পাঁচিলে উঠল এবং ওপাশে নেমে গেল। হেমন্ত দ্রুত ঘুরে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। ডিব্বুর অমন চেঁচিয়ে পালানোর কারণ খুঁজছিল সে। কিন্তু কাকেও দেখার আগে বনশ্রীকে পাশে দেখতে

পেল না। বনশ্রী ভেতরে ঢুকে গেছে। তখন হেমন্ত ডাইনে বাগানের দক্ষিণের পাঁচিলের ওপাশে দেখতে পেল, সেই অ্যালবিনো ভদ্রলোক হেঁটে যাচ্ছেন। চোখে এখন আর সানগ্লাস নেই। ইতিমধ্যে ডিম্বুর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে ভদ্রলোক এদিকে তাকিয়েছিলেন কি না হেমন্ত জানে না। এখন সোজা গঙ্গার ধারে হেঁটে যাচ্ছেন। মুখটা গঙ্গার দিকে ফেরানো। হেমন্তও ঝটপট করে ঢুকে পড়ল। চাপা গলায় বলল—দেখতে পেয়েছেন তোমাকে?

বনশ্রী গম্ভীরমুখে বলল—কে জানে!

—খুব বেশি দূরে তো নয়। তিরিশ মিটার হবে। ওর পক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব কি?

বনশ্রী হেমন্তের এই ব্যাকুল প্রশ্নের জবাবেও বলল—জানি না।

এই সময় বাইরে গাড়ির চাপা গরগর শব্দ শোনা গেল। হেমন্ত দরজার কাছে এগিয়ে দেখে বলল—পাটোয়ারিজী আসছেন! জৈন মন্দিরে যাবার কথা ছিল যে! তুমি ঝটপট তৈরি হয়ে নাও তাহলে।

বনশ্রী দ্বিধাজড়িত পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে চিরুনী নিল। তারপর বলল—না বেরুলে চলত না?

হেমন্ত বলল—না, না। প্লীজ! আমরা তো জীপে যাব! বরং সানগ্লাস পরে নিও।

বনশ্রী একটু হাসল।—অবেলায় সানগ্লাস পরব! যাঃ।

জীপ থেমেছে ওদিকে। তারপর সদর দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শোনা গেল। হেমন্ত চাপা স্বরে বলল—প্লীজ বনশ্রী!

ও কী বলতে চায় বুঝে বনশ্রী বাধা দিল।—আঃ। ঠিক আছে। তুমি দরজা খুলে দাও না!

হেমন্ত দরজা খুললে পাটোয়ারিজী বললেন—ভেরি সরি হেমন্তবাবু! একটু দেরি হয়ে গেল। তবে খুব বেশি দূরে নয়। ঘোরার অনেক সময় পাবেন। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারছিনে, প্লীজ ব্রাদার, কিছু মনে করবেন না। আমাকে বাজারের ওখানে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার আপনাদের নিয়ে যাবে। যতক্ষণ খুশি ঘুরে ওখান থেকে সটান আমার বাড়িতে যাবেন। কেমন?

দুজনে এ ঘরে এল। বনশ্রী ঘুরে পাটোয়ারিজীকে নমস্কার করল। পাটোয়ারিজী বললেন—বৌঠানের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

বনশ্রী হেসে মাথা দোলাল। সে সবে শাড়ি বের করেছে।

বুদ্ধিমান পাটোয়ারিজী হেমন্তর হাত ধরে বললেন—আসুন, বাগানে গিয়ে সিগারেট খাই। বৌঠান তৈরি হয়ে নিন, বাই দি বাই, নাম্নুমিয়া চা আনছে। চা খেয়ে তবে বেরোব।

দুজনে বাইরে গেল। বাগানের কোনায় কেরামত খাঁ এবং ডিম্বু খেলা করছিল।

পাটোয়ারিজীকে দেখেই ডিম্বু আবার পাঁচিল পেরিয়ে অদৃশ্য হল। পাটোয়ারিজী হাসতে হাসতে বললেন—কেরামত খাঁয়ের সঙ্গে ঢু খেলা যাক্! হ্যালো খাঁসায়েব! ঢু ঢু ঢু ঢু…

পাঁচ

জীপ স্টার্ট দিল। গেটের কাছে ট্রে-হাতে নান্নুমিয়া দাঁড়িয়ে রইল। তার খচ্চর ছেলেটা জীপের পিছনে দৌড়চ্ছিল। নান্নু চেরা গলায় গাল দিচ্ছিল—আবে শালাকে বাচ্চে! ঘর যাওগি বে! আবে কুত্তাকে বাচ্চে!

পাটোয়ারিজী আর হেমন্ত বসেছে সামনে ড্রাইভারের পাশে। বনশ্রী পিছনের ঘুপটিতে। ঐতিহাসিক এলাকা ছাড়িয়ে নহবতখানার সুবিশাল ফটক দিয়ে জীপ ঢুকল ঘিঞ্জি বাজারে। হেমন্তর দৃষ্টি সতর্ক। সে একজন অ্যালবিনো মানুষ খুঁজছিল। ট্যুরিস্টদের জন্যে ফেরিওয়ালাদের ঝাঁক জমেছে ফটকের বাইরে। তাদের মধ্যে সাদা মানুষ দুচারজন সবসময় থাকে। হেমন্ত চমকে উঠছিল। কিন্তু তারা বিদেশী মানুষ—সায়েবমেম। ট্যুরিস্ট এবং নখদন্তহীন। পাটোয়ারিজী হেমন্তর কৌতূহল লক্ষ্য করে বললেন—এখন তো তলানি। শীতে আসতে বলেছিলুম। এলে দেখতেন কী অবস্থা। প্রতি সিজনে সায়েবমেম আসে গড়ে শ তিনেক। কম কী বলুন?

হেমন্ত শুধু হাসল। কাল বিকেল আর আজ বিকেলে কী সুদূর তফাৎ। আজ সে প্রতিমুহূর্তে অন্যমনস্ক এবং নার্ভাস। অদৃশ্য এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ভেতরে-ভেতরে লড়াই চলছে। আর প্রতি মুহূর্তে নিজের কাছে লজ্জা দ্বিধা মাথা হেঁট! বারবার মনে পড়ছে বনশ্রী পরস্ত্রী। এটা কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারছে না সে। আর জাগছে তীব্র একটা আশঙ্কা। বনশ্রীর স্বামী তো ইচ্ছে করলেই পুলিশে জানাতে পারে! যদি সত্যি তেমন কিছু করে বসে, কেলে ারির চূড়ান্ত হবে।

তেমন কিছু হলে ঠিক কী কী ঘটতে পারে ভেবে হেমন্ত কিছুক্ষণের মধ্যে হিম হয়ে গেল। সে ভাবল, বনশ্রীর কী? ও স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকেরা নাকি সবই পারে। একেবারে উলটো গাইতে পারে। সে কতসব গল্প শুনেছে। কাগজে এমন কত মামলার কেলেঙ্কারি পড়েছে। আইন এবং বিচার-বিভাগ মেয়েদের সম্পর্কে সবসময় যেন নরম। যেন যত দোষ পুরুষের। মেয়েরা নাকি অবলা সরলা বোকা। তাদের নাকি ফুসলানো সোজা। এবং…

হেমন্ত সচকিত হয়ে টের পেল, সে বনশ্রীকে অন্যদৃষ্টে দেখছে। বনশ্রী কি উলটো গাইতে পারবে, তেমন কিছু ঘটলে? তার বিশ্বাস হল, বনশ্রী তা পারবে না। বরং বনশ্রী ডিভোর্স চাইবে। কিন্তু তারপর? ওর চাকরিটা যাবেই। তখন

নাবালক ভাই আর বুড়ো বাবা-মা নিয়ে ও ভীষণ বিপদে পড়বে। হেমন্ত অবশ্য ওকে সাময়িকভাবে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু বনশ্রী কি সে-সাহায্য নেবে? আর তার একটা চাকরি পাইয়ে দেওয়ার সমস্যা আছে। চাকরির যা অবস্থা…

সংসারী ও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হেমন্তর পক্ষে এইসব ভাবা তো স্বাভাবিকই। কিন্তু আপাতত হেমন্তর ভয়টা পুলিশের। মেয়েঘটিত ব্যাপারে তার মতো লোক পুলিশের পাল্লায় পড়বে ভাবতেই তার রক্ত জমে যাচ্ছে। শুধু এক ভরসা এই পাটোয়ারিজী। কিন্তু…

তার চেয়ে রাতের ট্রেনে কেটে পড়াই ভাল। কেন যে দুপুরেই বনশ্রীর সঙ্গে এই পরামর্শ করল না? এখন জৈন মন্দিরে গিয়ে বনশ্রীর সঙ্গে নির্জনে বৈঠক সেরে নেবে। হেমন্ত ঘড়ি দেখল। সাড়ে চারটে বেজে গেছে। বেশি দেরি করা ঠিক হবে না।

বাজার ছাড়িয়ে গলির মতো সংকীর্ণ রাস্তার দুধারে বড়-বড় বাড়ি। হঠাৎ মনে হয় কলকাতা। এখানে জৈন ব্যবসায়ীদের খুব রবরবা। পাটোয়ারিজীর মুখে শোনা। একটা বাড়ির সামনে পাটোয়ারিজী নেমে গেলেন। বললেন—জ্যোৎস্না আছে। যতক্ষণ খুশি ঘুরবেন। কিন্তু তার পর সটান এখানে আসতে হবে।

তারপর পাটোয়ারিজী হাসিমুখে জীপের ভেতর উঁকি মেরে বললেন—বৌঠান।

হেমন্ত নেমে দাঁড়াল। পাটোয়ারিজী তার সিটটা টেনে কাত করে দিলেন। বনশ্রী নিঃসঙ্কোচে নেমে এল। তারপর ড্রাইভারের পাশে বসল। হেমন্ত উঠে বসল তার ডানপাশে। পাটোয়ারিজী দাঁড়িয়ে থাকলেন। জীপ এগোল।

আবার সেই বাজার। বাজার ছাড়িয়ে নহবতখানার ফটকে আর ঢুকল না জীপ। ডাইনে মোড় নিয়ে সোজা উত্তরে চলতে থাকল। বাঁদিকে ভাঙা কেল্লাবাড়ি, ডানদিকে সরকারী কোর্টকাছারি। রাস্তায় ভিড় কম। হেমন্ত আড়চোখে দেখল, বনশ্রীর মুখ তেমনি নির্বিকার।

একটা চৌমাথায় গিয়ে জীপ ঘুরল পশ্চিমে। বাঁদিকে ঐতিহাসিক এলাকা, ডাইনে মাঠ। হেমন্ত একবার বলল—কতদূর?

ড্রাইভার জবাব দিল—পাটোয়ারিজীর বাগানবাড়ি থেকে পায়দল গেলে নজদিগে স্যার। গাড়ির রাস্তা বহুৎ ঘুরে গিয়েছে। দেড়-দো মাইল পড়বে।

বাকি পথ হেমন্ত চুপ করে থাকল। বনশ্রীও কোন কথা বলল না। একটা ফটকের পাশের খুপড়িতে একটা লোক বসে ছিল। বেরিয়ে এসে বলল—জুতা খুলকে যাইয়ে স্যার।

দুজনে জুতো খুলে রাখল। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পুকুর। প্রথমে ওরা গেল সেখানে। ঘাটে দাঁড়িয়ে বনশ্রী বলল—এই পুকুরেই তো বড়-বড় পোষা মাছ আছে নাকি। ডাকলে আসে?

হেমন্ত বলল—জল নাড়লে নাকি আসে।

বনশ্রী সিঁড়িতে ঝুঁকে জল নাড়তে থাকল হাত দিয়ে। পুকুরে পদ্মপাতায় প্রায় ঢাকা। ঘাটের সামনে কালো স্বচ্ছ জল। একটু পরেই বনশ্রী অস্ফুট চেঁচিয়ে সরে এল। হেমন্ত বলল—কী?

—ওটা কী দেখতে পাচ্ছ? কুমির না?

হেমন্ত একটু এগিয়ে ঝুঁকে দেখে বলল—নাঃ। মাছ!

—মাছ অত বড়? তুমি দেখ ভাল করে।

—দেখছি তো! মাছ ছাড়া কিছু না।

বনশ্রী ওর দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার খারাপ লাগছে, তাই না?

—না তো! কেন?

বনশ্রী বলল—চলো, মন্দিরে যাই। ওই ওটাই তো?

পিছনে পশ্চিমে প্যাগোডার গড়নের একটা আটচালা—তার পিছনে সিঁড়ির ধাপ এবং মূল মন্দির। অনেক উঁচু চূড়াটা পেতলের। শেষবেলার রোদে তেলচুকচুকে দেখাচ্ছে। দুজনে আটচালার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হেমন্ত বলল—ভেতরে গিয়ে কী হবে? চলো, ওদিকে যাই।

বনশ্রী বলল—প্রণাম করবে না?

হেমন্ত একটু হাসল।—ইচ্ছে হলে করো।

বনশ্রী হেসে বলল—আমিও খুব ভক্তিমতী নই। কিন্তু এমন নির্জন সুন্দর জায়গায় এলে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে।

বলে সে হালকা পায়ে ধাপে উঠে গেল এবং হেমন্ত দেখল, সে দরজার সামনে মাথা লুটিয়ে দীর্ঘ দুমিনিট রইল। বড় বেশি সময় নিল বনশ্রী।

ফিরে এসে বলল—ভেতরটা অন্ধকার।

হেমন্ত বলল—এস, ওদিকে যাই।

বনশ্রীর হাত নিয়ে সে দক্ষিণে এগোল। সরু খোয়া বিছানো রাস্তার শেষে ফটক। ফটকের দরজা খোলা। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল সামনে [illegible] ভাগীরথী। প্রশস্ত ঘাটের সিঁড়িতে ফাটল ধরেছে। দুধারে বসার চত্বর আছে।

হেমন্ত বলল—একটুখানি বসা যাক্। ঝটপট জরুরী কথাটা সেরে নিই!

বনশ্রী অবাক হয়েছে, এভাবে ভুরু কুঁচকে বলল—কিসের? আর কোন কথাই জরুরী নেই।

হেমন্ত গম্ভীরমুখে বলল—আমার আছে।

বনশ্রী কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল। হেমন্ত বসে পড়েছে। সিগারেট ধরাচ্ছে। বনশ্রী চাপা নিঃশ্বাস ফেলে নিচে সিঁড়ির ধাপে বসল।

হেমন্ত বলল—ওখানে নয়। এখানে এসো। নোংরা!

বনশ্রী বলল—বলো তোমার জরুরী কথা।

—ভাবছি, সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে যাই। এবারের মতো।…হেমন্ত আপোসের

সুরে বলল। পরে তোমার সুবিধে মতো আবার কোথাও গিয়ে কয়েকদিন কাটানো যাবে। তখন কিন্তু তোমার সেই বন্ধুকে কিছু ফাঁস করবে না।

বনশ্রী পায়ের কাছে ফাটলের ঘাস ছিঁড়ে বলল—তোমার ভাল না লাগলে তাই।

—প্রশ্নটা আমার ভাল লাগা না-লাগার নয় বনশ্রী!

—কিসের?

—সহজ ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢুকছে না? তোমার স্বামী···

বনশ্রী বাধা দিয়ে বলল—ও গোলমাল করতে চাইলে অনেক আগেই করত।

—তাহলে ভদ্রলোক কেন এলেন এখানে? কেনই বা আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

বনশ্রী একটু ভেবে নিয়ে বলল—আমার ধারণা, এখনও আমাদের—মানে, আমার খোঁজ পায় নি।

—তখন বলছিলে, ভদ্রলোক তত সরল নন?

—হ্যাঁ। কিন্তু ওর আইসাইটটা ডিফেক্‌টিভ।

—তখন বললুম, কতদূর অব্দি দেখতে পান—তুমি বললে জানি না।

বনশ্রী বিরক্ত দেখিয়ে বলল—ওর আইসাইট নিয়ে কখনও ভাববার সুযোগ পাইনি তো? এখন মনে হচ্ছে, ও এখনও খুঁজছে আমাকে।

—তাহলে আমাকেই বা তোমার ফোটো দেখালেন কেন?

—ভেবেছিল, যদি তুমিই সেই লোক হও—যার সঙ্গে আমি এসেছি?

হেমন্ত হাসবার চেষ্টা করে বলল—আমরা বাতাস হাতড়ে বেড়াচ্ছি আসলে। তাই না?

—হ্যাঁ। তাই তো! সেজন্যেই বলছি, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না।

—তবু অস্বস্তি থেকে যায়, বনশ্রী। যায় না? দুজনেরই। এবং যেন একটা অপরাধবোধও মনে খচখচ করে কাঁটার মতো।

বনশ্রী জোরে মাথা দোলাল।—আমার কোন অপরাধবোধ নেই আর। সবকিছু তো জেনেশুনে ভেবে চিন্তেই করেছি। তোমার অবশ্য অন্য ব্যাপার থাকতে পারে।

—কারণ···অন্য ব্যাপার কি বলতে চাও?

—কারণ খুব সোজা। আমার স্বামীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আর নেই। কিন্তু তোমার বউয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে। খুব ভালভাবেই আছে। ফিরে গিয়ে তুমি তাকে আগের মতো···না, আগের চেয়ে বেশি আদর-ভালবাসা দেখাবে। সন্দেহ যাতে না করে, সংসার যাতে না ভাঙে, তার জন্যে কতকিছু করবে। করতে তো হবেই তোমাকে।

বনশ্রী একদমে কথাগুলো বলল। ওর মুখে উত্তেজনার ছাপ দেখা যাচ্ছিল। ওর নাসারন্ধ্র স্ফীত এবং ভ্রূ কুঞ্চিত, দৃষ্টি নদীর ওপারে। আর ভরা নদীর জলে অস্তসূর্যের রক্তচ্ছটা। সেই রঙ তার দুচোখে প্রতিফলিত। হেমন্ত বলল—কী

করব ? শালা লাইফটা যে এই ? শুধু ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে ? ওদের পৃথিবীতে এনেছি যখন, ক্লাউন সেজে থাকতেই হবে। ওরা তো কোন দোষ করেনি, বনশ্রী !

হেমন্তর কণ্ঠস্বরে কাতরতা ছিল। বনশ্রী একটু হাসল। কিন্তু কোন কথা বলল না। ছেঁড়া ঘাসটা দাঁতে কামড়ে ধরল।

হেমন্ত আস্তে বলল—কী করব বলো ? আমি বড্ড অসহায়।

এরপর দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটা বাতাস এল শনশনিয়ে জলের ওপর দিয়ে। বাতাসটা চলে গেল। আবার স্তব্ধতা। নদীর ওপর নৌকো চলেছে কখনও। দূরে একটা নৌকোয় মাইক বাজছিল। আবছা শোনা যাচ্ছিল। বিশাল আকাশের তলায়, প্রসারিত জলের ওপর এবং বাতাসে তা বিরাট স্তব্ধতার ব্যাপকতায় ধীরে মুছে গেল। হেমন্ত আবার মুখ খুলল। তেঁতো হেসে বলল—আগের দিনে লোকেরা একগাদা বউ রাখতে পারত দিব্যি ! নো প্রব্লেম ! আজকাল শালা কী হয়েছে !

—তুমি মাঝেমাঝে দেখছি, চমৎকার মুখখিস্তি করতে পারো !

বনশ্রীর এই মন্তব্য শুনে হেমন্ত বললে—তুমি কি আমাকে নিরামিষ ভদ্রলোক ভাবতে ?

বনশ্রী ওর দিকে তাকিয়ে শান্ত হেসে বলল—না। তা ভাবিনি।

হেমন্ত বলল—তাও তোমার খাতিরে বেশি খিস্তি করতে বাধছে। অফিসে সবাই জানে, আমি কথায়-কথায় মুখখিস্তি করি।

—হুঁ, কী বলছিলে। সন্ধ্যায় ফিরে যাবে তাহলে ?

—না। মানে, জাস্ট এ প্রপোজাল ! এভাবে অস্বস্তির মধ্যে কিছু ভাল লাগে না। তার চেয়ে আবার একটা প্রোগ্রাম করে…

বনশ্রী বাধা দিয়ে বলল—পরের কথা পরে। যেতে ইচ্ছে হলে যাও।

হেমন্ত উঠে দাঁড়াল।—তাহলে আর দেরি না করে ওঠা যাক্।

বনশ্রী উঠল না। বলল—তুমি যাও। আমি যাচ্ছি না।

—সে কি ! তুমি কীভাবে থাকবে ? কেন থাকবে ?

বনশ্রী হাসল।—আমি জীবনে একবারও বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবার সুযোগ পাইনি। এই প্রথম পেলুম। পরে আর পাব কি না, জানিও না। তাই সুদে-আসলে পুষিয়ে নেব। আঃ, কতকাল পরে আমি সত্যিকার ছুটির স্বাদ পেলুম জানো ?

হেমন্ত ওর কথার মানে বুঝতে চাইল না।—কিন্তু পাটোয়ারিজী কী ভাববেন ?

—আমার বয়ে গেছে তোমার পাটোয়ারিজীর ওখানে থাকতে। আমি কোন হোটেলে গিয়ে উঠব !

—কী বলছ ! এখানে তেমন কোন হোটেল নেই : তুমি মেয়ে হয়ে একা কীভাবে থাকবে ?

—ট্যুরিস্ট লজে থাকব। সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

হেমন্ত অভিমানী গলায় বলল—ও। ট্যুরিস্ট লজ! ঠিক আছে। ···বলে সে আনমনে দুধাপ নেমে গিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে ফের বলল—তোমাকে বুঝতে পারছি না, বনশ্রী। কেন এমন করছ?

বনশ্রী ঝাঁঝালো করে বলল—না, তোমার কী আছে? বলছি তো, আমার মনে ছুটির হাওয়া লেগেছে। খুব বেশি দূরে তো কোথাও যেতে পারব না, অত পয়সা-কড়ি নেই। শ' দেড়েক মাইল দূরে এমন একটা হিস্টোরিক প্লেসে যখন এসেই পড়েছি, তখন এখানকার সব সুখ নিঙড়ে নিয়ে তবে যাব! এবার বুঝেছ?

—বনশ্রী, কেন অবুঝের মতো রাগ করছ?

—রাগ কিসের? সহজ কথা বলছি।

—কিন্তু আমার কথাটা ভাবছ না?

—ভাবছি তো। তুমি সংসারী মানুষ। কেলেঙ্কারির ভয় করছ। আর···

—ভয় না করার কোন যুক্তি তো নেই, বনশ্রী! তোমার স্বামী ভালো করেছেন।

—বেশ তো। সেজন্যেই বলছি, তুমি ফিরে যাও।

হেমন্ত গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে আপোসের সুরে বলল—প্লীজ বনশ্রী! জেদ করো না। আমরা আর তত ইয়ং নই। সবকিছু চিন্তা করে ঠাণ্ডা মাথায় চলার বয়স হয়েছে। আমি তো বলছি···খুব শীগ্গির আবার ছুটি নিয়ে কোথাও চলে যাব।

বনশ্রী জেদী গলায় বলল···আমার পক্ষে আবার শীগ্গির ছুটি নেওয়া সম্ভব নয়।

—বেশ। তাহলে দুজনেই ধৈর্য ধরে থাকব। আবার যখন সম্ভব হবে তোমার তখন আমাকে জানাবে। আমি তো সবসময় ছুটি নিতে পারি।

বনশ্রী পায়ের কাছের ফাটল থেকে আবেক মুঠো ঘাস উপড়ে নিয়ে বলল—ভবিষ্যতে কী হবে, জানি না। তুমিও কি জানো? এখন আমি যা আছি, এর পরে তাই-ই যে থাকব, সতীসাধ্বী হয়ে যাব না···

কথা কেড়ে হেমন্ত বলল—ছিঃ বনশ্রী! সতী-অসতীর প্রশ্ন ওঠে না।

বনশ্রী আগের কথার সুর রেখে বলল—তুমিও যে এখনকার মতো থাকবে, তার মানে নেই! আবার কোন মেয়ে তোমার জীবনে আসতেও পারে! কিংবা তুমি ভীষণ গেরস্ত হয়ে যেতে পারো।

হেমন্ত প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।—অসম্ভব! বনশ্রী, কী বলছ তুমি? আমাকে এতদিন পরে এইরকম ভাবলে তুমি?

বনশ্রী উত্তেজনাটুকু পলকে চেপে দিল। শান্ত হেসে বলল—চল্লিশে পৌঁছেও টের পাও না জীবনে কত অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে যে কোন সময়? তিরিশ পেরিয়েই আমি কতকিছু টের পেয়েছি। সেজন্যই বলে না, মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি!

—তুমি আমাকে অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর, এমনকি লম্পট ভাবতে পারো। হেমন্ত হাঁসফাঁস করে বলল। কিন্তু আমি জানি, তা নই। আমি শুধু ভালবাসার···

হেমন্ত হঠাৎ চুপ করে গেল। বনশ্রী ওর দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি ঘুরিয়ে সোজা আকাশে রাখল। তারপর বলল—ইস্! কত কালো-কালো মেঘ জমেছে দেখছ?

ভাগীরথীর ওপারে ততক্ষণে দিগন্তের ওপর কালো চাপচাপ মেঘ জমেছে। মেঘের ওপব বিদ্যুৎ ঝিলিক্ দিচ্ছে। চাপা গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে। রক্তমুকুটপরা কালো মেঘগুলো খুব সতর্কভাবে নড়াচড়া করছে। আর বাতাস গেছে থেমে। নদীর জলে কালো ছায়া। গাছপালা স্থির। হেমন্ত আকাশ দেখে বলল—ঝড়টা আসতে পারে। চলো, ফেরা যাক।

বনশ্রী উঠল না। বলল—ওই! দিলে তো আগে সব বলে! আর উঠবেই না ঝড!

হেমন্ত একটু হাসল।—নেচার কারও কথা শোনে না। চলো!

—একটু দেখি না! ফাঁকা মাঠে তো নেই।

—না, না। ড্রাইভাব বেচারা আছে!

—থাক না। [illegible] দেখি।···বনশ্রী বালিকার মতো নেচে উঠেছে যেন। আচ্ছা শোন, জলেব ওপর দিয়ে ঝড়টা এলে দারুণ দেখাবে. না? আমি কখনও দেখিনি।

হেমন্ত বিরক্ত হযে বলল—সে তো ফোর্ট উইলিযমেব পেছনে গঙ্গার ধারে বসে দেখা যায়!

—ভ্যাট!—সেখানে তো শুধু নৌকো স্টীমার আর জাহাজে ঠাসা! এখানে কেমন ফাঁকা—কতদূর! ছবির মতো!

হেমন্ত ওব বালিকাপনায় সৌন্দর্য এবং আনন্দ আছে টের পাচ্ছিল। কিন্তু এখন তার মনে সৌন্দর্য বা আনন্দ নেওয়ার জায়গা নেই। হঠাৎ-হঠাৎ মনে হচ্ছে, মুখ ঘোরালেই দেখতে পাবে কয়েকটি খাকি পোশাকপরা মূর্তি—তাদের বুটের শব্দে ঐতিহাসিক চত্বর এবং বনস্থলী কাঁপতে থাকবে। সে বড় লজ্জার কথা! এই বয়সে এসব! সে একজন আইনভীরু এবং নাগরিক হিসেবে সৎ মানুষ। সাবধানে রাস্তার ফুটপাতে হাঁটে এবং জেব্রা ক্রসিং ছাড়া পার হয় না। অফিসে সে ঘুষ নেয় না—কিন্তু কেউ কিছু উপহার দিলে অগত্যা না নিয়ে পারে না। তার ছেলেমেয়েদের পায়ের জুতোমোজা এবং স্কুলের সময়ের দিকে সে নজর রাখে। দরকার হলে বউকে সে রান্নাবান্নায় সাহায্যও করে। তরকারি কুটে কিংবা রেঁধেও দেয। বউয়ের অসুখ-বিসুখ হলে সে তাকে খাওয়াতে ছাড়ে না। আরও কত ব্যাপার তার আছে—ছাপোষা, ঘোর সংসারী মানুষের স্বভাব। বনশ্রী তার এই স্বভাব অথবা থিতু হয়ে বসাকে যেন কোণঠাসা করে ফেলেছিল। আর বনশ্রীর সামনে তো সেই স্বভাব ব্যাপারটা ছাড়িয়ে আরেক হেমন্ত অনেক পথ হেঁটে আসা ক্লান্ত পথিকের মতো

দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে পেরেছে এতদিন—যেন বনশ্রীর ঘন ছায়াতরু, আকাশে যখন প্রখর সূর্য। কিংবা উপমাটা অন্যভাবে দেওয়া হয়। দুপুরে অফিস ফাঁকি দিয়ে বেরুনো কেরানীর সিনেমা দেখা! কিংবা বিপুল, ব্যবসায়ী-গৃহিণী গ্রীষ্মের দুপুরে হেলতে দুলতে যেমন ঢোকে এয়ারকণ্ডিশণ্ড সিনেমা ঘরে? মানুষের অনেক অদ্ভুত অতৃপ্তি থাকে। হেমন্ত এখন তার একদা অনির্দিষ্ট অতৃপ্তির প্রতি ক্ষুব্ধ। পোশাকের ভেতর লুকিয়ে-থাকা একটা ছারপোকার! তাকে খুঁজে বের করে টিপে মারার রাগ হেমন্তের মনে। হুঃ, সৌন্দর্য! শারীরিক আনন্দ! এসব ব্যাপার ছাড়াও মানুষ শয়ে-শয়ে বেঁচে আছে পৃথিবীতে। শুধু টাকা গুনে, কিংবা রোজ অফিস যাতা-য়াত করে, সন্ন্যাসী হয়ে টো-টো ঘুরে পাহাড়ে-অরণ্যে বেঁচে আছে। আর লক্ষলক্ষ কোটিকোটি মানুষ, এ যাবৎ যারা জন্মেছে তাদের লোকসংখ্যা হিসেবে এনে বলা যায়, কত কম লোক প্রেম করেছিল বা এ মুহূর্তে প্রেম করছে! নারীর প্রেম ছাড়াও মানুষের বাঁচা হয়। ও একটা অনর্থক ধাঁধা মাত্র। শালা প্রেম! যার বয়েস চাল্লিশ এবং দু-দুটো ছেলেমেয়ের বাবা, তার এই ধাঁধার খেলায় মেতে ওঠার কী মানে হয়! প্রতিদিন যাকে লক্ষলক্ষ টাকার হিসেব মেলাতে হয়, যেন নিজের অজান্তে সুহিসেবী হয়ে ওঠাই তার পরিণতি। হেমন্তের মধ্যে খুব শীর্গাগব হিসেবনিকেশ চুকিয়ে লিফ্‌টে নেমে রাস্তায় ট্রাম-বাস ধরার ঝোঁক এসে গেছে। সে মনে মনে বলল—শালা প্রেম! এবং আকাশের দিকে মুখ তুলে কাল রক্তচক্ষু মেঘপুঞ্জকে একটা আসন্ন পরিণামের মতো দেখল। আজ এখন কলকাতায় থাকলে বাড়ি ফেরার ভাবনা হত ঠিক এমনিই। যানবাহন সব বন্ধ। রাস্তায় কোমর জল। হেমন্তর বাড়ির সামনের রাস্তার অবস্থা তো এক পশলাতেই ভয়ানহ। বউ কিন্তু স্কুলবাসুক আর নাই বাসুক, ছেলেমেয়ের বাবার জন্যে জানলার রডে নাক ঠেকিয়ে রাস্তা দেখবে।—'রিকশো করলে না কেন? এ মা! না, না—আগে সব ছাড়ো, তারপর পা বাড়িও। ড্রেনের ময়লা ঘরে নিতে দেব না।' আর রাতেও ফের বৃষ্টি নামলে শাখীর গায়ে হাত রাখবার চেষ্টাতেই হেমন্ত শুনবে—'আজ কেউ জোটে নি বুঝি?' যেন হেমন্তর সারাদিনই জোটে। যেন হেমন্ত আপিস করে না, স্ত্রীলোক নিয়ে ঘোরে। আর কলকাতায় যেন লোক নেই জন নেই, শুধু নির্জন পার্ক, এবং হেমন্ত শুধু ওইসব করে! শাখীর কথা শুনে হেমন্ত হাসবে। বলবে—'জোটে ইচ্ছে করলেই। জোটাইনি। এ বয়সে আর ওসব সাজে না!' তখন শাখী বলবে—'পুরুষমানুষের আবার বয়স! তোমাকে তো কত্তো ইয়াং দেখায়। আমি বুড়ির বুড়ি। হবে না! সেই ঢুকেছি, তারপর ঘানিতে জুড়েছ। আজও কি রেহাই পেলুম!'···শালা প্রেম! শাখীকে মোটে বার দুই বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল হেমন্ত। একবার চাইবাসা, আর একবার ডায়মণ্ডহারবার। হেমন্ত বস্তুত ঘরকুনো বরাবর। বাইরে যাওয়া মানেই কষ্ট, একগুচ্ছের টাকা খরচ। যেখানেই যাও, ভিড় আর ভিড়। আবার একেবারে নিরিবিলি জায়গাতেও বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। হাঁফ ধরে যায়। এদিকে বাসায়

ছুরিচামারি হয়ে গেল কিনা কে জানে! বাইরে গেলে ওই এক আতঙ্ক।...

শনশন শব্দ উঠল। ভাগীরথীর জলে দীর্ঘ চিরুনীর দাগ। চাপা গুরুগুরু মেঘের ডাক মাথার ওপর। তারপর কয়েক সেকেণ্ডেই সামনে ওপারে ঘন ধূসর এক পাঁচিল এসে দাঁড়িয়েছে। হেমন্ত বলল—ওঠ! ঝড় আসছে।

বনশ্রী উঠল না। তার মুখে হাসি। হাসিতেই যেন আসন্ন তোলপাড়কে বরণ করে নেওয়া কিংবা মেনে নেওয়ার আভাস। হেমন্ত বলল—আঃ! ওঠ বনশ্রী!

বনশ্রী বলল—চলো না তুমি। গাড়িতে গিয়ে বসো, যাচ্ছি।

হেমন্ত রাগ চেপে বলল—শিলাবৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া ঝড়ের মধ্যে বসে থাকার কী মানে হয়!

বনশ্রী ফের বলল—তুমি চলো। যাচ্ছি।

—কেন? একা এখানে কী করবে তুমি?

—কিছু না।

—তাহলে?

—ভাল লাগছে।...বলে হেমন্তর মুখের ভাব দেখে সে খিলখিল করে হেসে উঠল। না, আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে স্যুইসাইড করব না—তাহলে তুমি বিপদে পড়ে যাবে যে! সে বুদ্ধি আমার আছে।

হেমন্ত বলল—কোন মানে হয় না!

এই সময় পিছনে ঘাটের ফটকের ওদিকে পাটোয়ারিজীর ড্রাইভার এসে ডাকল—সাব! ঝড়বৃষ্টি আসছে! আভি যাবেন, না দের হোবে! বিষ্টি হলে মন্দিরে চলে আসবেন।

হেমন্ত বলল—চলো যাচ্ছি।

ড্রাইভার দৌড়ে চলে গেল। বাতাস বেড়েছে। খড়কুটো উড়ছে। তারপর মেঘ গলা ঝেড়ে কাঁসার মতো আওয়াজ দিল। পরের বার আরও জোরে। তারপর ভাগীরথী তোলপাড় করে ছুটে এল শতশো রাক্ষসের মতো প্রথম লবোশেখী। এবার সংধ্যার চেয়ে ঘন ছায়ায় ঢেকে গেল সবকিছু। আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের জোরালো প্রহার। সাতশো সিংহের গর্জন।

হেমন্ত ঝুঁকে বনশ্রীর হাত ধরে টানল। বনশ্রী বলল—আঃ। সিন ক্রিয়েট করো না!

—কেন তুমি এখানে বসে থাকতে চাইছ!

বললুম তো চলো। যাচ্ছি।

—তুমি আমার ওপর যেন কিসের শোধ নিতে চাইছ বনশ্রী!

বনশ্রী ঝড়ের মধ্যে প্রায় চেঁচিয়ে বলল—না, না, না। শোধটোধ নয় বলছি। তুমি যাও, যাচ্ছি।

খুব কাছে কোথাও বাজ পড়ল। হেমন্ত আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে বনশ্রীকে দুহাতে তুলে নিল। হতবুদ্ধি—নাকি হিসেবী বুদ্ধি? বনশ্রী হাতপা ছুঁড়তে

থাকল।—আঃ। কী হচ্ছে। ছাড়ো—যাচ্ছি।

ঘাটের পিছনে ফটকের পাশে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের নিচে ঝোপঝাড় নদী অব্দি নেমেছে। সেখান থেকে চিল-চিৎকার শোনা গেল ঝড়ের শব্দ চিরে।—হাঁ জী। খেল্ দেখাতা জী? আবে হরিয়া বে। দেখ—দেখ্—মজা।

আবার কে? সেই ডেঁপো ছোঁড়াটা। নদীর ধারে ধারে চলে এসে হয়তো ওঁৎ পেতে ছিল ঝোপের মধ্যে। হেমন্ত ঘুরে দেখেই বনশ্রীকে ছেড়ে দিল। তারপর হুঙ্কার দিয়ে ধাপ ভাঙতে থাকল। বনশ্রী হেসে অস্থির। ঝড়ের মধ্যে হেমন্ত কীভাবে এগোচ্ছে।

ডিব্বু পালিয়েছে। হেমন্ত ঝোপের দিকে একটা পাটকেল ছুঁড়ে হাঁফাতে হাঁপাতে বলল—আসবে, না কী! সবকিছুর একটা সীমা থাকা উচিত।

আবার কোথাও বাজ পড়ল। ঝড়টাও বেড়ে গেল। একটু অপেক্ষা করার পর হেমন্ত ফটকে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল—আসবে না তুমি?

বনশ্রী শুধু হাসল। তার শাড়ি বিশৃঙ্খল উড়ছে। উরু অব্দি নগ্ন হয়ে পড়ছে: সে সামলে নিতে ব্যস্ত ছিল। না পেরে বসে পড়ল সিঁড়িতে।

একেই বলে স্ত্রীলোক। হেমন্ত মনে মনে গজরাল। সব শেয়ালের এক রা-এর মতো। স্ত্রীলোক নিয়ে সে তেরো বছর ঘর করেছে। হুবহু একই স্বভাব। উদ্ভুটে গোঁ। অর্থহীন ছেলেমানুষি। অবুঝের মতো আচরণ। একেই তো বলে ফিমেল লজিক। ও লজিক বোঝা অসম্ভব পুরুষের পক্ষে। হেমন্ত ক্ষেপে গিয়ে শেষবার চেঁচাল—আসবে, না আসবে না?

এবার উঁচু পাঁচিলের ওপর, একটু তফাতে যেখানে একটা শিরিসগাছ গা ঘেঁষে উঠেছে, গাছটা পাঁচিলের ওপর ভেঙে পড়ছে যেন, নান্নুমিয়ার পুত্র একহাতে দুরন্ত ডাল ধরে চেঁচিয়ে উঠল—আবে হরিয়া! আবে বুঢ্ঢা। ইধার্ আ যা—দেখ দেখ!

হরিয়া কে হেমন্ত জানে না। কিন্তু তার নাভের চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আফ্‌টার অল আমি একজন ভদ্রলোক। যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেল। এইসব ভেবে সে শেষ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, বৃষ্টির ফোঁটা এসে নাকের ডগায় পড়ল। প্রথমে ছোট ফোঁটা, তারপর দ্রুত ফোঁটা। ভাগীরথীর ফুলে ওঠা জলে এখন সত্যিকার অন্ধকার। অন্ধকার ঘাটেও। এবং পাঁচিলের ওপরের আচমকা বিদ্যুতের আলোয় সিল্যুট একটা ক্ষুদে মূর্তি। ছোঁড়াটার কী সাহস!

কিন্তু বনশ্রী কি নিজের শরীরকেই প্রকৃতির আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত করতে চাইছে? এ কি তার প্রায়শ্চিত্ত? যে-প্রকৃতি তাকে ভুলিয়ে এনেছিল, যার প্ররোচনায় সে গোপনে-নির্জনে প্রেমের দরজা খুলে রক্ত-মাংসে ঢুকেছিল, সেই প্রকৃতির কাছেই কি তার শান্তিপ্রার্থনা? হেমন্ত কষ্ট পাচ্ছিল। এও তার একটা স্বভাব। হয়তো এটাই পুরুষের মধ্যে থাকা পিতৃস্বভাব। সে সেই স্বভাবের বশে নেমে গেল ধাপে।

বৃষ্টির মধ্যে তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেল না বনশ্রী, কী বলতে চায়। কিন্তু এবার হেমন্ত গিয়ে তাকে ছুঁলে সে উঠল। সেও কিছু বলল। হেমন্ত শুনতে পেল না।

দুজনে সাবধানে, পরস্পরকে ধরে ধাপ ভাঙছিল। অন্ধকার চিরে বিদ্যুৎ আলো দেখাল তাদের। পাঁচিলের ওপর সিল্যুট ক্ষুদে মূর্তিটা আর নেই। হেমন্ত মুখ তুলেছিল, দেখতে পেল না। ফটক পেরিয়ে প্রাঙ্গণে পৌঁছে ওদের গতি বাড়ল।

মন্দিরের আটচালার মধ্যেও অন্ধ্যকার ততক্ষণে। দুজনে ঢুকে পড়ল। হেমন্ত প্রথমে সিগারেট-দেশলাই বের করল। তারপর বলল—জলের ছাট আসছে! চলো, ওখানে বারান্দায় যাই। এক মিনিট, দেশলাই জ্বালি।

পরপর কয়েকটা কাঠি পুড়িয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে ওঠা গেল। তারপর বারান্দায়। হেমন্ত বলল—ইলেক্ট্রিসিটি আছে দেখেছিলুম তখন। অথচ জ্বলছে না। লোডশেডিং। নয়তো ঝড়ে লাইন গেছে।

বনশ্রী কোন কথা বলল না। বারান্দাটা আরও বেশি অন্ধকার। কিন্তু ঝড়বৃষ্টির ঝাপটানি এখানে একটুও নেই। ভিজে কাপড়-চোপড় শরীরকে ঠাণ্ডা করে ফেলেছে। শীত করছে? : হেমন্ত সস্নেহে বলল। তারপর দেশলাই জ্বালল সিগারেট ধরাতে।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সে আবার একটা কাঠি জ্বালল, চারপাশটা দেখে নিতে। কিন্তু কাঠিটা তক্ষুনি নিভে গেল। সে বলল—মন্দিরের ভেতরেও তো বাতিফাতি জ্বালে নি। কী কাণ্ড! অথচ যে লোকটা দেখাশোনা করে, সে নিশ্চয় মাইনে পায়। সবখানেই শালা ফাঁকি! ভগবানকেও ফাঁকি দিচ্ছে মানুষ।

বলে হেমন্ত অন্ধকারে ঘুরে মন্দিরের দরজা ঠাহর করল। ফের বলল—নাকি নিভে গেছে বাতিটা!

আবার বাজ পড়ল। কেঁপে উঠল মন্দির। হেমন্ত ভয় পেয়ে বলল—মেটাল তো ইলেক্ট্রিসিটি টেনে নেয়। চুড়োটা পেতলের। শিগ্যি সেকালেও টেক্নলজিকাল স্কিম দারুণ ছিল। নিশ্চয় কোন ব্যবস্থা করা আছে। তাই না?

বনশ্রী কথা বলছে না। হেমন্তর একা কথা বলতে খারাপ লেগেছে ততক্ষণে। পরে মনে হল, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সবখানে মানুষ চুপচাপ থাকে। এটাই মানুষের স্বভাব। সে বার-বার কথা বলছে কেন? মনে মনে একটু হেসে হেমন্ত আবার দেশলাই জেলে বনশ্রী কী অবস্থায় আছে দেখতে চাইল।

এটা মন্দির না হলে সে অনায়াসে এখন বনশ্রীকে চুমু খেত। এবং হয়তো…

হেমন্ত সতর্ক হল। মন্দিরে এসব কথা ভাবাও অন্যায় -বিশেষ করে যখন প্রকৃতি ক্ষিপ্ত। সে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা ডানদিকে ফেলতে গিয়ে আবছা দেখল কে অন্যপাশে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। হেমন্ত বলল—কে? কে?

—আমি।

হেমন্ত পা বাড়িয়ে আবার দ্রুত দেশলাই থেকে কাঠি বের করছিল। বনশ্রী তাকে আচম্‌কা ছুঁল। পরক্ষণে হেমন্ত টের পেল, বনশ্রী তাকে সতর্কভাবে টানছে। হেমন্তর রাগ হয়েছিল। বনশ্রীর টান অগ্রাহ্য করে সে খনখনে গলায় বলে উঠল—অন্ধকারে ভূতের মতো বসে আছ। সাড়া দাওনি কেন? কে তুমি?

আবছা হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর—ভয় পাবার কী আছে? আমিও আপনাদের মতো মানুষ। ভূত নই স্যার?

স্যার শুনে হেমন্তর রাগ পড়ে গেল—মানুষ তো বুঝলুম! এখানে কী করছ।

—আপনাদের মতো আটকে পড়েছি। আবার কী করব।

হেমন্ত লোকটাকে দেখার জন্যে দেশলাই জ্বালতেই বনশ্রী ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল।...

ছয়

সঙ্গে সঙ্গে হেমন্তর চৈতন্যোদয় হল। বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়ার পর ইতিমধ্যে যেটুকু ওম্‌ জমছিল, উবে গেল। তার মনে হল, সে বজ্রাহত হয়ে গাছের মতো দাউদাউ জ্বলছে, কিন্তু সে-আগুন বরফের চেয়ে হিম। বনশ্রী তাকে জলপ্রপাতের মতো টেনে নামাতে চেষ্টা করল। হেমন্ত তখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তার ডানহাতের মুঠোয় দেশলাইটা মড়মড় করে উঠল। তারপর সে হাল ছেড়ে দিল। বনশ্রীর টানে হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল এবং আটচালা থেকে চেঁচিয়ে ডাকল—ড্রাইভার? ড্রাইভার?

কেন এখন সে ড্রাইভারকে ডাকছে, জানে না। দূরে সদর দেউড়ির পাশে ঘুপটি ঘরটায় আলো জ্বলছে। আলোটা নড়ে উঠল। একটু পরে আলোটা শূন্যে ভাসল।

বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু তত তীব্রতা নেই। দেউড়ির আলোর কাছ থেকে আবছা একটা সাড়া এল যেন। বিদ্যুৎ এখন খুব ঘন-ঘন ঝিলিক্‌ দিচ্ছে। একটানা আলোর ছটা খেলছে। তার মধ্যে হেমন্ত দেখতে পেল, বনশ্রী তাকে ফেলে রেখে একা এগিয়ে গেছে। তখন হেমন্তও দৌড়ল।

আলোটা এধারে আসছিল। ড্রাইভার ছাতা আর আলো নিয়ে আসছে। বনশ্রী তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হেমন্ত বলল—আর ছাতা দরকার হবে না। চলো!

দেউড়িতে গিয়ে দুজনে জুতো খুঁজল। মন্দিররক্ষক চত্বরে গুটি-সুটি বসে ছিল। তার পাশে তিনজোড়া জুতো। হেমন্ত তৃতীয় জুতো জোড়াটা লক্ষ্য করল। ছেঁড়াখোঁড়া সস্তা স্যাণ্ডেল। ড্রাইভার বলল—বাত্তি দেখাইয়ে হরিজী। লিজিয়ে আপকা বাত্তি! তারপর সে মুখ ভেংচে ডাকল—আবে ডিম্বু! তু কাঁহা

বে। আ যা! তারপর সে হেমন্তর উদ্দেশ্যে বলল—নান্নুমিয়ার ছেলে স্যার্। বহুৎ হারামী লেড়কা। আভি নান্নুমিয়া ঢুঁড়ে হয়রান্ হচ্ছে—এত ঝড়বৃষ্টি হল! হারামী লড়কা এখানে এসে বৈঠে আছে!

মন্দিররক্ষকের ঘরের পিছন থেকে ডিব্বু বেরিয়ে এল। কাঁচুমাচু মুখ। হেমন্তর তার দিকে তাকাতে তর সইছে না। আর বনশ্রীর মুখ থমথমে। ড্রাইভার বলল—ডিব্বুয়া! তু মেরা পাশ আ যা বে!

ছোঁড়াটা তার ওপাশে বসল। হেমন্ত বলল, আমরা বরং ভেতরে বসি। বৃষ্টির ছাট্ আসবে।

—তব ঠিক হ্যায়। যাইয়ে। ডিব্বুয়া! উধার যাকে বৈঠ! তেরা নসিব বে!…

জীপ এগোল। উজ্জ্বল আলোর ঝলকানিতে পিচের ভিজে পথ আরও কালো দেখাল। পাশের মাঠে ব্যাঙ ডাকছে। বিদ্যুতের আলো নয়ানজুলিতে জল চকচক করে উঠছে। রাস্তা জুড়ে ছেঁড়াখোঁড়া পাতা আর ডালপালা।

—হাঁ বে ডিব্বুয়া! সব লোগোঁসে পুছ, সাদা জিন জুতা পিঁধকে আতা ক্যায়সে! ড্রাইভার খিকখিক করে হাসল। হেমন্তদের উদ্দেশ্যে বলল—এক আদমি আসছিল স্যার। মন্দিরদর্শনমে আসছিল। ইয়ে বান্দর তো ডরে হরিজীর ঘরে ঘুষে গেল। যিসকা জুতা হুঁয়াপর দেখলেন! তো ইয়ে হারামী লড়কা আছে না?

হেমন্ত কিছু বলল না দেখে ড্রাইভার ফের বলল—উও সাদা চামড়া আছে স্যার। হামলোক বোলতা 'হাঁসা' আদমি! ইওরোপিয়েন সাবলোগোঁকা তারাহ্। দেখা নেই স্যার মন্দিরমে? আভি তো বৈঠা আছে, মালুম পড়ে। ঝড়বৃষ্টিমে করবেটা কী?

একটু পরে আবার।—ফিরে আসতে বহুৎ তকলিফ হবে উহিঁর।

ডিব্বু বিরক্ত হয়ে বলল—ছোড়ো জী। বাসমে আসবে। আভি তো লছমনগঞ্জকা বাস আয়া নেহি?

—হাঁ বে বুদ্ধু! ড্রাইভার হেমন্তদের শুনিয়ে-শুনিয়েই কথা বলছিল। এবার ডান হাতে ডিব্বুর কাঁধ খামচে বলল।—হাঁ বে! উত্ত যব জিন হোতা, তো বাসমে ক্যায়সে আতা?

—জুতা পিঁধতা! তব বাসমেভি চাপতা!

—বুঝলেন স্যার? নান্নুমিয়ার লড়কা এবার ঠিকঠিক সমঝেছে!

ড্রাইভার হাসতে থাকল! ছোঁড়াটাও এতক্ষণে হি হি করে দুলে দুলে হাসতে থাকল।

হেমন্ত ভারি গলায় বলল—দেখো, রাস্তা পিছল হ্‌য় আছে। স্লিপ করে না চাকা। হুঁশিয়ারিমে চলো।

শহরে ঢোকার মুখে দেখা গেল সব অন্ধকার। ড্রাইভার বুদ্ধিমান। বলল—

সাব, পাটোয়ারিজীকা কোঠী যাবার আগে কাপড়-উপড় বদলে লেবেন তো? ভিজে গিয়েছেন মালুম হচ্ছে। বহুৎ বর্ষাল একঘণ্টা!

হেমন্ত বলল—হ্যাঁ, বাগানবাড়িতে চলো আগে।

বাজার এলাকায় মোম হারিকেন ও হ্যাজাকের আলো। রাস্তা প্রায় শূন্য। খানাখন্দে জল জমেছে। নহবতখানার ফটক অন্ধকার। ঐতিহাসিক পুরী এখন ভুতের বাড়ি। কোথাও একচিলতে আলো নেই। পীরের মাজারের কাছে গিয়ে জীপ থামল। ড্রাইভার চেঁচিয়ে ডাকল—নান্নুমিয়া? ও জী নবাবকে বাচ্চে! জলদি আ যাও বাপ! তারপর ডিম্বুকে খোঁচা মেরে বলল—যা না বে। বাত্তি লা জলদি!

ডিম্বু তড়াক করে নেমে গেল। একটু তফাতে বাঁদিকে বিদ্যুতের আলোয় দেখা যাচ্ছিল পাটোয়ারিজীর বাগানবাড়ি। জীপের আলো দূরে সামনে প্যালেস এলাকার ফাঁকা প্রাঙ্গণে গিয়ে পড়েছে। একটু পরে ডিম্বু ফিরে এসে বলল—শালালোক নেহি ড্রাইভারজী।

ড্রাইভার বলল—উও দেখ্ আরাহা তেরা শালালোক্।

প্যালেসের ওদিক থেকে একটা হারিকেন দুলতে-দুলতে আসছে। ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। জীপ আবার গড়াল। তীব্র আলোয দুটো প্রাণী থমকে দাঁড়িয়েছে। হারিকেন হাতে নান্নুমিয়া আর কেরামত খাঁ। ড্রাইভার তাদের পাশে গিয়ে ব্রেক কষে বলল—ক্যা জী নবাবসাব! হালৎ ক্যা!

হারিকেন তুলল নান্নুমিয়া।—কৌন? পাটোযারিজী? হাঁ—বেটা সলিম! বহুৎ বরষায়া বেটা।

—বাত্তি দো চাচা। সাবলোক আঁধারমে ক্যায়সে রহেগা?

নান্নুমিয়া তক্ষুনি লণ্ঠন এগিয়ে দিল। তার একহাতে খাসিটার গলার চামটি পাকড়ানো আছে। খাসিটা জুলজুলে চোখে তাকাচ্ছে। ভিজে এবং ঠাণ্ডায় জবুথবু। কান ঝাড়ছে। ঘণ্টা ঠুং করে বাজছে। ড্রাইভার লণ্ঠন নিয়ে বলল—তুম ক্যায়সে ঘর যায়েগা জী?

—ঠিক চলা যায়েগা বাপ। ঘাবড়াও নেহি। ঘর মে বাত্তি হ্যায়!…বলে নান্নুমিয়া এগোল। তারপর আপনমনে বলে উঠল—ডিম্বুয়া কাঁহা খোদা মালুম! হারামী খবিস কাঁহেকা! কাহে বাজ নেহি গিরতা উম্পরমে?

সঙ্গে সঙ্গে পিছনে অন্ধকারে চেরা গলায় ডিম্বুর আওয়াজ এল। আবে বুঢ্‌ঢা! গালি মাৎ দো! হাঁ। হাম মচিস্ ছুপা দেগা, হাঁ!…

ড্রাইভার হোহো করে হেসে স্টার্ট দিল। তারপর আচমকা বাঁদিকে ঘুরে বাগান-বাড়ির গেটে গাড়ি থামাল। লণ্ঠন হাতে নেমে সে বলল—আইয়ে সাব!

হেমন্ত সামনের সিট ঠেলে সাবধানে নামল। বনশ্রীকে নামতে সাহায্য করল। বলল—ঠিক আছে। তুমি হারিকেনটা আমাকে দাও।

—আমি ওয়েট করছি স্যার। আপনারা তৈয়ারি হয়ে আসেন।

হেমন্ত একটু ইতস্তত করে বলল—এক কাজ করো বরং। পাটোয়ারিজীকে গিয়ে বলো, আমাদের খানিকটা দেরি হবে। এখন তো মোটে ছটা পঁয়তাল্লিশ। ধরো, নটায় বেরুব। ততক্ষণে মনে হয় আলো জ্বলে যাবে। যাবে না?

ড্রাইভার হাত অদ্ভুতভাবে নাচিয়ে বলল—খোদার মালুম স্যার! মেনলাইন ছিঁড়ে-উড়ে থাকলে পরে কালতক্‌ভি ইলেক্‌ট্রিক বন্ধ থাকবে। ঠিক হ্যায়, ন বাজকে গাড়ি লিয়ে আসব।

বনশ্রী হেমন্তর হাত থেকে হারিকেন প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলল—শীত করছে। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

হেমন্ত বলল—আচ্ছা। তুমি এখন এসো। আলো না জ্বললে গাড়ি নিয়ে এসো। নয়তো গাড়ির দরকার নেই। তোমাকেও আসতে হবে না।

ড্রাইভার জীপে উঠল। হেমন্ত দৌড়ে বনশ্রীর সঙ্গ নিল। খোয়াবিছানো এবড়ো-খেবড়ো সংকীর্ণ রাস্তায় জল জমে আছে। আছাড় খেতে গিয়ে টাল সামলে নিল হেমন্ত। বনশ্রী শুধু ঘুরে দেখল কিন্তু হাসল না। অথচ একটা হাসির আশা ছিল।

সিঁড়িতে উঠে গিয়ে বনশ্রী বলল—কিন্তু চাবি!

—আমার কাছে আছে। হেমন্ত ভারি গলায় বলল। তারপর প্যান্টের পকেটে হাত ভরে চাবি বের করল। দরজা খুলে সে একটু হাসল।—আজ রাতটা কিন্তু এত ভাল ছিল!

বনশ্রী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। হেমন্ত তার পিছনে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। ওদের ঘরের দরজাটা শুধু আটকানো ছিল। ভেতরে ঢুকে বনশ্রী আলোটা টেবিলে রাখতে গিয়ে বলল—বাথরুমে যাব।

হেমন্ত বলল—চলো। আমি দাঁড়াচ্ছি।

বাগানের দরজা খুলে দুজনে বেরুল। বনশ্রী আলো নিয়ে নিচে খোলামেলায় বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। হেমন্ত বলল—ভয় করলে বলো, আরও কাছে গিয়ে থাকছি।

জবাব এল না। হেমন্ত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির মাথায়। এ অন্ধকার অপরিচিত অন্ধকার। আকাশ তখনও মেঘে ঢাকা। ক্ষীণ বিদ্যুতের ঝিলিকে এদিকে ওদিকে ভেসে উঠছে ঐতিহাসিক কিছু ঘরবাড়ির ভাঙাচোরা সিল্যুট চেহারা। রহস্যময় চিত্রকলার মধ্যে ঢুকে পড়েছে যেন, হেমন্তর অস্বস্তি [illegible]। নদীর দিক থেকে কনকনে বাতাস আসছে। শরীর আরও ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে। হেমন্ত ভয় পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বনশ্রীর জন্যে তাকে সাহসী ; হলেই নয়। সে কয়েকবার কাশল। বনশ্রীকে তার থাকাটা জানিয়ে দিতেই। তারপর একবার ডাকলও চাপাস্বরে—বনশ্রী!

ডেকেই ভাবল, নাম ধরে ডাকাটা ঠিক হচ্ছে না। একটু পরে বনশ্রী বেরিয়ে এসে বলল—তুমি যাবে তো ?

হেমন্ত মাথা দোলাল। যাবে না।—তুমি ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে নাও শীগগির! অসুখ ধরিও না। আমি বাইরেই সেরে নিচ্ছি।

একটু পরে সে ঘরে গেল। দরজা এঁটে দিল। বনশ্রী আলোর দম কমিয়ে তখনও কাপড় বদলাচ্ছিল। বলল—এক মিনিট। তুমি ঘুরে দাঁড়াও না প্লীজ!

হেমন্ত হাসবার চেষ্টা করে বলল—আচ্ছা তাই। সে ঘুরে দাঁড়াল এবং শার্ট খুলে ফেলল। গেঞ্জি খুলল। তারপর প্যান্টটা খুলে বলল—এখনও হয় নি ?

—হয়েছে।

ঘুরে দেখল বনশী চুল আঁচড়াচ্ছে। হলদে সিল্কের শাড়ি পরেছে। হলদে লম্বা-হাতা ব্লাউজ। তার ভিজে শাড়ি, সায়া আর ব্লাউজ গুটিয়ে রেখেছে আলনার ওপরে। হেমন্ত তার পাশে গিয়ে বলল—আমার দিকে তাকালে লজ্জা পাবে। একমিনিট পরে তাকিও।

সে তার স্যুটকেস খুলল। বনশ্রী সরে গিয়ে বিছানায় বসল। হেমন্তর পোশাক পরা শেষ হলে সে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, রাতটা যাই বলো খুব আইডিয়াল ছিল। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে!

বনশ্রীর জবাব শোনার আশা করেছিল সে। বনশ্রী বলল—পাটোয়ারিজীর বাড়ি কি সত্যি যাবে ?

হেমন্ত কাছে এসে বলল—সেটা সেট্‌ল করতেই তো সময় নিলুম। ঠাণ্ডা যথেষ্ট খেয়েছি দুজনে! সুতরাং মাথা এখন প্রচুর ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক্। কিন্তু এখন দরকার ছিল চা। ড্রাইভারকে বললে ম্যানেজ করা যেত। ভুলে গেলুম। বাজারও তো বেশ দূরে। তুমি একা থাকতে পারলে অবশ্য চেষ্টা করতুম। কী ?

—তুমি গিয়ে খেয়ে আসতে পারো। আমার ইচ্ছে করছে না।

হেমন্ত ওর পাশে বসে বলল—পরের মতো কথা বলো না। শুনতে খারাপ লাগল।

বনশ্রী মাথা দোলাল।—না, সত্যি ইচ্ছে করছে না। বমি-বমি লাগছে।

উদ্বিগ্ন হেমন্ত বলল—মাথা ঘুরছে না তো ?

—না।...বলে বনশ্রী ওর দিকে তাকাল। কিন্তু কী করবে ?

—পাটোয়ারিজীর ব্যাপারটা তো ? হেমন্ত ভাবতে ভাবতে বলল। তুমি বলো তো কী করব ?

—আমি বলব, ভদ্রলোকের বাড়ি নেমন্তন্নটা রক্ষা করা উচিত।

—বেশ! তাই করা গেল। তারপর ?

—কোন একটা কারণ দেখিয়ে রাতের গাড়িতে ফিরে গেলে।

হেমন্ত জবাব দিতে গিয়ে থামল। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নিল। সিগারেট ধরিয়ে বলল—হ্যাঁ, সেটাই বোধ হয় নিরাপদ হত। কারণ, ভদ্রলোকের আচরণটা আমার বড্ড অস্বস্তিকর ঠেকছে! সামনাসামনি এসে চার্জও করছেন না—শুধু আড়ালে ওঁৎ পেতে থাকছেন। চুপিচুপি ফলো করছেন। মিস্ট্রিয়ার্স ব্যাপার!

বনশ্রী কী বলার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু বলল না।

হেমন্ত বলল—বাঘ নাকি শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সার্কেল করে ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে সার্কেল ক্রমশ কমিয়ে আনে। ইজ হি রিয়্যালি এ টাইগার?

প্রশ্নটা জোবালো হবে ভেবে হেমন্ত ইংরিজিতে করল। বনশ্রী দীর্ঘ একমিনিট পরে বলল—আড়িপাতা ওর স্বভাব।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেমন্ত বলল—আশা করি, তুমি ওর সম্পর্কে কিছু গোপন রাখতে চাইছ না?

বনশ্রী মুখ নামিয়ে হাসবার চেষ্টা করে বলল—সামনাসামনি চার্জ করার সাহস ওর নেই। কেন এটুকু বুঝতে পারছ না?

—ধরে নিচ্ছি, তাই। হেমন্ত আবার একটু ভেবে নিয়ে বলল। কিন্তু এভাবে আড়ি পেতে বেড়িয়ে কী লাভ হচ্ছে? তুমি তো ওঁর সঙ্গে জীবনযাপন করেছ। তুমি কেন বলতে পারছ না? বিকেলে তুমি বলছিলে, আমাদের খুঁজে পাননি সম্ভবত। এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঠিকই খুঁজে বের করেছেন এবং ফলো করে বেড়াচ্ছেন আগাগোড়া। হয়তো কাল রাতে জানলার নিচে আড়ি পেতে ছিলেন। আমরা জানলা খোলা রেখে · ওঃ! হরিবল? ভাবা যায় না!

হেমন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। জানলাগুলো বন্ধ আছে। সে অদ্ভুত স্বরে ফিস্ফিস্ করে ফের বলল—এখন এসে আড়ি পেতেছে কি না কে জানে। সব এ্যাবনোরই যে আইসাইটে গণ্ডগোল আছে, তার মানে নেই!

বনশ্রী বলল—অন্ধকারে ওর দেখতে অসুবিধে হয় না।

—এবং কাল রাতে বেশ জ্যোৎস্না ছিল!

বনশ্রী দুঃখে হাসল।—তুমি বড্ড বেশি অস্থির হচ্ছ কিন্তু! চুপ করে বসো তো! আমরা তো ফিরেই যাচ্ছি।

হেমন্ত শান্ত হয়ে বসল কাছাকাছি। বলল—আমার খালি একটা অস্বস্তি হচ্ছে। থানায়-টানায় গিয়ে পুলিশকে···

বনশ্রী বাধা দিয়ে বলল—সে-সাহস ওর নেই।

—কেন?

—পুলিশের কাছে ও যাবে না। নিজেই তো দাগী। কোন্ মুখে যাবে?

হেমন্ত মুহূর্তে সাহস পেয়ে বলল—তুমি সত্যি বড্ড খেলছ বনশ্রী। এত বলছি, তবু গোপন রাখছ?

বনশ্রীর চোখ জ্বলে উঠল।—খেলছ বলছ কেন ?

—না, মানে জাস্ট কথার কথা। হেমন্ত আপোসের সুরে বলল। তুমি ওর কথা সব বলছ না তো, তাই বলছি।

—বললে তুমি তো লেজ তুলে পালাবে, নয়তো সাহস থাকলে ওকে খুন করতে দৌড়বে! বনশ্রী ঠোঁট বাঁকা করে বলল কথাগুলো।

হেমন্ত বেহায়ার মতো হাসল।—তোমাকে বিধবা করার ইচ্ছে আমার নেই।

—হবার ইচ্ছে আমার কিন্তু আছে।

—ছিঃ! কী বলছ!

—তুমি তো দেখছ, আমি কে। দেখছ না! বনশ্রী তীব্র স্বরে, কিন্তু হিস্-হিস করে বলল—শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে। কত সহজে তোমার সঙ্গে এভাবে বাইরে আসতে রাজী হয়েছিলুম—চলেও এলুম। তবু তুমি আমাকে নিশ্চয় সতী ভাবছ না।

বনশ্রীর এই মূর্তি অচেনা লাগল হেমন্তর। বলল—বনশ্রী! প্লীজ!

—পারবে ওকে খুন করে ভরা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে ?

—আহা···

—না পারলে চুপ করে থাকো।

—চুপ করাটাই যে সমস্যা! হেমন্ত আক্ষেপের সুরে বলল—এলুম শালা নিরিবিলি বেড়াতে। দিব্যি থাকব, ঘুরব। এনজয় করব। কিন্তু এই এক আপদ! ওই শোন! আবার বৃষ্টিও শুরু হল! এমন চমৎকার জায়গায় একটা এত ভাল রাত্তির! শালা নিয়তি কেন বাধ্যতে!

বাইরে বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বনশ্রীর মুখে সেই বিকৃত ভঙ্গী এখনও দেখা যাচ্ছিল। হেমন্ত একটু ঝুঁকে তার কাঁধে হাত রাখল। আবার বলল—যা কিছু ঘটুক, জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে নেমে পিছিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। তাই না ?

আমার ইচ্ছে করছে, শেষমুহূর্তের জন্যেও লড়াই দিতে তৈরি থাকি। ওয়াণ্ডারফুল বৃষ্টিটা!···বনশ্রী, আই প্রমিজ। আমরা থাকছি, যা ঘটে ঘটুক। তুমি রাজী ?

বনশ্রী তেমনি বাঁকা ঠোঁটে বলল—তুমি তো হিসেবী মানুষ। পরে একজন ব্ল্যাকমেলারের পাল্লায় পড়ে অনেক টাকার খরচে পড়বে। পারবে তো জোগাতে ?

হেমন্ত চমকে উঠল—এ্যাঁ! ওই লোকটা ব্ল্যাকমেল করবে আমাকে ?

—করবে।

—কিন্তু, বললে যে পুলিশের কাছে যেতে পারবে না! তাহলে কীভাবে ব্ল্যাকমেল করবে ? আমি তো পাত্তাই দেব না।

—দেবে। তোমার বউয়ের কাছে যাবার ভয় দেখাবে।

—প্রমাণ কী দেখাবে ?

—ওর একটা অদ্ভুত টেপরেকর্ডার আছে।

হেমন্তর ওপর যেন ছাদ ফুঁড়ে বাজ পড়ল। কয়েক মুহূর্ত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকার পর সে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল।—বিকেলে কিংবা তারও আগে তোমার বলা উচিত ছিল।

বনশ্রী শান্তভাবে বলল—তখনও বুঝতে পারিনি ও আমাদের খুঁজে বের করেছে কি না।

—তবু বলা উচিত ছিল।

বনশ্রী মুহূর্তে আবার জ্বলে উঠল।—বলা তো অনেক কিছু উচিত ছিল। তোমারও ছিল। কিন্তু আমরা কেউ কাউকে তো কিছু বলিনি।

হেমন্ত উঠে দাঁড়াল। সেও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আবার রাগে কাঁপছে। লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে বলল—ভয় পেও না। আসছি।

বনশ্রী উদ্বিগ্ন স্বরে বলল—কোথায় যাচ্ছ?

হেমন্ত জবাব দিল না। বাগানের দিকের দরজা খুলে হারিকেন নিয়ে পা বাড়াল। তারপর পিছিয়ে এলো—ড্যাট্ শালা বৃষ্টি!

বনশ্রী বলল—কিন্তু যাবে কোথায়?

হেমন্ত বিকৃতমুখে দক্ষিণের জানলার দিকে এগোল। জানলা খোলার চেষ্টা করে আবার সরে এল।—ধুত্তোরি! এদিকে একেবারে ডাইরেক্ট ছাট আসছে!

বনশ্রী বলল—বুঝেছি। টেপ্ রেকর্ডার খুঁজতে যাচ্ছ! তুমি মাঝে-মাঝে অদ্ভুত ছেলেমানুষ হয়ে যাও কিন্তু। চুপ করে বসো তো।

হেমন্ত হতাশভাবে সরে এল। হারিকেন টেবিলে রেখে বলল—বড্ড পোকা আসছে! কীভাবে আসছে কে জানে! হুঁ—পিপীলিকার ডানা ওঠে মরিবার তরে! সে নির্বোধের মতো হেসে বনশ্রীর কাছে ঘেঁষে বসল। তারপর দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল—যা ঘটবে, ঘটুক। আমি মরীয়া। এমন বৃষ্টির রাতে আর কিছু নয়!

বনশ্রী তাকে ঠেলে দিয়ে বলল—বাড়ি ফিরে বউ এর সঙ্গে প্রেম করবে। ছাড়ো।

—যাঃ! বউ এর সঙ্গে প্রেম করে নাকি কেউ? হেমন্ত নির্লজ্জের মতো হাসতে থাকল। দুচোখে লোভ জ্বল্‌জ্বল্ করছে তার—বনশ্রী, পরকীয় প্রেমই রাইট প্রেম। আমাদের জীবন ধন্য। বলে সে আবার বনশ্রীকে টানল।

বনশ্রী বলল—আঃ! বিরক্ত কোরো না! প্লীজ।

—কেন? কী হল তোমার, হঠাৎ!

—বমি-বমি লাগছে।

—ও। ইয়ে, জল খাবে?

—না!

—তাহলে বরং শুয়ে পড়ো।

—শুনছি।

—না, না। শুয়ে পড়ো। যা ধকল যাচ্ছে সারাদিন! হেমন্ত সস্নেহে বলল এবং বালিশ গুছিয়ে দিল।

বনশ্রী শুয়ে পড়ল শান্তভাবে। হেমন্ত বলল—মাথা ঘুরছে না তো?

—না।

সে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে হাত বাড়াল। কিন্তু বনশ্রী ততক্ষণে কাত হয়ে শুয়েছে। হেমন্তর হাতটা সরে এল সঙ্গে সঙ্গে। হেমন্ত গুম্ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর আবার একটা সিগারেট ধরাল। বাগানের দিকের জানলায় গেল। জানলা খুলে দিল। অন্ধকার বাগানে বিদ্যুতের জিভ চেটে নিচ্ছে বৃষ্টির ধারা। চাপা গুড়গুড় মেঘ ডাকছে সারা আকাশে—যেন বিশাল খালি ড্রাম এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কারা। হেমন্ত ঘড়ি দেখল। মোটে সাড়ে সাতটা। ভেতরটা জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। জুয়ার শেষ সম্বলও ধরতে চেয়েছিল, খেলা যেন ভেঙে গেল আচমকা। বনশ্রীই বুঝি লাথি মেরে আসর ছত্রখান করে দিল। এত কথা গোপন রেখেছিল বনশ্রী! কে জানে, আরও কীসব সাংঘাতিক ব্যাপার এখনও লুকিয়ে রেখেছে। হেমন্তর তো আর কিছু নেই গোপন। এতটুকু অজানা থাকল না বনশ্রীর কাছে। বড়জোর শাখীর সঙ্গে জীবনযাপনের কিছু খুঁটিনাটি ঘটনা আছে—তা বলার মতো নয়। নাকি সেগুলোর মধ্যেই হেমন্তর প্রকৃত ব্যাপার গোপন থেকে গেছে! যেমন ঘুমের ঘোরে শাখীর জড়িয়ে ধরা—যত ঝগড়াই হোক। তখন হেমন্তর বড় মমতা হয় না শাখীর ওপর? ওকে কি তার ভারি অসহায় বাচ্চা মেয়ে লাগে না? হেমন্ত তার ঘুমন্ত গালে ঠোঁট রাখে না? এ সবই সত্যি। কিন্তু এ দিয়ে হেমন্তকে বিচার করা ভুল। ভালবাসা নিশ্চয় অন্য জিনিস। ভালবাসা বনশ্রীকে যা দিয়েছে, তাই। তার স্বাদ আলাদা। হেমন্ত আড়চোখে অস্পষ্ট আলোয় দূরে শুয়ে থাকা বনশ্রীর দিকে তাকাল। আবার লোভ গর্‌গর্‌ করে উঠল। এই লোভই ভালবাসাকে বুঝি পাইয়ে দিতে সাহায্য করে। মোদ্দা কথাটা যেন শরীর। হেমন্ত রাগ করে ভাবল—শালা শরীর? এখনও চল্লিশ বছর বয়সে নারীর শরীরের সব রহস্য জেনেও মায়া দেখাচ্ছে! মুখশ্রীর মায়া। ঠোঁটের মায়া। শ্বাসপ্রশ্বাসে সুগন্ধের মায়া। বুকের কোমলতা থেকে মায়া। আর এইসব মায়া নিশির ডাকের মতো তাকে ঘরছাড়া করে এনেছে। সে দেখছে, এইসব মায়া তাকে এখন চিৎ করে ফেলে গলায় দাঁত বসানোর চেষ্টা করছে।

হেমন্ত আড়চোখের দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিল। নিজের উপর রাগ। নিজের শরীরের ওপর রাগ। রাগ তাকে বসন্তকালের এক বৃষ্টির রাতে নান্নুমিয়ার পুত্রের মতো চেরা গলায় বলতে থাকল—ক্যা জী! মুহব্বত করতে হো? আর ধিক্কারে অনুশোচনায় কাতর এক সিনিয়ার বিলক্লার্ক, হেমন্ত, চুল খাম্‌চে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।...

তখন বনশ্রীও মনে মনে ছটফট করছে। প্রতি ঘণ্টায়, মিনিটে-মিনিটে, কত সহজে রোদ বাতাস আর বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে না পড়তে দেবতার শরীর থেকে রাঙতা, তেল-ঘাম, রঙ উজ্জ্বলতা হারাতে শুরু করেছিল। তারপর কাদাও গলে গেল। বেরিয়ে পড়ল খড়। বাঁশের কাঠামোও হয়েছে স্পষ্ট। ঘর থেকে বাইরে খোলামেলায় নেওয়ার বিপদ তো এই-ই। প্রকৃতি মানুষের ইচ্ছে-বাসনা সাধ-আহ্লাদকে নখে চিরে ফালাফালা করে ফেলে! বনশ্রীর মনে বিসর্জনের ঢাক বেজে উঠেছিল দুপুরেই। এখন নদীর জলে উল্টে রয়েছে মূর্তিটা পিঁড়িসমেত। পাশে কয়েক কুচি ছেঁড়া রাঙতা মমতায় ঘুরঘুর করছে।...

দুঃখের মধ্যে বনশ্রীর হাসতে ইচ্ছে করছিল। টেপরেকর্ডার কিংবা ব্ল্যাকমেলের কথাটা তার মাথায় কীভাবে এসে গিয়েছিল। ফলটা অদ্ভুত ফলল। বিলক্লার্ক ভদ্রলোক এবার দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। আরও ভয় কি দেখানো যেত না? কিন্তু মানুষ কচলাতে আর ভাল লাগে না। হায় রে! এই হেমন্তকে তার কী যে মনে হয়েছিল! রাস্তাঘাটে চমৎকার রূপবান স্বাস্থ্যবান ভদ্র সহানুভূতিশীল আর্দ্র-হৃদয় কত মানুষ দেখা যায়, মনে হয় এদের কেউ না কেউ অসাধারণ প্রেমিক, কেউ না কেউ অবতার [illegible] প্রফেটের চেয়ে আরও বেশি উদ্ধারকর্তা—কারুর পায়ের তলায় বুঝি মোক্ষ নদীর অমল স্রোত! এখন মনে হচ্ছে, ওদের সবার মধ্যে টেবিলের সামনে একজন করে বিলক্লার্ক বসে আছে। কিংবা মুদি—যার হাতে ওজনদাঁড়ি। এক পাল্লায় বাটখারা, অন্যপাল্লায় জিনিসপত্র। এই হেমন্তর চোখে সে দেখেছিল দূরের দেশ—পাহাড় সাগর বনস্থলী, ছুটি কাটাতে লোকেরা যেখানে উধাও হয়ে যায়! আর বনশ্রী নিজের শরীরের মূল্যেই বুঝি শেষ অব্দি পৌঁছতে চেয়েছিল নির্জন ঝর্ণার ধারে। শরীরকে গ্রাহ্য করে নি। শরীরকে মাড়িয়ে উঠতে চাইছিল ধাপে-ধাপে। জৈন মন্দিরের পেতলের চূড়োয় ঝলমল করছিল বসন্তকালের উজ্জ্বল রোদ। অনেক বড় আকাশের সুনীল বুকে জ্বলজ্বল করছি[illegible] সোনালি পদক। এখন গড়াতে গড়াতে নিচে এসে জখম শরীরের হাড়মাস থ্যাৎলানো যন্ত্রণায় জরজর হয়ে চুপিচুপি কাঁদো পোড়ারমুখী। খুব বেশী বাড় বেড়েছিল না তোমার?

বনশ্রী টের পেল তার চোখ ভিজেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাগে জ্বলতে-জ্বলতে চোখ রগড়ে মুছল। কান্নাকাটির কী আছে! যা হবার হয়ে গেছে। তাও তো বরাত জোর, হেমন্ত ভীতু লোক। হেমন্ত হিংস্রও নয়। নিরীহ এবং মোটামুটি ভদ্রও। লম্পট তাকে বলাই যায় না। হঠকারী জেদ আছে বটে, নিছক গোঁয়ারগোবিন্দ নয়। ছাপোষা সজ্জন মানুষই বটে, যে আইন ভাঙতে অনেক ভাবে। এবং এজন্যেই হয়তো বনশ্রী আত্ম-অবমাননা থেকে বেঁচে যাবে। হে[illegible]ত যদি ক্রূর ও ধূর্ত লম্পট হত, দক্ষ অভিনেতা হত—বনশ্রী লজ্জা ঢাকার জায়গা পেত না। এসবই যা সান্ত্বনা। বিসর্জিত কাঠামোর পাশে ভাসমান রাঙতার কুচি।

অতএব কান্নাকাটির কিছু নেই। বনশ্রী আস্তে আস্তে শান্ত হতে পারল। সাবধানে একটু ঘুরে হেমন্তকে দেখল। হেমন্ত জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে বৃষ্টি দেখছে। মুখটা অসহায়। কাতর। সত্যি বেচারা বড্ড ভয় পেয়েছে। ওকে বলা দরকার, তোমার বউ-এর কাছে সত্যিসত্যি কেউ টেপ্‌রেকর্ডার নিয়ে যাবে না!

হেমন্ত ঘুরতেই চোখে চোখ পড়ল। হেমন্ত বলল—বৃষ্টি একটু কমেছে। নটা বাজতে এখনও দেরি আছে। আরও একটু জিরিয়ে নিতে পারো।

বনশ্রী চিৎ হয়ে চোখ বুজল। আবার একটু প্রশ্রয় দিলেই ও এসে হয়তো ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে।

হেমন্ত ফের বলল—বমিভাবটা যায় নি?

বনশ্রী অস্ফুটস্বরে বলল—না।

হেমন্ত ঘড়ি দেখে বলল—একটা কথা ভাবছিলুম।

—কী?

—নটা পাঁচে একটা ট্রেন আছে। শেয়ালদা পৌঁছবে চারটের পর। বৃষ্টি আরেকটু কমলে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি। হেমন্ত কথা বলতে বলতে খাটের কাছে এল। পাটোয়ারিজীর বাড়িটা তো চিনি। যাবার পথে খবর দিয়ে গেলেই চলবে। একটা শক্ত কৈফিয়ৎ অবশ্য দিতে হবে। কী দেব বল তো?

—আমার মাথায় কিছু আসছে না।

—ধরো, টেলিগ্রাম কিংবা কিছু জরুরী। ধরো, চিঠি।...বলে হেমন্ত পায়চারি শুরু করল।

—সে তো পাটোয়ারিজীর কেয়ারঅফে আসার কথা।

—হুঁ। ঠিকই বলেছ।...বলে হেমন্ত ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল। তারপর মুখ তুলে খোকার মতো হাসল।...যদি ওঁকে কিছু না বলে, কিংবা নান্নুমিয়ার কাছে একটা চিঠি রেখে চলে যাই।

—তোমার খুশি।

হেমন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল।—এই আইডিয়াটা মন্দ না। তবে চিঠিফিটি নয়। নান্নুমিয়াকে মুখে একটা কিছু বলে যাব। উঠে পড়ো। গুছিয়ে নাও। বাজারে রিকশো নিশ্চয় পেয়ে যাব। না পাই, হাঁটব। ওঠ।

বনশ্রী হাসল।—আমার অত কিছু প্রাণের দায় নেই। তুমি যাবে তো যাও।

হেমন্ত হতভম্ব হয়ে বলল—তুমি থাকবে! একা! কীভাবে থাকবে?

—যেভাবে আছি। বনশ্রী শান্তভাবে বলল। এই দুর্যোগে আরাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না। অত ধকল সইবেও না। তুমি যাও, যদি যাবে। আমি কেন যাব?

হেমন্ত ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। কী বলবে, ভেবেই পেল না।

কিছুক্ষণ পরে হেমন্ত প্রায় গর্জন করল।—তুমি দেখছি বড্ড ডেঞ্জারাস মেয়ে! একা থাকবে মানেটা কী? আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে এসেছি। আর তুমি থাকবে, আমি এভাবে চলে যাব! কী বলতে চাও তুমি?

বনশ্রী একটুও উত্তেজিত হল না। বলল—পাটোয়ারিজী আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না, যদি থাকতে চাই।

—কিন্তু কী কৈফিয়ৎ দেবে ওঁকে, শুনি?

—বলব, আমার স্বামী ভদ্রলোক আমার ওপর রাগ করে চলে গেছেন!

হেমন্ত কাঁপছিল। হাঁসফাঁস করে বলল—আশ্চর্য! ভারি আশ্চর্য বনশ্রী! তোমার উদ্দেশ্য কী বলো তো? আমাকে যেন তুমি ফাঁদে ফেলেছ মনে হচ্ছে! হ্যাঁ—ইউ হ্যাভ ট্রাপড মি! হয়তো এ একটা চক্রান্ত। তোমরা দুজনে মিলেই আমাকে ট্র্যাপ করেছ!

—করেছিই তো!

—বলছ! বলতে পারছ তুমি? বনশ্রী, তুমি কী?

বনশ্রী হাসল। ইচ্ছে করেই হাসিটা ক্রুর করে নিয়েছিল। বলল—বুঝতেই তো পেরেছ, ব্ল্যাকমেলার। আমিও। এবার পাটোয়ারিজীকে বলব, আমাকে তুমি ভাড়া করে এনেছ—আমি তোমার বউ নই! তারপর তোমার বউকে গিয়ে বলব।...

হেমন্ত ফ্যাচ করে হেসে ফেলল।—যাঃ ফাজলেমি করছ তুমি! কোন মানে হয় না! রিয়্যালি বনশ্রী, তুমি একেবারে পাগলী!

বনশ্রী কপট গাম্ভীর্য রেখে বলল—মোটেও না। তুমি সাংঘাতিক ব্ল্যাক-মেলারের পাল্লায় পড়ে গেছ। তোমার রক্ষা নেই কিন্তু। না জেনেশুনে ফাঁদে পা দিতে গেলে কেন? বোঝ ঠ্যালা।

হেমন্ত পাশে এসে বসল! আদুরে গলায় বলল—ওসব ইয়ার্কি পরে করবে—প্লীজ!

বনশ্রী একই সুরে বলল—পরস্ত্রী নিয়ে প্রেম করবে, তার মূল্য দিতে হবে না?

হেমন্ত অভিমানী মুখে বলল—তুমি আমাকে অনবরত আঘাত করছ বনশ্রী! দিস ইজ ইনসালটিং! আমার ভালবাসায় কোন ফাঁকি ছিল না। এখনও নেই।

বনশ্রী বাঁকা ঠোঁটে বলল—বিনি পয়সায় মেয়েমানুষ উপভোগ করতে হলে ভালবাসা দরকার হয়। ভালবাসা! রাখো তোমার ভালবাসা।

হেমন্ত সহ্য করতে পারল না। বলল—তুমি তাহলে সত্যি সিরিয়াস! আমি ভেবেছিলুম জাস্ট এ জোক। বেশ, আমিও সিরিয়াস। এখন আমি যদি বলি এ তোমার নতুন নয়, পুরনো খেলা? আরও অনেককে এভাবে ফাঁদে ফেলেছ?

বনশ্রী কোন কথা বলল না দেখে সে ফের বলল—আমি নির্বোধ। তাই বুঝতে পারিনি কিছু। আমার বোঝা উচিত ছিল, হাজার প্রেম থাক, এভাবে বাইরে চলে আসতে এবং শরীর দিয়ে নিঃসংকোচে খেলতে পারে যারা—তারা কে? আমি তো

শালা লম্পটের হুদ্দ—ছিলুম না, হয়ে গেছি, আর নোভিস বলেই ফাঁদে পড়েছি। তবে তোমারও মুখোশ খুলে দেওয়ার দরকার আছে। আফটার অল, আমি পুরুষ। তুমি মেয়ে।

উঠে গিয়ে ভিজে প্যাণ্টজামা ভাঁজ করতে ব্যস্ত হল হেমন্ত।

সাত

ঘরের চাপা শব্দগুলো থামলে বনশ্রী চোখ খুলল। দায়িত্ববান প্রেমিক, বেচারা সিনিয়র বিলক্লার্ক হাতে স্যুটকেস নিয়ে খাটের আধমিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে। রাগ করেই হয়তো হ্যারিকেনের দম বাড়িয়ে দিয়েছিল। কাচে অনেকটা কালি পড়েছে এবং হলুদ নিটোল ছোট্ট টুপির মতো শিখাটার ওপরদিকে মেটে সিঁদুর রঙের বিস্ফোরণ ঘটছে। কয়েক সেকেণ্ডেই খয়েরি ধোঁয়া দেখা দিল কাচের ভেতরে। আলো আরও কমল। কয়েকটা প্রচণ্ড সাদা পোকার অস্থিরতা লক্ষ্য করতে থাকল বনশ্রী।

—তবু একটা রেসপন্সিবিলিটি থেকে যাচ্ছে বলেই বলছি··· হেমন্ত বলল— তুমি চাইলে তোমাকে ট্রেন অব্দি পৌঁছে দেব।

বনশ্রী বলল—ধন্যবাদ।

—বেশ।···বলে হেমন্ত দরজার দিকে পা বাড়াল। হলঘরের ভেতরে ঢুকে আবার দাঁড়াল। বলল—আবার একটা চান্স দিচ্ছি। যাবে তো, এস।

বনশ্রী তেতো গলায় বলল—থাক।

হেমন্ত অন্ধকার হলঘরে জুতোর প্রচুর শব্দ করল। হলঘর থেকে তাব প্রতি-ধ্বনিময় চাপা গম্ভীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।—তোমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে আমার যা খুশি করতে পারো—যত খুশি। কিন্তু সাবধান, আমাবও হাতে যথেষ্ট অস্ত্র আছে।

বাইরের দরজা খুলতে সে একটু সময় নিল—যেন জবাব শোনার আশা, কিংবা বনশ্রীর ক্ষমাপ্রার্থনার প্রতীক্ষা। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। দরজা খোলার শব্দটা জোরেই হল। বাইরে ছিটেফোঁটা বৃষ্টির মধ্যে সে আরও কিছু হয়তো বলল —স্রেফ মুখখিস্তিই বা। তারপর আর তার সাড়া পেল না বনশ্রী।

একটু পরে সে ব্যস্তভাবে উঠল বিছানা থেকে। টেবিলের কাছে গিয়ে শিখাটা কমিয়ে দিল। তারপর হ্যারিকেন নিয়ে হলঘরে গেল। বাইরে কী ঘটছে দেখার চেষ্টাও করল না। দরজা বন্ধ করল। ফিরে এল এ ঘরে। ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘ দুমিনিট।

মাথা ঘুরে উঠলে বনশ্রী বিছানায় প্রায় আছাড় খাওয়ার মতো লুটিয়ে পড়ল। উবুড় হয়ে দুহাতে চাদর আঁকড়ে ধরল। সে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল।

কতক্ষণ পরে সে শান্ত হল। দম আটকানো ভাবটা চলে গেছে। একটা অদ্ভুত প্রশান্তি টের পাচ্ছে বুকের মধ্যে। মাথার ভিতরটা অবশ্য শূন্য লাগছে। সে ঘুরে চিৎ হয়ে শুল। অনেক উঁচু শিলিঙে ঝোলানো ফ্যানটা দেখতে থাকল। স্থির ফ্যানে একটা টিকটিকি ঝুঁকে নীল জ্বলজ্বলে চোখে তাকে লক্ষ্য করছে। একটু ভয় পেল এতক্ষণে। না—টিকটিকির জন্যে নয়। এই নির্জন পুরনো বাড়িতে একলা ঘরে থাকার যে অস্বস্তি, কিংবা এমন সব সময়ে একলা ঘরে সিলিং বা ফ্যান দেখলে সংগুপ্ত আত্মহননবৃত্তির ঘুম ভাঙে।

এইসময় তাকে প্রচণ্ড চমকে দিয়ে বাগানের দিকের দরজায় কেউ শব্দ করল। বনশ্রী হুড়মুড় করে উঠে বসল সঙ্গে সঙ্গে। পরক্ষণে ডিব্বুর ডাক শুনতে পেল—মেমসাব! মেমসাব! হামি ডিব্বয়া আছি। হামি ডিব্বয়া, মেমসাব! বনশ্রী বিরাট সাহসে খাটের নিচে পা বাড়াল।

পাজী ছোঁড়াটার কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা আছে যেন। বনশ্রী দ্রুত চোখ মুছে এবং শাড়ি ঠিকঠাক করে নিয়ে সাড়া দিল—কে রে? ডিব্বু নাকি?

—জী মেমসাব। আপ একেলে হ্যায় মেমসাব?

বনশ্রী নির্দ্বিধায় দরজা খুলে দিল। অন্ধকারে ডিব্বু সিঁড়ির ওপর সরে গেছে কয়েক পা। হয়তো ভদ্রতায়, কিংবা মার খাবার ভয়ে। বনশ্রী হেসে বলল—আয়, ভেতরে আয়।

ডিব্বু ভেতরে ঢুকে ঘরের ভিতরটা দেখে নিল। তার পরনে একটা নোংরা ছোট্ট ডোরাকাটা পাজামা। খালি পা। গায়ে তেমনি নোংরা বেরঙা শার্ট—ফুলহাতা। বোতাম বলতে কিছুই নেই। চুল কিন্তু চমৎকার আঁচড়ানো। বৃষ্টি-ধোয়া মুখ ঝকমক করছে। ছেলেটা এত ফরসা আগে বুঝতে পারে নি বনশ্রী। চেহারাও এত সুন্দর ওর। ও যে সত্যি নবাববংশের ছিটেফোঁটা তাতে ভুল নেই। বনশ্রী খুশি হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

নাকি এই দুর্যোগের রাতে নির্জন বাড়ির একলা ঘরে বনশ্রীর কাছে দেবদূত এসেছে উদ্ধারের বার্তা নিয়ে। বনশ্রীর কী যে ভাল লাগছিল! সেই ভাললাগা চোখেই হয়তো তুচ্ছ ক্ষয়াটে এতটুকু শ্রী অনেক বড়ো হয়ে ফুটে উঠছিল।

বনশ্রী ঠোঁট টিপে হেসে বলল—কী রে? হঠাৎ এখন মরতে এলি কেন?

ডিব্বু হাসল।—সাব বলল, মেমসাব একেলে হ্যায়!

—বলিস্ কী রে? সায়েবের সঙ্গে তোর দেখা হল কোথায়?

—হামাকে ডাকল। ডিব্বু জানাল।…আব্বা খানা পাক করছিস্। হামি এল।

বনশ্রী ঘড়ি দেখে বলল—পোনে ন'টা বাজে। একটু বোস্ তাহলে। নটায় গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার আসবে। বোস্ না—চেয়ারে বোস্।

বনশ্রী এসে খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। ডিব্বু চেয়ারে বসল না। টেবিলে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। ওকে এখন বেশ লম্বা দেখাচ্ছে। বনশ্রী বলল—রাত্রে কী

রান্না করছে তোর বাবা ?

—রোটি, ডাল।···অন্যমনস্কভাবে ডিব্বু বলল। সাব কাঁহা গেয়া, মেমসাব ?

বনশ্রী ভুরু কুঁচকে তাকাল।—তোকে বলে নি কোথায় যাচ্ছে ?

ডিব্বু মাথাটা জোরে দোলাল। তারপর অন্যদিকে ঘুরে কিছু দেখতে দেখতে বলল—উনহির্ হাতমেঁ স্যুটকেস দেখলাম। মস্‌মস্ কারকে জুত্তা দাবাকে চোলে গেল।···সে ফিক করে হেসে উঠল এবার। যেইসা আদ্‌মিলোক ভাগ্ যায়! সায়েব ভেগে গেল!

ছোঁড়াটা ধূর্ত। বনশ্রী অনেক আগেই টের পেয়েছিল, এখানে আসা অব্দি। এভাবে যথেষ্ট স্বাধীনতায় ঘুরে বেড়ালে কম বয়সেই মানুষের হাড় পেকে যাবার কথা। বনশ্রী কপট ধমক দিয়ে বলল, কী বল্‌লি ? সায়েব ভেগে গেল ?

ডিব্বু এতটুকু ভড়কে গেল না। বলল—জী মেমসাব ?

—জী মেমসাব! বনশ্রী ওকে নকল করে মুখ ভেংচাল। খুব বুঝেছিস্ তুই!

ডিব্বু হঠাৎ আলনার দিকে ঘুরে একটু ঝুঁকল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল-আনডেরউয়ের মেমসাব।

—কী ?

—জী মেমসাব! সাব আনডেরউয়ের ফেককে গিয়া। উও—দেখ—উও! গিরে হুয়ে! বলে সে আলনার নিচে কোণার দিক থেকে বাঁহাতের আঙুলে হেমন্তের একটা আণ্ডারউয়্যার তুলে দেখাল।

বনশ্রী ধমক দিল।—রাখ্ বলছি। এতটুকু ছেলে, সবদিকেই চোখ।

ডিব্বু আণ্ডারউয়্যারটা তাচ্ছিল্য করে ফেলে দিয়ে আঙুল মুছল নিজের উরুর কাছে। কিন্তু মুখে কোন দুষ্টুমি নেই! বলল—সাব বহুৎ মেজাজী। বহুৎ রাগী লোক। হাম হুঁয় দেখতা তো ভাগ্ যাতা। আঙুল তুলে কাল্পনিক হেমন্তকে দূরত্বে নির্দেশ করে সে বলতে। থাকল—ঔর হুঁয়া দেখকেই ভাগ্‌তা। ঔর হাম দেয়ালকা পর খাড়ে রহে, উও জমিন মে--তো এ বাপ্! ঢিল মারলে আতা! বহুৎ মেজাজী।

ডিব্বু আরও বলতে থাকল। সেগুলোর সারমর্ম ঃ সে এখানে প্রচুর সায়েব দেখে আসছে। কেউ একলা আসে, কেউ বউ নিয়ে। কেউ ইয়ারবন্ধু নিয়ে। সে পিছনে লাগে তাদের। তামাসা করে অল্পস্বল্প। কিন্তু কেউ তাতে রাগ করে না। একটা ছোট্ট মানুষ তামাসা করছে—এতে রাগ করার কী আছে ? সে ওদের কত টুকিটাকি ফাইফরমাশও খেটে দেয়। কেউ বখশিস দেয়, কেউ দেয় না—ভুলেই যায় তার কথা। কিন্তু এই মেমসাহেব সায়েবটির মতো লোক সে কখনও দেখে নি! কী রাগী, কী মেজাজী! একটা ছোট্ট মানুষের সঙ্গে সায়েবসুবো লোকের মারামারি কি ভাল দেখায় ? আর দেখুন না মেমসাব, ট্যুরিস্টলোকেরা এসে কত খারাপ খারাপ কাজ করে। ডিব্বু ঝোপেঝাড়ে ওঁৎ পেতে বেড়ায়। ভাঙাচোরা,

বাড়ির মধ্যে পা টিপে টিপে বনবেড়ালের মতো ঘোরে। তার চোখে সব পড়ে। এখানে কতসব ভাঙাচোরা মসজিদ আছে। কবর আছে। নিরিবিলি জায়গায় মুহব্বত করার মওকা পেলে লোকেদের আর হুঁশ থাকে না। ঈশ্বরের জায়গা অপবিত্র করতেও বাধে না। ছিঃ ছিঃ মানুষ কি জানোয়ার! যে মরে কবরে যায়, সে তো আল্লার কাছে চলে যায়। আল্লার এক্তিয়ারে থাকে। তার তখন কবরেই ঘর। সেই কবরের ধারে তুমি খারাপ কাজ করছ। ডিব্বু তখন গিয়ে না হি হি করে এইসা হাসিটি হাসবে, মুহব্বৎ পয়মাল হয়ে যাবে। এই তো তার কাজ। অথচ তার নির্বোধ বাবাটা তাকে একশো গালমন্দ করবে। লোকে বলবে ডিব্বুটা খারাপ হয়ে গেছে। খারাপ কাজ দেখবার জন্যে ওঁৎ পেতে বেড়াচ্ছে। আসলে ডিব্বু পাহারাদারের কাজ করে বেড়ায়। এইয়ো। খবর্দার। হোঁশিয়ার।

বনশ্রী নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। ওর কথাগুলো সে কি মন দিয়ে শুনছিল? ডিব্বু কি অবিকল ওইসব কথাই বলছিল? বনশ্রী ভাবল, না—ঠিক তা নয়। আসলে ওর অস্পষ্ট দুর্বোধ্য ভাঙা উর্দু-বাংলা মেশানো কথার এই ব্যাখ্যা বনশ্রী নিজেই করে নিয়ে বুঝল। তার সামনে এই বালক—অন্ধকার বৃষ্টিরাতের এই আগন্তুককে বনশ্রী নিজেই পবিত্র দেবদূতে পরিণত করে ফেলেছে। নান্নুমিয়ার ডেঁপো কৌতূহলী নোংরা ছেলের খোলস নিজের হাতেই ছিঁড়ে ফেলে বনশ্রী বের করে এনেছে এক সুশ্রী নিষ্পাপ অমর্তশিশুকে। এখন ঠিক এমনি একজনের দরকার ছিল। অনুশোচনা, দুঃখ, প্রতিহিংসার অস্থির সময়ে এমন কাকেও চাইতে হয়। বনশ্রী চাইবামাত্র পেল। তার মন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল।

ডিব্বু কথা শেষ করে হি-হি হাসছিল। টেবিলের পিছনে দুহাতে আঁকড়ে দুলছিল হাসির চোটে। তারপর বনশ্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আচমকা থেমে গেল। রাগ করল বুঝি মেমসাব? কিন্তু মেমসাব রাগ করে নি। একটু পরে মেমসাবের ঠোঁটে হাসি ফুটল—বলিস কী রে ডিব্বু?

আশ্বস্ত হয়ে সে জবাব দিল—জী হাঁ মেমসাব।

—তাহলে তুই কে কী করছে দেখতেই ঘুরে বেড়াস?

ডিব্বু লজ্জা পেয়ে মুখ নামাল। একটু পরে বলল—ঔর ট্যুরিস্টলোক কবরকা উপ্পর, মসজিদা কা অন্দর বৈঠে-বৈঠে মদ ভি পিতা! বহৎ হল্লা ভি করতা। কত্তো মারামারি ভি হয়েছে মেমসাব। উও ড্রাইভার সলিম আছে—উনকা বড়া ভাই তসলিমকো মেজেস্টেরসাব জিম্মাদারের নোকরি দিয়েছে। শালালোক ভাং-গাঁজা পিয়ে পড়ে থাকে। আব্বা থানামে যাকে পুলিশ বোলাকে লাতা। বহৎ আগে আব্বা ভি জিম্মেদারের নোকরি করত। ঝামেলা! ছোড় দিস মেমসাব।

বাইরে এতক্ষণে গাড়ির শব্দ হল। ডিব্বু বাগানের দিকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে বনশ্রী দ্রুত ভাবতে বসল।

একটু পরে বাগানের দিকে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সলিম ড্রাইভার আর

ডিম্বু এল। সলিম দরজার বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সেলাম দিল। বনশ্রী এগিয়ে গিয়ে বলল—শোন। পাটোয়ারিজীকে গিয়ে বলো, সায়েবের খোঁজে একটু আগে কলকাতা থেকে লোক এসেছিল। ওর বাবা অসুস্থ। তাই উনি তক্ষুনি চলে গেছেন। পাটোয়ারিজীকে খবর দেবার সময় পান নি। নটা পাঁচে নাকি ট্রেন—তাই। আর।

বনশ্রী একটু দম নিয়ে ফের বলল—আমার শরীরও হঠাৎ অসুস্থ। সকালে ডিম্বু দেখেছে, ফিট হয়ে গিয়েছিলুম।

ডিম্বু দ্রুত বলল—হাঁ বারাগম্বুজমে।

—আমি সায়েবের সঙ্গে যেতে পারলুম না। তুমি পাটোয়ারিজীকে বলো। কেমন?

সলিম ড্রাইভারের মুখটা নির্বিকার। বলল—জী। তব্ খানা নেহি খায়েগা আপ?

—না। খাবো না।

—ঠিক হ্যায়। সলিম সেলাম দিয়ে ঘুরল। নিচে নেমে সে বলল—ডিম্বুয়া! উন্‌হিকী পাস্ যাকে বৈঠ বে! মেমসাব একেলে।

তা আর বলতে? ডিম্বু দৌড়ে চলে এল ঘরে। বলল—আপ খানা নেহি খাওগী, মেমসাব? থোড়া কুছ তো খাবেন? ভুখ মে মরে যাবেন মেমসাব।

বনশ্রী ধমক দিল। থাম্ তুই। আর শোন, মেমসাব বলবিনে।

—জী?

—মেমসাব বলবিনে, বুঝেছিস?

—তব্ মাইজী বলব।

বনশ্রী হাসল। ওর মুখে দিদি-টিদি শুনবে ভেবেছিল। তা মাইজী, মন্দ কী। তার বয়স এখন অনেক বেড়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। কে জানে চুলগুলো—অনেক বেশি চুল তার, ঈর্ষাজনক বিশাল ঘন চুল, এতক্ষণে হয়তো সাদা হয়ে গেছে। আনমনে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। কিছু দেখা যায় না—আলো ম্লান। চেহারা অস্পষ্ট। শুধু টের পাচ্ছে, ওই প্রতিবিম্ব তার নয়। বয়স্ক ক্লান্ত এক প্রৌঢ়া নারীর। ঠোঁট, স্তন, নাভি, ঊরু, জঙ্ঘায় ক্লেদ জমে আছে। এক দীর্ঘ বিলম্বিত যৌবনের তীক্ষ্ণ কামবাসনার প্রহারে প্রত্যঙ্গগুলো ক্ষতবিক্ষত ছিল—এখন তার দুর্গন্ধ পুঁজরক্ত থক্‌থক্ করছে। সে দ্রুত ঘুরে বলল—ডিম্বু আমার সঙ্গে একবার নদীর ঘাটে যাবি।

—জী?

—বলছি, গঙ্গায় স্নান করব। তুই আলো নিয়ে ঘাটে বসবি। কেমন?

—তো চলিয়ে মেম্……

—আবার!

—জী, মাইজী।

—দাঁড়া, তালাচাবিটা কোথায় রেখেছে, দেখি।

—ইয়ে লিজিয়ে। সাব বহুৎ হোঁশিয়ার আদমি।···

টেবিলে তালাচাবি ছিল। সদর দরজা দিয়ে দুজনে বেরুল। আর বৃষ্টি পড়ছে না। মেঘ ভেঙে নক্ষত্র ফুটেছে কোথাও। বেশ ঠাণ্ডা আছে। গেট থেকে বেরিয়ে পশ্চিমের পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরল ওরা। বাড়িটা ছাড়িয়েই বাঁ দিকে দূরে নহবতখানার ফটকের মাথায় হলুদ আভা দেখল বনশ্রী। চাঁদটা এতক্ষণে উঠছে। সামনে ঘাট। দুধারে দুটো কাঠের উঁচু নকশাকাটা ছত্র। এ ঘাটটা ছোট। এমন ছোটবড় সিঁড়িবাঁধানো ঘাট অনেকগুলো আছে দেখেছে। উত্তরে সামান্য দূরে বারোগম্বুজের ঘাটটা অনেক বড়ো। ওদিকটা অন্ধকার। সামনে নদীতে কোথাও কোথাও একচিলতে আলো দেখা যাচ্ছে। ওগুলো নৌকো। অল্প বাতাস বইছে। ঘাটে জল খেলছে অস্ফুট শব্দে। ডানদিকের ছত্রের নিচে গোল চত্বরে সরু লোহার থামের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল ডিব্বু। আলোটা বনশ্রী একধাপ নিচে রেখে ফের তুলে নিল—তুই দম কমিয়ে ওপাশে রেখে দে, ডিব্বু।

ডিব্বু হুকুম তামিল করল। একটু পরেই অন্ধকারের অস্পষ্টতা ঘুচে গেল। বনশ্রী সাবধানে হলুদ সিল্কের শাড়ি ও ব্লাউজ খুলে পাথরের ধাপে রাখল। ভিজে ধাপ। তা হোক, বেশি কিছু ভিজবে না। সে নিঃসঙ্কোচে ব্রেসিয়ার খুলে তোয়ালে জড়িয়ে নিল। সায়া পরা দেহে নিচের ধাপে নামল। একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ডুবে মরবে না তো? শেষ ধাপে বসে পা বাড়িয়ে জলের ভেতর নিচের ধাপটা দেখে নিল। স্রোত টের পেল না। তখন সাহস করে আরও দুটো ধাপ নেমে কোমর জলে বসল। সায়া উলটে যাচ্ছিল। তীক্ষ্নদৃষ্টে ওপরে ডিব্বুর দিকে নজর রেখে সে সায়া ডুবিয়ে দিল। বুদ্বুদের শব্দ হল প্রচুর। ফাজিলটা হাসছে কি না কে জানে! সে ডাকল—ডিব্বু!

—জী মেমসাব্!

—আবার মেমসাব কী রে?

—জী মাইজী।

—একটু বোস্ বাবা। কেমন? ডুবে গেলে যেন ঠ্যাঙ্ ধরে টানবি।

—আপ আরাম্‌সে নাহিয়ে। হামি বৈঠে আছে।···

নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণীর ভক্তিতে বনশ্রী গঙ্গা স্নান করতে থাকল। ততক্ষণে দূরে নহবতখানার ফটকের ওপর মেঘ গেছে সরে। দেখতে দেখতে চাঁদটা বিশাল হলুদ বেলুন হয়ে ভাঙা খিলানের গায়ে ঝুলতে থাকল। হাল্কা জ্যোৎস্না তেলের মতো ভাগীরথীর জলে গড়িয়ে পড়ল। স্রোতে ভেসে যেতে থাকল। নান্নুমিয়ার পুত্র গুনগুন করে গান গাইছে। দুহাতে জল তুলে মাথায় দিতে থাকল বনশ্রী। যতটা ঠাণ্ডা হবে ভেবেছিল, জল ততটা ঠাণ্ডা না। বরং ঈষদুষ্ণ। শরীর মন ধুয়ে

যাচ্ছে। জ্যোৎস্না, নির্জনতা, জাহ্নবী তিনজন মিলে বনশ্রীকে ধুয়েমুছে পরিচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

কতক্ষণ কোমর অব্দি ডুবিয়ে জলেডোবা তৃতীয় ধাপটিতে বসে রইল বনশ্রী। তারপর ডিম্বুর গলা শুনল—মেমসাব! মাইজী! সলিম গাড়ি লেকে আয়া উধার!

বনশ্রী সাবধানে বসা অবস্থায় ওপরের ধাপে উঠতে উঠতে বলল, তুই এক কাজ কর বাবা! আলো নিয়ে চাবি নিয়ে চলে যা! আমি আসছি।

—ডর হোবে না তো মাইজী?

—না রে বাবা, না। তুই যা তো! বড্ড বক্‌বক করিস তুই!

ডিম্বু আলো নিয়ে চলে গেলে বনশ্রী উঠে দাঁড়াল। নির্দ্বিধায় উর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন রেখে তোয়ালে স্পঞ্জ করতে থাকল। তারপর দ্রুত চারদিক দেখে নিয়ে ভিজে সায়াটার ফাঁস খুলে দিল। ফিকে জ্যোৎস্নায় জনহীন ঘাটের ধাপে নগ্ন নারীমূর্তি। কাকে লজ্জা আর? এখানে প্রকৃতি। প্রকৃতির কাছে লজ্জা নিয়ে দাঁড়াবার মানে হয় না। স্খলিত পাপড়ির মতো সাদা সায়া পায়ে মাড়িয়ে বনশ্রীর পরাগগুচ্ছ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত—অন্যমনস্ক। তাকে ঘিরে অস্থির গাঙ্গেয় নৈশবায়ু স্থির হয়ে গেল। তখন পিছনে হেলে তার সুবিশাল চুল ঝাড়তে থাকল তোয়ালে দিয়ে।

তারপর তার সংবিৎ ফিরল। দ্রুত শাড়িটা জড়াতে থাকল গায়ে। সায়া ব্লাউজ ব্রেসিয়ার ঝটপট কুড়িয়ে নিপুণ হাতে ধুয়ে পাখলে নিল। পরিপাটি করে জল নিংড়াল। এবং ধীর পায়ে ধাপ পেরিয়ে ওপরের চত্বরে এসে দাঁড়াল। মনে গভীর তৃপ্তি আর প্রশান্তি জেগেছে বনশ্রীর। নিজেকে পবিত্র লাগছে। আর এখন তো সে মুক্ত। ভারমুক্ত। সম্পূর্ণ নতুন এক নারী। তার পিছনে কিছু নেই, ডাইনে নেই, বাঁয়ে নেই—যা আছে, সবই সামনে আছে।

পা বাড়াতে গিয়ে বনশ্রী হঠাৎ বাঁদিকে তাকাল। ডিম্বু যে ছত্রের নিচে বসে ছিল, সেটা এখন তার ডানদিকে। সে বাঁদিকের ছত্রের নিচেটা লক্ষ্য করেই চমকে উঠল। জ্যোৎস্নার আলো এত কম, দশ-বারো হাত দূরের কোন জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু একটা কিছু যে ছত্রের নিচের প্রায় আড়াই ফুট উঁচু গোল চত্বরে রয়েছে, তাতে কোন ভুল নেই। প্রথমে ভাবল, কুকুরটুকুর হবে। পরে মনে হল, নান্নুমিয়ার সেই খাসিটাই বুঝি। কিন্তু একবারও ঘুণ্টির শব্দ শোনে নি। পরক্ষণে বনশ্রী ভয় পেল। বারোগম্বুজের ওখানে জঙ্গলে নাকি এখনও বাঘ থাকে। বাঘ নয় তো? পাটোয়ারিজিও বলছিলেন—বারোগম্বুজের মধ্যে গতবার একটা বাঘ শুয়ে থাকতে দেখেছিল লোকে। অবশ্য হ্যালুসিনেশনও হতে পারে। পাটোয়ারিজীর ছেলেবেলায় কিন্তু এই এলাকায় অনেক বাঘ ছিল। আজকাল বাঘ কেন, শেয়ালও কদাচিৎ দেখা যায়। তবে বলা যায় না। প্যালেস থেকে কয়েক মাইল ভাগীরথীর পাড়বরাবর প্রচুর ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল গজিয়ে

রয়েছে। সরকারী এলাকা। পড়ে আছে অযত্নে। বাঘ থাকলেও অবাক হবেন না পাটোয়ারিজি।

বনশ্রীর আর ঘুরে দেখার সাহস হল না। পা টিপেটিপে কিছুটা এগিয়েই সে গতি বাড়াল। বাগানবাড়ির সামনে আলো জেলে জীপ দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে প্রচুর গাছপালা ঝোপঝাড় বলে আলো আসে নি। জ্যোৎস্নাও পৌঁছয়নি। অন্ধকার রাস্তাটুকু বনশ্রী কীভাবে পেরোল, নিজেই টের পেল। তারপর তার মুখে হাসি ফুটল। ভয় পাওয়ার কথা ভেবেই।

সলিম ড্রাইভার সেলাম দিয়ে বলল—পাটোয়ারিজী আপনার খানা ভেজলেন।

বনশ্রী বলল—আমি তো খাব না বলেছিলুম!

—জী হাঁ। লেকিন্ উনি ভেজলেন। বললেন—পাঁওমে বাতেব পেন বেড়ে গেল—বর্ষাতমেঁ। সলিম সবিনয়ে জানাল। উনি এখন মালিশ লাগাচ্ছেন। মালিশ লাগাকে দো-চার ঘণ্টা শোকে রহ্না পড়ে। ইস্‌লিয়ে···

বনশ্রী হেসে বলল—ঠিক হ্যায়। ডিব্বু কোথায়?

—অন্দরমে। আপ যাইয়ে, মেমসাব। ফিন্ শুভে মে দেখা হোগা। পাটোয়ারিজীভি আসবেন।

সেলাম দিয়ে সলিম জীপে উঠল। বনশ্রী গেট আটকে দিয়ে হন্‌হন্ করে এগিয়ে গেল।

ডিব্বু হারিকেন টেবিলে রেখে চেয়ারে বসে ছিল। উঠে দাঁড়াল কাঁচুমাচু মুখে। যেন বড্ড দোষ করে ফেলেছে। টেবিলে স্টেনলেস স্টীলের ঝকমকে ছোট্ট টিফিন কেরিয়ার। দেখেই বনশ্রীর খিদে পেল। বলল—তুই তো এখনও খাস নি, তাই না?

ডিব্বু বলল - হামি খেয়ে লেবে। আব্বা ডাকবে।

—উঁহু! দেখি কী সব পাঠিয়েছেন পাটোয়ারিজী। দুজনে খেয়ে নেব, বুঝলি? বনশ্রী টিফিনকেরিয়ার খুলতে ব্যস্ত হল। এ কী রে এত যে দুজনে খেয়ে শেষ করতে পারব না। ইস। সবই দেখছি নিরামিষ। হ্যাঁ রে, পাটোয়ারিজীরা তো জৈন—মাছ-মাংস খায় না?

ডিব্বু মাথা দুলিয়ে বলল—উওলোগকা খানা হামি খাইনি, মাইজী।

—খাস্ নি। আজ খেয়ে দ্যাখ্।

—জী নেহী মাইজী! হামলোক কিসকা খানা নেহি খাতা।

-সে কী রে! কেন?

ডিব্বু গম্ভীর মুখে বলল—হামলোক নবাবকা খান্দান। কিসিকা ঘরমে নেহি খাতা—মুসলমান হো, ঔর হিন্দু হো!

বনশ্রী ওর দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। এতটুকু ছেলে—বড় জোর দশ থেকে বারোর বেশি বয়সই নয়। যা চেহারা, ভালভাবে দুবেলা হয়তো পেটপুরে

খাওয়াও হয় না। বুড়ো লোকটা রাঁধে—কোন মেয়ে নেই। অথচ ওই অদ্ভুত গোঁ। বনশ্রী বলল—রাখ্! খাবারে কোন দোষ নেই। বসে পড় আমার সঙ্গে।

—জী নেহি, মেমসাব!

—আবার মেমসাব বলছিস?

ডিম্বু কাঁচুমাচু হেসে তাকিয়ে রইল।

—আমি তোকে ডাকছি। খেতে বলছি। খাবিনে?

ডিম্বু মুখ নামাল। আঙুলের শুকনো চামড়া খুঁটতে থাকল।

বনশ্রীর জেদ চেপে গেল। ওর কাঁধে হাত রেখে বলল—আমার মুখের দিকে তাকা। হ্যাঁ, তাকা। আমি বলছি, তুই খাবিনে?

তাকিয়েই মুখ নামাল সে। বিড়বিড় করে বলল—হামলোক নবাবকা খান্দান!

—রাখ্ তোর নবাবী! কে বলল তোকে? বনশ্রী ধমকাল। নবাব না হাতি। কোনকালে কী ছিল, তাই নিয়ে তুই এতটুকু ছেলে—তোর এতসব কী রে?

হঠাৎ বনশ্রী টের পেল, নান্নুমিয়ার পুত্রের চোখের তলা ছপছপ করছে। সে ওর চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা তুলে বলল—তুই কাঁদছিস! সে কী? এতে কান্নার কী আছে? বড় অদ্ভুত তো তুই! আমি তোকে জোর করব ভাবছিস? তোব জাত মেরে দেব? বনশ্রী হেসে উঠল। পাগল তুই, পাগল ছেলে! ঠিক আছে বাবা খাসনে।

বনশ্রীর মন খারাপ হয়ে গেল। আজ রাতে এক অবাধ স্বাধীনতার স্রোতে ধস ছেড়ে পড়ে গিয়ে বনশ্রী এই তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরতে চাইছিল।

সে আস্তে বলল—আমারও তেমন খিদে নেই রে। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। বারণ করেছিলুম, তাও একগাদা খাবার পাঠিয়েছে।

বনশ্রী আলগোছে একটুকরো লুচি ভেঙে মুখে দিল। একটু তরকারি চাখল। তারপর টেবিলের তলা থেকে কুঁজোর জল গড়িয়ে খেল।

মুখহাত ধুয়ে তোয়ালেতে মুছতে মুছতে সে বলল—তুই রাতে তাহলে থাকছিস তো আমার কাছে? একা থাকতে আমার ভয় করবে কিন্তু।

ডিম্বু একটু হেসে মাথা দোলাল। এই শান্ত করুণদৃষ্টি ছেলেটার আরেক চেহারা আছে, ডেঁপো ফক্কড় ফাজিল এঁচোড়ে পাকা। ভাবতেই অবাক লাগছে এখন। আর ওর জাতের গুমোর! নবাবী রক্তের বড়াই! বাইরের কোন মুসলমানের হাতেও ও খাবে না—এমন অদ্ভুত সংস্কার।

হয়তো এমন একটা সংস্কার তার কাছে বালাই ছিল। নয় তো কেনই বা যার-তার সঙ্গে ভালবাসার নামে দেড়শো মাইল পাড়ি, একশয্যায় রাত কাটানো, শরীর নিয়ে খেলা! সংস্কার থাকা ভালোই হয়তো। বনশ্রী আনমনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই ছেলেটার কোথাও একটা প্রচণ্ড মনোবল আছে, বনশ্রীর তা নেই, থাকলে আত্মার এই অপমান, এই গ্লানির হাত থেকে বাঁচতে পারত। এখন বড়জোর নিছক জোড়া-

তালি দিয়ে ঠিকঠাক রাখা ছাড়া আর কিছু করার নেই তার।

বাগানের ওদিকে কোথায় নাম্নুমিয়ার চেরা গলার কাঁপা-কাঁপা আওয়াজ ভেসে এল—রাতের স্তব্ধতা চিড় খেল কয়েক মুহূর্ত।—ডিম্বুয়া— আ—আ! বেটা—আ—আ! আ যা—আ—আ!

শরিফ আদমির মতো ডিম্বু বলল—হাম আভি আতা, মাইজি! এবং সে পুবের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাগানে তারও চিলচিৎকার শোনা গেল—চুপ বে বুড্ঢা! শাসালোক খালি ফাড়তা! ডিম্বুয়া ডিম্বুয়া। ডিম্বুয়া কম্বরম্নে চলা গিয়া।

বনশ্রী দরজাটা বন্ধ করে দিল। হ্যারিকেনের আলোয় তার কিটব্যাগ থেকে শুকনো সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার বের করল। জানলাগুলো তেমনি বন্ধ রয়েছে অতএব সে গায়ে কোন মতে জড়ানো শাড়িটা খুলে ফেলল। নগ্ন হতে বনশ্রী আড়ষ্ট হয় না কোনদিনও। আরও অনেক ব্যাপারে তার খুব একটা দ্বিধাসংকোচ থাকে না। এ তার একধরনের সাহসও বলা যায়। ছেলেবেলা থেকে সে অনেক মেয়ের চেয়ে বেপরোয়া। এখন এ মুহূর্তে সে ইচ্ছে করলে যেন মানুষও খুন করতে পারে। পারেই তো। তেমন কোন প্রয়োজন এলে সে খুন করতেও পিছপা হবে না।

এক অদ্ভুত হিংসা কিংবা উদ্ভট ক্রোধে অস্থির বনশ্রী শরীর ঢাকতে থাকল।

চুল আঁচড়ে ফ্যানের সুইচ টিপতে গিয়ে মনে পড়ল, কারেন্ট বন্ধ। বিরক্ত হয়ে দক্ষিণের জানলাটা খুলল। বিমুক্ত ভাগীরথীর বুক থেকে জলের আঁশটে গন্ধ নিয়ে একটা বাতাস এসে ঢুকল। তারপর বনশ্রী পুবের জানলা দুটোও খুলে দিল। হাল্কা জ্যোৎস্নাও এল। চাঁদটা বৃষ্টিধোয়া আকাশে খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জানলার নিচে থেকে খাটের বিছানা অব্দি গাছের ডালপালার একটুখানি ভাঙাচোরা ছায়া পড়েছে কালো নকশাকাটা ঝালরের মতো। কা স্থ। চাদরটা একটানে তুলে গুটিয়ে ফেলল সে। একটা শাড়ি বের করে এনে ম্যাট্রেসের ওপর বিছিয়ে দিল। তারপব দক্ষিণের জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরেই মনে হল, এই ঘরে কী যেন আছে। শুঁয়াপোকার মতো লক্ষ লক্ষ প্রাণী,—যারা প্রজাপতি হতে চেয়েছিল, কিন্তু পরম বিবর্তনের স্তরে পৌঁছবার আগেই দুজনের জুতোর তলায় পিষে গলে গেছে। তাদেব সবুজ রক্ত অজস্র শুঁয়া—তীক্ষ্ন, তীব্র, অস্বস্তিকর জ্বালা দিচ্ছে। ছড়িয়ে থাকতে থাকতে বিছানা আর মেঝে থেকে, দেয়াল থেকে এবাব বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে আর গায়ে বিঁধে যাচ্ছে। আর বড় নোংরা এই ঘর আর বিছানা। ওইসব চেয়ার এমনকি এই ঐতিহাসিক মাটিও বড্ড নোংরা হয়ে গেছে। দুঃস্মৃতির কটু গন্ধ ওড়াচ্ছে গাছপালা, ধ্বংসস্তূপে। বনশ্রী দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। ঠোঁট কামড়ে তাকিয়ে রইল বিছানার দিকে।

কোন অধিকারে এখনও সে এঘরে দাঁড়িয়ে আছে এবং ঘুমোতে চাইছে? এক

সিনিয়ার বিলক্লার্কের স্ত্রীর অধিকারেই তো! পাটোয়ারিজী বনশ্রীকে চেনেন না। দেখেন নি কোনদিনও। বনশ্রীর খাতির হেমন্তর খাতিরে। হেমন্তর স্ত্রী হয়ে এসেছিল সে।

বনশ্রী আর একমুহূর্ত দেরি করল না। ঝটপট সবকিছু গুছিয়ে নিল। ভিজে কাপড়গুলো তোয়ালেতে জড়িয়ে ব্যাগে ঢোকাল।

বাইরে জ্যোৎস্না এখন পরিষ্কার। সে ভারি কিটব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে হনহন করে এগোল। পীরের মাজারের পাশ দিয়ে যাবার সময় কেরামত খাঁর গলার ঘুণ্টি বাজতে শুনল। লম্ফের আলোয় ফাটলধরা ছোট্ট গ্যারেজের মতো একটা ঘরে পিতাপুত্র বসে খাচ্ছে। বেড়ার ধারে একটু দাঁড়িয়ে ওদের দেখল বনশ্রী। চাপা-গলায় ওরা কথা বলছে।

—হাঁ, হামভি এইসি শোচা বেটা! মেমসাবকো ছোড়কে সাবলোক ভাগা। হাম এক নজর দেখকে ভি সমঝায়া, ডালমে কুছ কালা হ্যায়!

—বুরি বাৎ মাৎ বোলো জী! চুপ সে খা লো! খালি···

—ইয়ে জমানমে সাবলোক বহৎ হারামী হ্যায়, বেটা। বেগানা ঔরৎ লেকে মৌজ লুটনে আতা হেঁয়াপর! দেখতে দেখতে বুঢ্ঢা হো গেয়া হাম!

—চুপো জী!

—ঔর ক্যা শুনা তু?

—কুছ নেহি। চুপসে রহো। খালি বক্ বক্ বক্ বক্···

একটু পরে।—পাটোয়ারিজীকা এহি তো এক কাম! ইয়ে কোঠি খরিদ কিয়া লাখো রুপেয়ামে। মোহনলালজীসে চোট দেকে খরিদ কিয়া। অফিসার লোগোঁকে ফুর্তি-উর্তিকে লিয়ে। তুম ফুর্তি-উর্তি কিও, হাম তুমকো কোঠি দেতা। মাগার তুম ভি হামকো কুছ ফায়দা দো। তো বহৎ ফায়দা আভিতক উঠায়া পাটোয়ারিজীনে। কেত্তা লাখ উঠায়া, খোদা মালুম!···

আর শুনতে চাইল না বনশ্রী।

নহবতখানার দেউড়ি পেরিয়ে বাজার। বাজারে এখন লোকজন প্রায় নেই। দু-একজায়গায় মোম জ্বলছে। বেশির ভাগ দোকান বন্ধ। চৌমাথায় রিকশোর ঝাঁক। বনশ্রীকে দেখেই হইচই উঠল।—আইয়ে দিদি। টিশন যাবেন তো। আইয়ে—দশ বাজকে পঞ্চান মিনাট মে টেরেন। কোন টেরেনে যাবেন দিদি? কলকাত্তা যাবেন তো?

বনশ্রী স্টেশনে পৌঁছে দেখল সওয়া দশটা বাজছে। আরও চল্লিশ মিনিট দেরি আছে। সে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিংরুমের দিকে এগোল।

দরজার কাছে গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। কোণার দিকে ইজিচেয়ারে হেমন্ত পায়ের ওপর পা তুলে মড়ার মতো চিত হয়ে রয়েছে। নটা পাঁচ ফেল করেছে তাহলে। বনশ্রী আর ভেতরে ঢুকল না···

আট

আসার দিন মনে হয়েছিল খুব বড় স্টেশন। এখন চারপাশে তাকিয়ে বনশ্রী দেখল, বড় নয়—মাঝারি বলা যায়। একটা ওভার-ব্রীজও নেই। আসলে সেদিন মনে ছিল এক কুমারী মেয়ের দ্বিধা। দৃষ্টিতে ছিল আচ্ছন্নতা। পায়ে জড়তা ছিল। দৈবাৎ চেনাজানা কারও চোখে পড়লে কৈফিয়তের দায় তো ছিলই। আর ছিল ভিড়। শনিবারের বিকেলে ভিড় হওয়াটা স্বাভাবিক। সেই ভিড়ে প্রেমিকের সঙ্গে কোন-রকমে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঝোঁকে বনশ্রী ভূগোলের দিকে তাকায় নি। এখানে নাকি দেশের ইতিহাস আছে। এখন ফিরে এসেও তো মনে হচ্ছে না দেশের ইতিহাসে ঢুকে পড়েছিল। প্যালেস নহবতখানা বারোগম্বুজ মানে তখন তার কাছে এক নির্জন গোপন ঘর। ভালবাসা-বাসির খেলাঘর। তার বেশি কিছু নয়। ওদিকে ভিড় পেরোতেই তৈরি ছিল পাটোয়ারিজীর জীপ। পলকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেই নির্জন গোপন ঘরে। অতএব বনশ্রী কিছু লক্ষ্য করে নি।

এখন সেই স্টেশন ... দাঁড়িয়ে দেখছে। পিছনে বিদ্যুৎবিহীন প্রায় অন্ধকার শহর এখন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। এই স্টেশনও বড় স্তব্ধ, ঝিমধরা, মিটমিটে আলোয় তেমনি ভুতুড়ে হয়ে আছে। কিছু লোক শুয়ে আছে, কেউ বসেছে, কেউ একাদোকা দাঁড়িয়ে আছে। চাপা স্বরে কথা বলছে কেউ-কেউ। প্ল্যাটফর্মের নিচে লাইন অন্ধকার। ওপারে অন্ধকার গাছগাছালির আড়ালে যেন মৃতদের দেশের শুরু। বনশ্রীর মনে হল, জীবিত ও মৃতদের মাঝখানে এক রহস্যময় সীমান্তরেখায় সে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

স্টেশনের বারান্দায় একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে খোলামেলায় প্ল্যাটফর্মের অন্যপাশে এগিয়ে গেল। জ্যোৎস্নার রঙ এখন সাদা। গোড়াবাঁধানো একটা গাছের তলায় বসতে গিয়ে সে বসল না। কে শুয়ে আছে। বনশ্রী বিরক্ত হল। ভ... রে নোংরা লোকেরা সবখানে ভিড় বাড়াচ্ছে ক্রমশ। কোথাও একটু বসার জায়গা পাওয়া কঠিন ওদের জন্যে। বনশ্রী আরও কিছুটা এগোল। এদিকে আবার মালপত্রের স্তূপ। লোকেরা বসে চাপাগলায় কথা বলছে। মুখে আগুন জ্বগজ্বগ করছে। বনশ্রী ঘুরল। ততক্ষণে তার সহজাত বোধ বলে দিয়েছে, মেয়েদের পক্ষে এভাবে ঘোরাঘুরি করাটা ঠিক নয়। লোকের চোখে পড়ে যাবে। দুজন রেলপুলিশ দুবার ঘুরঘুর করে গেল।

তারপর বনশ্রীর মনে হল সবাই তাকে সত্যিসত্যি লক্ষ্য করছে। এলোচুলে রাতের আলোহীন স্টেশনে একা কোন মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখলে, সেটা তো স্বাভাবিকই। আর তার অস্থিরতাও চোখে না পড়ে পারে না। রাতের গাড়ির যাত্রীদের মধ্যে মহিলারা নেই, এমন নয়। কিন্তু তাদের সবারই স্বজন আছে। তারা কেউ একা নয়। এবং তারা স্বজনের কাছ ঘেঁষে যেন নিরাপদ জায়গায় বসে

আছে। শুধু বনশ্রী একা। এবং নিরাপত্তার গণ্ডী পেরিয়ে বারবার কোথায় যে ছুটে যাচ্ছে !

স্টেশনঘরে কেরোসিন বাতি জ্বলছে। স্টেশনবাবুরা গম্ভীরমুখে নিঃশব্দে কাজকর্ম করছেন। বনশ্রী উঁকি মেরে রেলঘড়ি দেখল। মোট তিনটে মিনিট কেটেছে এতক্ষণে ? আঃ, এখনও সাঁইত্রিশ মিনিট—তবু যদি ডাউনট্রেনটা আসে ঠিক সময়ে। তার পাশ দিয়ে একচোখো রেললণ্ঠন যাচ্ছিল। বনশ্রী প্রায় ফিসফিস করে জিগ্যেস করল—ট্রেন রাইট টাইমে আসবে তো ?—ক্যা মালুম। উসকা মর্জি। বলে ভূতুড়ে লণ্ঠনটা চলে গেল। বিশ্বাস হয় না কোন লোক আছে লণ্ঠনে। এখনও টিকিটের ঘণ্টা পড়ে নি। সাত মিনিট পরে পড়ার কথা। ঘণ্টা পড়লে বুঝি হুলস্থূল বাধবে। রাতের স্তব্ধতা, প্রতীক্ষা, আর জীবিত ও মৃতের এই সীমান্তরেখায় বুঝি বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। এবার সেই মুহূর্তের জন্যে বনশ্রী। অস্থির।

অস্থিরতা তাকে অন্যমনস্ক করল। সে আবার কয়েক পা হাঁটল বারান্দায়। ওয়েটিংরুমের দরজার সামনে যেতেই তার চমক ভাঙল। হেমন্ত কোণার ইজিচেয়ারে তেমনি গা এলিয়ে বসে আছে। দুহাত মাথার ওপর ওঠানো। তার পায়ের পাশে স্যুটকেসটা।

বনশ্রী দরজার সামনে দিয়ে অন্যপাশে চলে গেল তক্ষুনি। টিকিট কাউণ্টারের কাছে গিয়ে সে এতক্ষণে একটা বেঞ্চে জায়গা খালি দেখল। জনাচার লোক ঠাসাঠাসি করে বসে আছে। এখানে কেরোসিন বাতির আলো পৌঁছয় নি। সে বসার চেষ্টা করলে ওরা নড়েচড়ে জায়গাটুকু বাড়িয়ে দিল। ক্লান্ত বনশ্রী বসে পড়ল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না, বসতে পেরেই সেটা বুঝল। মাথা আবার ঘুরছে। শরীর এতক্ষণে দুর্বল লাগছে। শুয়ে পড়তে পারলে আমরা হত। অথচ এখন আরাম আশা করা বৃথা।

সে চোখ বুজে বেঞ্চে হেলান দিয়েছিল। কতক্ষণ পরে টিকিটের ঘণ্টা বেজে উঠলে সে চোখ খুলল। তখন যতটা হুলস্থূল হবে ভেবেছিল, তেমন কিছু ঘটল না। লোকেরা শান্তভাবে কাউণ্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তেমন কোন ব্যস্ততা নেই। বনশ্রীর পাশে গা ঘেঁষে যে লোকটা বসেছিল, সে হাই তুলল। মুখে অস্পষ্ট একটা শব্দ করল। বনশ্রী একটু চমকে তার দিকে তাকাল।

ওপাশের লোকগুলো টিকিট কাটতে একে একে উঠে পড়ল এবং এগিয়ে গিয়ে লাইনে দাঁড়াল। কিন্তু এই লোকটা গেল না। জায়গা ফাঁকা পেয়ে সে একটু সরে গেল।

এখানে আলো নেই। সিল্যুট মূর্তির মতো একটা লোক দুহাত তফাতে সরে বসেছে। তাহলে বনশ্রীর চিনতে ভুল হল না।

অমনি বনশ্রী উঠে দাঁড়াল।

—বনি !

বনশ্রী ঠোঁট কামড়ে চাপাস্বরে বলল—বলো !

অস্পষ্ট হাসি। তারপর—বেড়ানো হয়ে গেল এরি মধ্যে ?

—আমার খুশি।

—হুঁ। তোমার খুশি। কিন্তু কী পেলে ?

বনশ্রী ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু তুমি কী পেলে ফেউয়ের মতো চুপিচুপি পিছনে ঘুরে ? লজ্জা করে না তোমার ? ছিঁচকের মতো ফলো করে বেড়াও !

—সেটা আমারও খুশি।

—থামো ! বনশ্রী পা বাড়াল। কিন্তু গেল না।

—আমি তো থেমেই আছি, বনি। চিরদিন ! দেখে যাচ্ছি, কতদূর তুমি উড়তে পারো। এখন কিছু বলছি না। বলব না। বলতুমও না। কিন্তু এতক্ষণ আমার গা ঘেঁষে বসে রইলে ! আমার তাই লোভ হল। হয়তো···

বনশ্রীর সামনে দিয়ে সিনিয়ার বিলক্লার্ক হন্তদন্ত হেঁটে গেল। বনশ্রীকে লক্ষ্য করল না। বনশ্রী দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল—অন্তুকে কোথায় রেখে এসেছ ?

—তোমার বাবা-মায়ের কাছে।

বনশ্রী আবছা অন্ধকারে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বেঞ্চের এক কোণায় দূরত্ব রেখে বসল। কোন কথা বলল না।

—কান্নাকাটি ! কাঁহাতক আর সামলানো যায়। এদিকে রোগোর মায়েরও শরীর ভাল না। বুড়িই বলল, খামোকা জেদ করে মায়ের ছেলে আটকে কী হবে ! ঘরে আসার হলে এ্যাদ্দিন আসত। বরং দিয়ে আয়। তো পরশু অন্তুকে দিতে গেলুম।

—আমি এখানে এসেছি কে বলল ?

—শ্বশুরমশাই বললেন, অফিসের মেয়েদের সঙ্গে কোথায় যেন গেছে শাশুড়ী বললেন, তোমাদের আপিসের কোন মেয়ে বলে গেছে মনসুরগঞ্জে গেছে বনি। খোকাকে দিয়ে এসে আমারও বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। হঠাৎ খেয়াল হল, যাই।

ও চুপ করলে বনশ্রী চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—এর পরও আমাকে তোমার ঘেন্না হচ্ছে না ?

—ভুলচুক মানুষেরই হয়। রাস্তাঘাট আজকাল বড্ড পিছল। তাই বলে···

—থাক্। বড় বড় কথা শুনতে চাইনে আর।

—তুমি তো জানো বনি, আমি বেশি লেখাপড়া শিখিনি। সামান্য বেয়ারার কাজ করি। তুমি শিক্ষিতা মেয়ে। অনেক বেশি বোঝ জানো। আমি কট্টুকুন্ জানি। শুধু জানি, তোমার পাশে আমাকে মানায় না।

—আঃ, থামো !

—তার ওপর ভগবানের মার খেয়ে জন্মেছি। আমার ছেলেও আমাকে সাদা ভূত বলে ঠাট্টা করে। বস্তিতে থাকি। ভালকথা ও শিখবে কোথায় ?

—চুপ করো তো।

এদিকে বয়সও হয়ে গেল পঞ্চাশ-বাহান্ন। আপিসে বাবুরা ঠাট্টা করে কতরকম। চুল পাকল কিনা বোঝাই যাবে না সুরেনের।···ফিকফিক করে হাসে সে। ফের বলে—তোমাকে নিয়েও বরাবর ঠাট্টা। কী করে জেনে ফেলেছে সব। আজকাল লোকেরা চালাক।···

শান্তস্বরে বনশ্রী বলল—কিছুক্ষণ আগে গঙ্গায় স্নান করছিলুম, তখন তুমিই কি ঘাটের পাশে বসেছিলে ?

—হুঁ। আবার কে ? তখনই ভাবলুম ডাকি। তো ভয় হল। চেঁচামেচি করলে লোকেরা এসে মারধোর করবে। বিদেশবিভুঁই জায়গা।

বনশ্রী কিটব্যাগের ভেতর থেকে মানিব্যাগ বের করে উঠে গেল আলোর দিকে। টাকা বের করে নিয়ে এল।—দুটো টিকিট নিয়ে এসো। ফার্স্টক্লাসের।

বেজারমুখে সুরেন বেয়ারা বলল—খামোকা খচ্চা কেন ? রাতের গাড়িতে সেকেণ্ড ক্লাস ফাঁকা থাকতো আমার সঙ্গে বিছানা আছে। পেতে দেবখ'ন। ঘুমোবে।

—না। যা বলছি, করো।

অনিচ্ছুক বেয়ারা ভদ্রলোক উঠল। শেষ চেষ্টা করে বলল—ফালতু খরচ এ বাজারে। বরং আমারটা সেকেণ্ড ক্লাস কাটি। তোমাকে দিতে হবে না আমার ভাড়া।

বনশ্রী হিসহিস করে বলল—ফের একটা কথা বললে থাপ্পড় খাবে। যাও বলছি।

সুরেন গোঁ ধরে দাঁড়াল।—এটা তিলজলার সেই ঘর নয়, প্ল্যাটফরম। আর এ-সুরেন সে-সুরেনও নয়। চিবকাল মানুষ একরকম থাকে না, বনি। একটু ভেবেচিন্তে কথা বলো।

দুঃখেও বনশ্রী হাসল।—তাহলে তুমি চুপ করে বসো। আমি আনছি। পালিও না।

—আমি পালাই না। তুমিই।

বনশ্রী স্টেশনঘরেই ঢুকে পড়ল। ফার্স্টক্লাসের টিকিট নেবে, কাউণ্টারে যাবে কেন ? একশোটাকার নোটটা এগিয়ে গর্বিত মুখে দাঁড়াল।—দুটো শেয়ালদা ফার্স্টক্লাস।

গম্ভীর টিকিটবাবু বললেন—শেয়ালদা ? আরও পঞ্চাশ লাগবে।

আরও পঞ্চাশ ? দেড়শোটাকা ? এত বেশি ! আসার সময় সিনিয়ার বিলক্লার্ক ভদ্রলোক টিকিট কেটেছিল। মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করতে যাচ্ছে, অত টাকা

লাগাই তো উচিত। বনশ্রী একমুহূর্ত ইতস্তত করল।

জীবনে এই হয়তো একবার। আড়াইশো টাকা মাইনের অস্থায়ী চাকরি যার, এবং যার স্বামী কিনা আপিসের বেয়ারা, তার পক্ষে এখন হিসেবে চলার স্বাভাবিকতা থাকবেই। কিন্তু এই হয়তো শেষবার সিনিয়ার বিল ক্লার্কের চোখের সামনে সেই অ্যালবিনো এবং হলেও হতে-পারত ব্ল্যাকমেলারের পাশে বসে যাবার লোভ—অথবা মনের তলাকার মেয়েলি সংস্কার, বনশ্রী আরও পঞ্চাশটাকা হাসি-মুখে এগিয়ে দিয়ে বলল—তাই বটে। মনে ছিল না!

টিকিট নিয়ে এসে সে দেখল, লোকটা পালায় নি। চুপ করে বসে আছে। বনশ্রী ডাকল—এস। ওদিকে ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়াই। ওঠ।

হুকুম তামিল হল। দুজনে একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ধুয়ে যাচ্ছে। বনশ্রীর এখন কত সাহস!

বনশ্রী বলল—তাই বলে ভেবো না, তোমার ঘরে গিয়ে উঠছি।

—নাঃ। তা ভাবব কেন?

—যদি তাই যাই, তোমার ঘেন্না হবে না? নিতে পারবে আমাকে?

—জানি না বনি। ভেবে দেখব।

—কেন ভেবে দেখবে? বনশ্রীর স্বরভঙ্গ হল।

—বস্তি জায়গা। দেখেছই তো, কতসব বাজে লোক! তোমাকে নিয়ে আবার মুশকিলে পড়ব! আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি—আসলে লোকের অত্যাচারেই তুমি চলে এসেছিলে!

কতকটা তাও বটে। বনশ্রী সাবধানে চোখ মুছে বলল—বাবার ওখানে তুমি থাকবে?

—এত কম জায়গা। একখানা ঘরে কে কোথায় থাকব?

—তুমি গেলে একটা ব্যবস্থা করা যেত। পার্টিশান মতো করে…

—সে কথা পরে। ফিরে তো যাই!

বনশ্রী হিসহিস করে বলল—বুঝেছি। তুমি আমাকে ঘেন্না করছ!

—যদি করি, ভুল করছি—না ঠিক করছি, তুমিই বলো বনি!

—হ্যাঁ। ঠিকই তো। আমাকে তোমার ঘেন্না করাই উচিত।

—ছিঃ বনি! কান্নাকাটি করে কী হবে!

—কাঁদছি না। বয়ে গেছে কাঁদতে!

বনশ্রী আবার সাবধানে চোখ আর গাল রুমালে মুছল। ফের বলল—অন্তুর কথা বলো।

—অন্তু! খিকখিক করে হাসল সুরেন বেয়ারা। অন্তু যা পাকা হয়েছে আজকাল!

—ওকে স্কুলে দিয়ে আসে কে?

—আমিই দিয়ে আপিসে চলে যাই। নিজেই চলে আসে। ওই তো একটুখানি পথ মোটে! নতুন ক্লাসে একগাদা বই এবার। সব ইংরাজী বই। কী…

—এবার তো ক্লাস ওয়ান হল?

—হ্যাঁ। মেমদিদিমণি খুব ভালবাসে। মায়ের মতো। কোন-কোনদিন বাড়ির দোর অব্দি রেখে যায়। এই যে দুতিনটে দিন কামাই হল, নিশ্চয় এসে খুঁজে গেছে।

এই সময় ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল। দূরে উত্তরে আকাশে আলোর ছটা। বনশ্রী বলল—এতক্ষণে আসছে!

সুরেন হাসল।—রাতের গাড়িতে উঠতে অসুবিধে হত। উঠিয়ে দিও। চোখ দুটো ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে। দেখালুম কত জায়গায়। বলল. কিছু করার নেই। জন্মদোষ। ষাটের আগেই কানা হয়ে যাব—ভেবো না!

বনশ্রী প্রায় গর্জে উঠল—আমি ভাবিনি!

—কথার কথা বলছি।

ট্রেন বাঁকের মুখে এসে গেছে। সুরেন চোখ বুজে বলল—চোখে আলো ফেলছে! ইস্! আমাকে উঠিয়ে দিও।…বলে সে বগলে রাখা ছোট্র বিছানাটা সামলে নিতে থাকল।

ট্রেন এসে দাঁড়াল। বনশ্রী ওর হাত ধরে ভিড় ঠেলে এগোল। ফার্স্টক্লাসটা কোথায় কে জানে। সে ব্যস্তভাবে হাঁটছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল, সিনিয়ার বিলক্লার্ক ভদ্রলোক একটা সেকেণ্ডক্লাস কামরায় উঠে পড়ল।

কয়েকমুহূর্তের জন্যে লোকটার প্রতি মমতা জাগল বনশ্রীর। বুকের ভেতর কোথায় চিনচিন করে উঠল একটা ক্ষত। কিন্তু জোর করে তা চাপা দিয়ে বলে উঠল—এই যে ফার্স্টক্লাস! সাবধানে ওঠ—আমি ধরছি।

একটু পরে কয়লা ইঞ্জিন কাঁপা কাঁপা শিস দিল। চাকায় শব্দ হল। কামরা নড়ে উঠল। এক স্টেশন ছেড়ে রাতের রেলগাড়ি আবার চলল অন্য এক স্টেশনে। সেখান থেকে আবার অন্য স্টেশন।



বড়গল্প

তোমার কাছে দাঁড়িয়ে

এখন মধ্যরাত। অন্ধকার। হেমন্তের শেষ গন্ধটুকু চাপা পড়েছে শুকনো পাতার তলায়। হিম কুয়াশার ঝাঁক নক্ষত্রের পিদিমগুলো ধূসর কাঁচের মোড়কে ঢেকে ফেলেছে—যেন ফসলের ক্ষেতের শিয়রে ঝোলানো চাষা বুড়োদের পুরোনো লণ্ঠন। এমন এক স্তব্ধ নিঃসঙ্গ নির্জন সময়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছি।

…মনিরা, এখন এই শীতের প্রারম্ভে তোমার কবরে হেমন্তের দূর্বাঘাস হলুদ হয়ে এসেছে। শিয়রে তরুণ কাঠ মল্লিকার কাঁটা ধূসর রঙ ধরেছে। পাতা ঝরার ঋতু এল পৃথিবীতে। তাই চারদিকে হিমহাওয়ার টুপি পরে নিঃসঙ্গ সর্ব্বত্যাগী ফকিরের মত গাছগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে পরস্পরের কাছ থেকে। যেন মাটি থেকে পা তুলে পথে বেড়িয়ে পড়তে দেরী নেই। এবং আমার চারপাশের এই বিষাদময় বৈরাগ্যের পৃথিবীতে এখন তোমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। কেন দাঁড়িয়ে আছি মনিরা? যদি তুমি নিছক শারীরিক কিছু হতে, এমনি করে তোমার কাছে এসে দাঁড়াতুম?

না। আসতুম না। বেশ বুঝতে পারছি এ দেহ ছাড়াও মানুষের আর একটা দেহ আছে। রক্তমাংসময় স্থূল দেহের এক প্রতিদেহ। এ দেহ না থাকলেও সে-দেহ থাকে। দুটোই সত্য। একটা প্রদীপ, অন্যটা আলো। একটা না ধর্মী, অন্যটা হ্যাঁ ধর্মী। আমার লেখায় সেই আলোটাকে আনবারই প্রয়াস। আর সেই আলোর অপর নামই কি জীবন যা দেহকে পুড়িয়ে বিকিরিত হয়?

তাহলে মনিরা, জীবনের কথা এসে যাচ্ছে। কিন্তু তোমার জীবন মানে কী? কিংবা আমার জীবন? আমরা নিজেরা নিজেদের জীবনের যতখানি জানি, তাই কি সম্পূর্ণতা? মা বলতেন—খোকা, তুই ছেলেবেলায় একবার কো· থেকে পড়ে গিয়েছিলি। বাঁচবার আশাই ছিল না তোর।…আমি বলতুম—তাই নাকি? কই মনে নেই তো।…এমনি অনেক কথা বলতেন আমার সম্পর্কে, যা আমি একটিও জানি না। আমার জীবনে আমি সেসব যোগ করিনি। অথচ সাধ হয়, সেগুলোও লোকের কাছে শুনে যোগ করে দিই। আমার কেবলই পিছন ফিরে বয়সের উজানে চলে গিয়ে সব দেখতে ইচ্ছে করে। কেবলই পিছু হটার চেষ্টা করি। স্মৃতি অন্ধকার, দুর্গম, শূন্যতা। এবং মনে পড়া কত কঠিন। সেই ছ'বছর বয়সে একবার ট্রেনে করে কোথায় যেন আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। একটি মেয়ের কোলে বসেছিলুম। কবে কোথায় একটা টুলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভয়ে কাঁদছিলুম। তার আগে কী সব ঘটেছিল? পাঠশালার প্রথম দিন আমার চোখের কাজল নিয়ে কারা ঠাট্টা করেছিল যেন, তার আগে? তারও আগে? সব অন্ধকার স্মৃতির পথে যেন কোন গভীর জলের ভিতর দিকে নেমে গেছে। প্রাচীন আদিম বিশাল আরণ্য জলাভূমি।

আমি কি সেই অন্ধকার জলার ভিতর থেকে নিঃসঙ্গ উঠে এসেছিলুম, পায়ে ফাঁড়িঘাস মাড়িয়ে, শালুকের গুচ্ছ হাতে উঠে আসা উলঙ্গ ভেজা শরীর, ওই বাগ্দী ছেলেটার মত? কিন্তু কী আশ্চর্য, তোমার জীবন বলতে গিয়ে আমার জীবনটা কী অপরূপ মায়ায় সোনালী রূপালী নক্ষত্রের মত হেসে দাঁড়াল মাথার উপর। মনিরা, একটু অপেক্ষা করো। আমার মধ্যে দিয়েই তুমি আসবে। যেমন করে শীতের ফসল মাঠ দিয়ে খাঁটি চাষা হেঁটে যায়—তেমন করে আমার জীবনের ওপর পা ফেলে তুমি হেঁটে যাবে।

তাহলেও কিন্তু সেই মনে পড়ার পথ ধরে চলতে হয়! স্মৃতির তোষামোদ করতে হয়। অথচ স্মৃতির শয়তানী কম নয়। সে খোদার উপর খোদকারী করে। ১৯৪৫ সালের বাংলাদেশে যখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্যে কংগ্রেস লীগে তুলকালাম কাণ্ড চলেছে, সেই সময়ের একটা কাণ্ড তোমার কী মনে আছে? স্মৃতির সেই বেলেল্লাপনার কথা ভাবলে আজও হাসি পায়। সেবার আমাদের এই গঞ্জের ময়দানে বিরাট একটা সভার আয়োজন হয়েছিল মুসলমানরাই ছিল তার উদ্যোক্তা। আমি তখন কলেজের ছাত্র, তুমি সম্ভবতঃ ম্যাট্রিকের জন্য তৈরী হচ্ছ। কথা প্রসঙ্গে বলেছিলুম এ সভায় মোরাদাবাদের নবাব সাহেবের ছেলে আসছে। ভারী সুন্দর চেহারা ভদ্রলোকের। যেন ইতিহাসের বই থেকে উঠে আসা। হবে না কেন? ওদের দেহে তো খান্দানী মোগলরক্ত রয়েছে।

তুমি হেসে খুন হলে, মনিরা। বললে—ওকে কোথায় দেখলে?

—গত বছর মোরাদাবাদে গিয়েছিলুম মামুজীর সঙ্গে।

সচরাচর নবাব-টবাব শুনলে আমার কেমন ঘেন্না করে। কমলদা নামে একটি কম্যুনিস্ট ছাত্রনেতার ভাষায় আমি 'খোলসে বুর্জোয়া, ভেতরে প্রোলেতারিয়েত।' কিন্তু অমন ফরসা চেহারা, খাড়া নাক···

মনিরা, তুমি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লে এবার। বললে—থামো, থামো। উঃ কী জলজ্যান্ত মিথ্যে বলতে পারো।

রেগে গেলুম—আমি মিথ্যে বলছিনে। খানিক পরেই স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

তুমি বললে—লোকটা শ্যামবর্ণ, একেবারে কোচোয়ানের মত চেহারা। আমার নানীর বাড়ী মোরাদাবাদ। আমার চেয়ে তুমি বেশী দেখনি।

—বেশ বাজী ধরো।

—বাজী। হারলে কী দেবে?

—দশটাকা। তুমি?

—আমি?···হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কী বলেই দ্রুত চলে গেলে।

কী বলেছিলে মনিরা? কিন্তু ততক্ষণে আমার দেহের ভিতর সব আলো যেন

যেন তীব্রতায় সাদা হয়ে গিয়েছিল। আর ভিতরের আলো বাইরে ছড়িয়ে চারদিক উজ্জ্বল করে তুলেছিল। কোথাও পাখী ডাকছিল। অজস্র ফুল ফুটে উঠেছিল। সৌরভ, আর বাতাসের দোলা। সবটুকু চেতনা গান হয়ে যাচ্ছিল। উদ্বেলিত মনে আমি সেদিন বিকেলে জনসভায় অপেক্ষা করছিলুম। স্পষ্ট জানতুম না বাজী জিতলে তুমি আমাকে কী দেবে। অথচ ওই রকম পাখিডাকা ফুলফোটা চঞ্চলতা, আলোর প্রকাশ। তারপর বিকেলে ময়দানে গেলুম। সেখানে সাদিকের সঙ্গে দেখা। সাদিক তখন উদ্যোক্তাদের এক পাণ্ডা, স্বয়ং ছাত্রনেতা। সে আমাকে দেখে বললো—আরে আরে…তুই এখানে? ব্যাপার কি?

বললুম—কেন? আমার কি আসতে মানা?

—মানা নেই। তবে তুই আবার মুসলমানদের আলাদা আত্মনিয়ন্ত্রণ কথাটা মানিস নে তাই বলছি।

হেসে বললুম—রাখ ওসব। হ্যাঁ রে, মোরাদাবাদের নবাবজাদা আসবেন শুনেছিলুম, আসবেন তো?

সাদিক কপট গাম্ভীর্যে চাপা স্বরে বলল—কেন বল তো? তোর কংগ্রেসী বন্ধুরা জানতে চাচ্ছে বুঝি? বোমা মারবে?

খাপ্পা হয়ে বললুম—তোর সব তাতেই বিশ্রী ইয়ে। কংগ্রেসীরা হিংসাবাদী নয়। গান্ধীর মত নেতা তাদের আছেন। অহিংসায় বিশ্বাসী তারা।

সাদিক আমার ক্রোধকে আমল না দিয়ে বলল—তা থাকুন। কিন্তু টেররিস্টরাও আসলে বর্ণচোরা কংগ্রেসী ছিল। এখন তাদের অনেকে প্রকাশ্যে কংগ্রেস করছে।

রাজনীতির পাণ্ডারা বরাবরই আমার চক্ষুশূল। তবু দুনিয়াটায় থাকতে হলে তাদের সঙ্গে মিশতে হয় এই যা। আর সাদিক তো আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। মনের কথা এমন করে আর কারুর সামনে তো আমরা পরস্পর বলতে পারতুম না।

তবু তর্ক করতে ছাড়তুম না। তর্ক আমাদের কিছুক্ষণের জন্য মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দিত। কিন্তু তারপর ফের সেই নিভৃতে বসে মনের কথার ঝাঁপি খোলা। সেই মনিরা, মনিরা…দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে যোগসূত্র। মনিরা নামক গ্রন্থি দুটি পরস্পর বিরোধী সত্তাকে একত্র রেখেছিল।

তা, সরে এসেছিলুম তার সামনে থেকে। অজস্র মানুষের ভীড়ে সেই একটি মানুষ আসবার নীরব অধৈর্য প্রতীক্ষা। এমন করে কী সেই সভায় আর কেউ অপেক্ষা করছিল নবাবজাদার জন্য? যেন নবাবজাদা নন, আমার জন্য একটি জয়মালা আসবে, তাই গলা বাড়িয়ে বসে আছি। যেন আসবে এক রাজসনদ, যাতে লেখা থাকবে: মনিরা কামালকে যা দিতে চায়, তা দেওয়া হোক।

তারপর এলেন তিনি। আমার চোখ মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে গেল। মাথা ঘুরতে থাকল। সারা পৃথিবী নিভে গেল আবছায়ার মত। সেই পাখীরা থামল।

ফ্রল ঝরল। গন্ধ ফ্রোল। ম্খ নীচু করে আমি হাঁটছিল্ম। আমার জন্যে রাজসনদে লেখা আছে ঃ মনিরাকে যা দিতে চেয়েছ, দাও।

স্মৃতি কী প্রবঞ্চনা করে মান্ষকে! স্মৃতিকে বিশ্বাস করতে নেই। সে শয়তানের চেয়ে মারাত্মক ছলনাকারী। নবাবজাদার গায়ের রং শ্যামবর্ণা।

…আমি তোমার সামনে যেতে পারল্ম না। পড়ার ঘরে চুপচাপ বসে রইল্ম। তারপর কখন মা এসে ঘরে আলো জেবলে দিয়ে গেছেন জানি না। টেবিলের দেরাজ খ্লে হাত খরচের টাকাগ্লো বের করছিলাম, আর সেই সময়ে বাইরে বারান্দায় তোমার কণ্ঠস্বর। তুমি মাকে জিজ্ঞেস করছিলে, কামাল ভাই কোথা খালাজী ?

মা বললেন—আজও অঙ্কে আটকেছে ব্ঝি ? যা না! ওই তো রয়েছে ঘরে।

তুমি এলে ঘরে। তাতে সত্যি একগ্চ্ছের খাতা। ওগ্লো তোমার এখানে আসবার ছাড়পত্র। *এসেই বললে—কে জিতেছে ?*

নিঃশব্দে টাকা এগিয়ে দিল্ম। তুমি নিলে না। বললে—ঠিক আছে। আপাতত তোমার কাছে জিম্মা রইল, পরে নেব।

হঠাৎ আমি কেমন বোকার মত তোমার হাত চেপে ধরে বলে বসল্ম—আমি জিতলে তুমি কী দিতে মনিরা ? কথাটা তখন ব্ঝতে পারিনি, তাই জানতে চাচ্ছি।

তুমি হাত ছাড়িয়ে নিলে।—তুমি হেরে গেলেও তা দিতে আমার কষ্ট হবে না।

—কী সেটা ?

—একটা ঘোড়ার আণ্ডা। বলে তুমি দার্ণ হাসতে শ্র্ করলে। আমার লজ্জা করছিল পাছে মা কী ভেবে বসেন।

মনিরা, সেদিন তুমি অমন জোরে না হাসলে আমি মায়ের জন্য সন্ত্রস্ত হত্ম না। এবং তার ফলে হঠাৎ আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে…

হ্যাঁ ওই রকম একটা হঠকারিতা আমায় নাড়া দিচ্ছিল চুপিচুপি। তোমার সঙ্গে বাজী জেতবার যে প্রবল আকাঙ্খা প্রত্যাশা দ্প্র থেকে বিকেল অব্দি চঞ্চল করেছিল, সেই ব্যর্থকাম আকাঙ্খা ও আহত প্রত্যাশা প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। ইচ্ছে করছিল তোমার মাস্ত্ল ঘিরে অহরহ যে মায়ার তাঁব্ ছাউনী পাতে, আগ্ন ধরিয়ে দিই তাতে। শ্ধ্ দগ্ধ মাস্ত্লটা নিয়ে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো।

পারল্ম না। তুমি কি জানতে পেরেছিলে ? তাই অত জোরে কথা বলেছিলে ? হাসছিলে ? তুমি হঠাৎ নীরব হয়ে গেলে বাইরের লোকের স্বভাবতঃ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক ছিল তখন। অনর্গল কথা বলা হঠাৎ বন্ধ হলে অন্ধ শ্রোতাও ম্খ তুলে তাকাতে চায়।

কিন্ত্ কী আর করা। আত্মরক্ষার দ্র্ভেদ্য বর্ম তোমার পরা—আমার আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল গর্জনের পর ক্লান্ত হয়ে পড়ল ক্রমশঃ। তুমি কি লক্ষ্য

করেছিলে ? বললে—হেরে এত মনমরা হয় মানুষ ? হেরে যাবার সুখও অনেক থাকে কিন্তু।

সুখ থাকে হেরে যাবার ? কেমন সে সুখ ? আমি মুখ তুলে তাকিয়েছিলুম। এবং আশ্চর্য মনিরা তোমার কথাটা আমার চোখের ওপর কী একটা রঙ আনল যেন। আমি দেখতে লাগলুম, আমাকে হারিয়ে দেওয়া মানুষটিকে। আমার কী যে ভালো লাগল। তোমার কাছে হেরে কী সুখ আছে, যেন জানতে পারলুম। মনে মনে সেদিন বলছিলুম—আমাকে এমনি করে সহস্রবার লক্ষ্যবার তুমি হারিয়ে দিও মনিরা।

তোমার কথাটা কানে গিয়েছিল মায়ের। এসে বললেন—কে কী হেরেছে রে মণি বেগম ?

মা তোমাকে আদর করে মণি বেগম বলতেন।

তুমি আমাদের বাবাজীর কথাটা বললে। শুনে মা হেসে খুন। ছেলে আমার ভেবেছিল বুঝি, কী না নবাবজাদা দেখবেন। যেন স্বয়ং মোগল শাহজাদা সেলিম জাহাঙ্গীর। তার বদলে কী না এক কোচোয়ান মার্কা গুঁফো চেহারা।

কথা বলতে লাগলে মাকে সামলানো কঠিন। তিনি পলকে পলকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, আকাশ থেকে পাতালে ছুটোছুটি করতে পারতেন। আব্বা বাইরে থেকে ফিরে এসে প্রথম প্রথম অবশ্য নীরবে মাথা নাড়তেন। শেষে মুখ ফুটে বলতেন—তোমার ঐ মেলট্রেন এবার থাকাও দিকি। ক্ষিদের জংশন এসে গেছে। পেটে বেড়াল ডাকছে।

সে দিন মামুজীর কথাই অবশ্য বেশীক্ষণ ধরে এল, মা বললেন—আমার ঐ ভাইজানটি যেমন, তেমনি তার ভাগ্নে। জানো মণি, ভাইজানের সব তাতে ঐ রকম। আমাকে ছেলেবেলায় কলকাতা নিয়ে গেল একবার। বললে সেখানে সব সোনার মানুষ রুপোর ঘর···

তুমি বললে—আপনি গিয়ে তাই দেখলেন বুঝি ?

মা বললেন—কে জানে কী দেখেছিলুম। কিন্তু ঐ যে কানে আগে থেকে অনবরত ঢুকিয়ে দিয়েছেন সোনার মানুষ রুপোর ঘর···আমার চোখের ধাঁধা যেন ঘোচেনি। ফিরে এসে অনেকদিন ধরে মনে হয়েছে, হয়তো ঠিকই সোনার মানুষ রুপোর ঘর দেখেছি কলকাতায়।

আমি বললুম—সাহেবদের দেখেছিলে। তাই সোনার মানুষ মনে হওয়া স্বাভাবিক।

তুমি বললে—সায়েব তো লাল।

মা বললেন—ঐ হলো আর কী। ধাঁধা ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপার। কামালেরও তাই হয়েছিল হয়তো। মোরাদাবাদ যাচ্ছে। ঐতিহাসিক জায়গা। গপ্পবাজ মামু, কালো নবাবকে ফর্সা দেখে বসে আছে।

তাহলে দেখছি, আমার ভিতরের সর্বক্ষণ বাজী ধরে হেরে যাওয়া পুরুষের ক্রুদ্ধ গর্জনকে নিমেষে শান্ত করে সুখের ঘরের চাবি এগিয়ে দেবার ক্ষমতা তোমার ছিল। মনিরা, হেরে যাওয়ার সুখ অনেক…এইটুকু ঘোষণার দিনে অনেক বার অনেক অঙ্গুলি নির্দেশ তুমি করেছিলে। আর এমনি করে জীবনকে—আমার জীবনকে দেখিয়ে দিচ্ছিলে যে জীবনে সব ক্ষয়ক্ষতি বেদনা বঞ্চণা আর সকল পরাজয় মেনে নেওয়া যায়। মেনে নিয়েই জীবনকে মনে হয় মহান এক প্রকাশ। একেই বুঝি মূল্যবোধ বলে মানুষ? এই মূল্যবোধই তো শিশুকাল হতে আমাদের মা খালা ফুফু বাবা-চাচারা মাথায় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

আমাদের পারিপার্শ্বিক জনমণ্ডলীই তো এই সকল মন্ত্রের উদ্গাতা। ধর্মও তো এই একই কথা বলে। তাই তস্করের হাতে সিঁদকাঠি কাঁপে, খুনীর চোখে অনুতাপের কান্না ফোটে, ব্যাভিচারিণী তীর্থে আত্মশুদ্ধির জন্যে ছুটে যায় এবং সেই কারণেই মানুষের জীবন স্পষ্টত ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য, আলো অন্ধকারে নিমেষে দু ভাগ করে নিতে জানে। শোকগ্রস্তা মাতা বুক বেঁধে চোখ মুছে ঘরের কাজে মন দেয়। তাহলে মনিরা, দেখা যাচ্ছে, তুমি আমার মা-মাসির কাজ করেছিলে। সমাজের ভূমিকা নিয়েছিলে। ধর্মের পবিত্র চেরাগ তোমার হাতে ছিল। প্রকাবান্তরে কি এ কথাই তুমি বলোনি আরও বড় সুখের কারণে অজস্র ছোট ছোট হারকে মেনে নিতে হয়?

কিন্তু তাহলেই আবার মুশকিল এসে যায়। তোমার নিজের মন্ত্র কী ছিল, মনিরা? হেরে যাবার অনেক সুখ—সে কথা তো অন্যের। তার মানে মা-মাসির, বাবা-চাচার, সমাজের-ধর্মের। তোমার নিজের কথা কী? যে-তুমি একান্তভাবে তোমার নিজের, যে-তুমি কামাল চৌধুরী, সাদিক বা অন্যান্যদের ধরা ছোঁয়া জানাশোনার বাইরে, সে তুমি কী বলেছিলে সেদিন? বুঝিবা সে-তুমি মুখ টিপে হেসেছিলে। কারণ, তোমার সেই নিজের "তুমিটি" চিরকালই বিজয়িনী থাকতে চায়। সে বুঝি এক চিরন্তন নারীসত্ত্বা। চাঁদ-সুলতানার মতো মাথা উঁচু করে মসনদে বসে থাকে, সে যেন মিশরীরাণী ক্লিওপেট্রা—যার পায়ের তলে হাজার সীজার হাত জোড় করে রাখে, কিংবা হিন্দুশাস্ত্রের রণ রঙ্গিনী করালবদনী লোলজিহ্বা ভীমা ভয়ঙ্করী মহাকালী, গলায় যার পুরুষোত্তম শিব শব হয়ে শুয়ে আছেন।

…ওই দেখো, আবেগবর্জিত লেখা লিখবো স্থির করে কলমটা হাতে নিয়েছিলুম। অথচ মনিরা, দেখা যাচ্ছে, আবেগ আমার পিছনে বাঘের মত অনুসরণ করছে আর সুযোগ পেলেই বাঘের মত থাবা হেনে রক্ত ঝরাচ্ছে। কেন আবেগ? হয়তো পুরুষ তার নারীকে আবেগশূন্য করে দেখতে পারে না। দেখতে চায় না। আর আবেগই সত্যকে ঢাকে। বিবেককে আচ্ছন্ন করে। তাই প্রারম্ভে আমি ছিলুম সতর্ক। কিন্তু আবেগ? আটত্রিশ বছরের কামাল চৌধুরী হার মেনে গেল। এখন আবেগই হয়তো তার বয় ধর্ম। কামাল চৌধুরীর ধারণা শৈশব থেকে পূর্ণ যৌবন

অবধি মানুষের সত্য দর্শনের ক্ষমতা থাকে। মনিরা, শিশুই একমাত্র প্রশ্ন করতে জানে। যুবক জানে, জবাব কেমন করে দিতে হয়। যৌবন পূর্ণ হলে তখন ক্ষয়ের আতঙ্ক মানুষকে এত অস্থির করে যে সে যুক্তি-বুদ্ধি সংশয় প্রকাশের ক্ষমতা হারিয়ে অজস্র অন্ধ বিশ্বাসের দাসত্ব নেয়। মনগড়া সিদ্ধান্তে আসে। এবং তারপর সেই মূর্খ কামাল চৌধুরীরা মুখ গোমড়া করে বলে—হুম, আমাদের অনেক দেখা হয়ে গেছে। অজস্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আছে আমাদের। সে কারণেই বাছারা আমার এ প্রবীণ চোখে ও সুপক্ক মস্তিষ্কে যা দেখছি বুঝছি, এই হচ্ছে সত্য।

ফুল ফোটার মধ্যে, বর্ষার মধ্যে, সমুদ্রের উত্তরঙ্গ ব্যাপ্তিতে অথাৎ যৌবনের ধর্মে—কোথাও আবেগের স্থান নেই। ওইগুলো তার ধ্রুবস্বভাব। গাছ-নদী সমুদ্র সকলই নিজের প্রতিশ্রুতিতে দায়বদ্ধ। স্থির তাদের সিদ্ধান্ত। ঝড় বয়। জন্ম হয়। মৃত্যু আসে। সবই স্থির সুনির্দিষ্ট। নির্বিকার নিজের সত্য। কোথাও কোথাও একতিল আবেগ নেই, মনিরা। যৌবন অব্দি এমনি করে সত্যের সন্ধান আমরা পাই। তারপর হারিয়ে ফেলি। কল্পনার হাত ধরে মৃত্যুর দিকে চলি।

আটত্রিশ বছর বয়সে কামাল চৌধুরী অবশ্য মৃত্যুর কথা ভাবছে না। তবু বয়োধর্মে সে এখন ভাবপ্রবণ। আবেগবান হতে বাধ্য।...উল্টো বলছি, না? মনিরা এতদিন যুগ যুগ ধরে যা শেখানো হয়েছে, তার বিপরীত আচরণ করছি? হয়ত তাই। কিন্তু একথা ঠিক, আমি আজ আবেগগ্রস্থ।

তুমি জেনো মনিরা, কামাল চৌধুরী যদি কোনো দিন ঈশ্বরের দরজায় যায় একমাত্র আবেগ বর্জিত সত্যের খাতিরে। অন্ধবিশ্বাসে, অহেতুক ভয়ে, বিবেক দংশনের জ্বালায় নয়। কারণ, তুমি তো জানো, কামাল চৌধুরী কোনোদিনই ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করেনি। সে আশৈশব ও যৌবনব্যাপি জেনে আছে যে, ঈশ্বর ধ্রুব, ঈশ্বর নিশ্চিত। তার কাছে মাথার উপর সূর্যের মত তাঁর অস্তিত্ব। সূর্যের থাকা নিয়ে কেউ কী তর্ক করে? কামাল চৌধুরী শুধু বলে, বেশ তো আছেন তিনি, তাতে কী হয়েছে? আমি এমন মূর্খ নই যে দিনরাত্তির চিৎকার করে বেড়াব, তিনি আছেন, তিনি আছেন এবং তিনি আছেন!!

সকল চিৎকারে শুধু তোমার থাকাটা প্রমাণ করতে হয়। প্রমাণ করতে হয় নিজের থাকাটা। কারণ এই থাকা জড়িয়ে আছে আরও পাঁচজনের সঙ্গে। তার মধ্যে সাদিকের ভূমিকাটা সর্বপ্রধান।

কথাটা শুনে কি বিচলিত হলে তুমি? খুবই স্বাভাবিক। সাদিক মানেই যেন অন্যকে বিচলিত করবার যন্ত্র। ও যেন হাওয়ার মত—ঝড়ের মতো। যেখানে বয়, সবকিছু দোলে। কাঁপে। চঞ্চল হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে স্পর্শ করা যায়। বোঝা যায় ওকে। আর তুমি? আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, হাতটা ভিজে থাকে, তারপর এক সময়ে শুকিয়ে যায়। তুমি জলও নও। জল হলে তো তোমার মধ্যে গিয়ে বসে থাকতুম। তুমি কী মনিরা? তুমি কি রোদ, নাকি

জ্যোৎস্না ? না অন্ধকার ? হাতের মুঠোয় রোদ ধরা যায় না। তোমার মধ্যে দাঁড়ালে গায়ে তাপ লাগে। আবার জ্যোৎস্নায় নিজের ছায়াটাও দেখতে পাই পায়ের কাছে। তোমার মধ্যে থাকলে পরক্ষণেই আবার রবীন্দ্রনাথের বামীর মতন চিৎকার করে উঠি, 'হারিয়ে গেছি আমি' বলে। এবং অন্ধকারেই তবু লুকিয়ে চুপিচুপি চোখের জল ফেলতে যায় নিঃসঙ্গ মানুষ।

সাদিকের কথা বলছিলুম। ঝড়ের মত সেই সাদিক খান, ছাত্রনেতা ওই ছ'ফুট উঁচু, সুগঠিত শরীর। সাদা ধবধবে ড্রীলের প্যাণ্ট, হাতা গুটানো সাদা শার্ট, মাথায় কখনও কখনও জিন্নটুপীও পরত। লিটনগঞ্জ এলাকায় ওকে না চেনে এমন মানুষ ছিল না। ১৯৪৫-এর ঝড়ের মাতন লাগা বাংলাদেশেও ও যেন ছিল একটি মারাত্মক ঘূর্ণী। আমি সেদিনও অবশ্য তার রাজনৈতিক মতামত পছন্দ করিনি, আজও আর করিনে—তবু বিস্ময় ছিল তাকে ঘিরে। আমার সারা জীবনের নিভৃত সঙ্গী সাদিক কলেজের কমন রুমে যখন মুষ্টিবন্ধ হাত তুলে বক্তৃতা করেছে, আমি সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে থেকেছি।

সাদিক আমাকে ঠাট্টা করত—তুই এত হিন্দু ঘেঁষা কেন রে ?

চটে গিয়ে বলতুম—আমি হিন্দু মুসলমান মানিনে। আমার কাছে সব মানুষই সমান। তাছাড়া, তোমার মত করিম শেখের কাছে বসে তার হালবলদের গল্প শোনার চেয়ে ওদের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাও অনেক ভালো।

সাদিক বলত—ওসব যতই কর কিস্যুতে কিস্যু হবে না। কামাল, যতই মানুষ মানুষ কর, সত্য যা তা সত্য।

—কী সত্য ?

—তেল আর পানি এক বললে কী এক হয়ে যায় ? তুই ওদের আপন ভেবে মিশিস, হয় তো ওদের হিন্দুত্ব ভুলে মানুষ হিসেবেই দেখিস, ওরা কিন্তু তোকে মুসলমান ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না।

হঠাৎ সাদিক সকৌতুকে আমার মুখের কাছে ঝুঁকে চাপা গলায় বলত—হিন্দু মেয়েরা খুব সুন্দরী হয়, তাই না ?

আমি গাল দিতুম—ইডিয়ট ? কোনো হিন্দু মেয়েকে ভালোবাসতে চাইনে আমি। তাদের পাবার জন্য মিশিনে।

সাদিক বলত—সেও একটা কথা! আপাতত তোর তো মনিরা আছে···

হেসে বলতুম—আমার, না তোর ?

—যাঃ। বলে সাদিক হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে যেত। তারপর বলত—হিন্দু মেয়েরা ভালোবাসতে জানে। আর মুসলমান মেয়েরা এ ব্যাপারে যেন কেমন এক্সিট্র-মিস্ট। চরমপন্থী। ঠুঃ মাচ্চ সেক্সি এ্যাণ্ড নাথিং।

এই কথাটা আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কমলদাও বলতেন। কামাল, আমার সঙ্গে মুসলমান মেয়ের সাদী দিয়ে দে না ভাই। তোদের ওই বোরখা এক রহস্যময় অন্ধকার যাদুঘর যেন। নেশা ধরিয়ে দেয়। কেমন যেন সেক্সি, তীব্রভাবে আকর্ষণ

করে। আমাদের মেয়েরা যেন একটু ভাল, একটু শান্ত···

শুনে দুর্ম্মুখ সাদিক বলে উঠেছিল—এক্ষুনি কমলদা। কাম অন। উহু ওয়েল কাম ইউ। কারণ, এসব ব্যাপারে আমাদের চূড়ান্ত লাভ।

—তার মানে?

—মানে, মুসলমান মেয়ে বৌ করে আপনি সমাজে নিতে পারবেন না। ফলে বাধ্য হয়ে আপনাকেই মুসলমান হতে হবে। তাছাড়া মুসলমান না হলে তো মুসলমান মেয়ে পাবার আশা নেই। পক্ষান্তরে এই অর্দ্ধ মুসলিম জীব কামাল চৌধুরী যদি কোনো হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে, হিন্দু সমাজ তাকে হিন্দুত্বে দীক্ষা দেবে না। ফলে কী হবে? মেয়েটিকে মুসলমান হতেই হবে। অতএব আমাদের লাভ দুদিকেই।

কমলদা গাল চুলকে বলেছিল—তা, হলেই বা ক্ষতি কী? মাইরি সাদিক, আমার শ্বশুর যদি গোঁড়া জিন্নাপন্থী হয় তাতেও আমার আপত্তি নেই। বিয়েটাতো আর শ্বশুরের সঙ্গে হচ্ছে না।

সাদিক হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলো—তেমন রূপবতী সেক্সী মেয়ে, কোথায় এখানে দেখলেন বলুন তো? এখানে স্কুল কলেজে যত মুসলিম গার্ল আসে তাদের তিনভাগ তো বোরখাপরা, বাকী এক ভাগ পর্দ্দাছুট। এদের মধ্যে তেমন তো কই দেখছি না?

কমলদা বলেছিলেন—স্কুল-কলেজের মেয়ে নয় রে হতভাগা। সেদিন ষ্টেশনে দেখলুম, ফজল খোনকার কোথায় যেন যাচ্ছে, সঙ্গে তার মেয়ে টেয়ে হবে—বাকসোর উপর বসে ছিল, মুখের পর্দাটা তোলা। যেন কালো মেঘের ফাঁকে হঠাৎ আস্ত চাঁদ, উপমা টুপমা আমার মাথায় আসে না আবার···

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম—ও, জাহানারা।

কমলদা বললেন—জা-হা-না-রা। বাঃ, কী সুইট নেম।

সাদিক বলল—সর্বনাশ। ওর নাম ফজল খোন্দকার। সদ্য যুদ্ধ ফেরত আদমী। সাবধান কমলদা, কানে গেলেই হয়েছে। একে তো দেশে হিন্দু-মুসলমান টেনশন খারাপের দিকে যাচ্ছে।···

কমলদা চুপসে গেলেন।

পরে কমলদা আমাকে চুপিচুপি বলেছিলেন—হ্যাঁ রে কামাল, সাদিক তো লীডার, এনিয়ে আবহাওয়া তাতাচ্ছে না তো? বলেছিলুম—ও একটা পাগলা। মুখে রাজাউজির মারে, কাজে অষ্টরম্ভা!

কিন্তু তবু সংশয় মনে রয়েই গেল। বিকেলে গঙ্গার ধারে যখন সাদিকের সঙ্গে দেখা হল বললুম—কমলদা তোর কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছেন।

সাদিক বলল—হিন্দুরা বড় সহজে ভয় পায়। মুসলমানদের তাই অনেক লাভ, বুঝলি বুদ্ধিমান? ওরা ভাবে, মুসলমান মানেই একখানা ছুরি, আর এক গুচ্ছের রক্ত,···খুব হাসতে লাগল সাদিক।

বললুম—আচ্ছা সাদিক, চারদিকের আবহাওয়া শুনছি দারুণ বিশ্রী। ধর, এখানে যদি তেমন কিছু হয়। তুই কি করবি ?

—দাঙ্গা ? সাদিক তাচ্ছিল্য করে বললো।—দাঙ্গা এখানে হবে না।

—তার গ্যারাণ্টী কী ?

—কেউ দিব্যি দেয় নি ? তবে আমার ওই রকম মনে হয়।

—ধর, সত্যি যদি হয়, তুই কী করবি ?

—দাঁড়িয়ে মার খাবো না নিশ্চয়।

—থামানোর চেষ্টা করবি না ?

—না।

না ! আমি বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলুম।—সাদিক, তুই কী বলছিস ?

সাদিক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। শান্ত স্বরে বলল—চাল দীর্ঘকাল বস্তায় ভরে রাখলে পচ ধরে, খাবার অযোগ্য হয়। তাই মাঝে মাঝে বাইরে রোদে দিতে হয়। আমাদের ভিতরের সব চালে পচ ধরেছে। এখন বাইরে রোদে আনা ছাড়া উপায় নেই।

—তার মানে কী হানাহানি ?

সাদিক একটু হেসে বলল—আমি অন্য রকম বুঝি। মানুষের সঙ্গে সমানে দাঙ্গাযুদ্ধ খুনোখুনি এসবের প্রয়োজন আছে কামাল। এতে আত্মপরিশুদ্ধি হয়।

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম—যুদ্ধ হানাহানি সবই সমাজের শ্রেণী বৈষম্যের ফলাফল।

সাদিক লাফিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। বা রে ময়নাপাখি, বুলি শিখেছ এত দিনে। ধন্য কমলদা, তাঁকে একবার সেলাম জানিয়ে আসব !

আমি এত ক্ষিপ্ত হয়েছিলুম যে চলে আসছিলুম তার কাছ থেকে। কিন্তু সে উঠে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। রেল লাইনের গেটের কাছে এসে মুখ খুলল একেবারে। বলল—কামাল, আজ সাতশো বছর ধরে আমরা হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে ঘৃণা করে আসছি। আজ যে ঘৃণার পাহাড় দুপক্ষের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে, তার বিস্ফোরণ ঘটতে দে। আমি ইতিহাসকে সব সময় মঙ্গলময় বলে বিশ্বাস করি। ইতিহাসের প্রয়োজনেই তা ঘটবে। ঘটলেই মঙ্গল। ফোঁড়াটা ফেটে যাক। অল্প ক্ষতি দিয়ে বেশী ক্ষতি রোধ করা যাবে।

আমি তাকে এড়ানোর জন্য রেল লাইন না পেরিয়ে লাইনের উপরই ডাউনের দিকে হাঁটতে থাকলুম। তবু সঙ্গ ছাড়ল না সাদিক। বলতে লাগল, তুই বলবি, ওরা নিজেরাই তো ছত্রিশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। নিজেরাই পরস্পরকে ঘৃণা করে। ছায়া মাড়ায় না…এ কথা সত্য কামাল। কিন্তু যখন মুখুজ্যে গিন্নী আমাকে দেখে বলেন ছেলেটাকে তো মুসলমান বলে মনে হয় না, তখনই আমার কানে গরম সীসে ঢুকে যায়। বলবি, কারণ আছে এর পিছনে। যত কারণই থাক, আমি বলতে

পারিনে কথাটা।

বললুম—এ তোর অকারণ জেদ সাদিক। আসলে এটা তোর একটা এমোশন। তুই যদি আরও বিশ বছর আগে বা পরে জন্মাতিস কিংবা ধর, দেশে হিন্দুমুসলমান সমস্যা থাকত না, তা হলেও তুই এমনি একটা সাংঘাতিক কাজ করার ফিকিরে ঘুরতিস। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই সে যুগের সেইসব ঘোড়সওয়ার বীর যোদ্ধাদের, কিম্বা সেই এ্যাডভাঞ্চারিষ্ট অভিযাত্রীর—তাদের ছাপ তোর মুখে। তুই যেন সেই যোদ্ধা, যে রণ জয়ের পরও তলওয়ার থামাতে চায় না···

আমি ভাবাপ্লুত হয়ে পড়েছিলুম কিছুটা। সাদিক আমার হাত ধরে বলল—বাঃ বেশ বলতে জানিস তো। আয় এখানেই বসি। একটা সিগ্রেট দে।

দুজনে মুখোমুখি রেলের উপর বসলুম। আমাদের পাদুটো পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকল। কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে সিগ্রেট টানবার পর সাদিক হঠাৎ বলল,—কামাল, মনিরার খবর কী রে?

হঠাৎ দুম করে এ প্রসঙ্গেও চলে আসবে আমি ভাবতে পারিনি। তাই বিস্মিত হয়ে বললুম—আমার কাছে মনিরার খবর জানতে চাচ্ছিস কেন? তুই তো দুবেলা ওদের ওখানে গিয়ে আড্ডা দিস।

সাদিক একটু চুপ করে থেকে বলল—তোর ভাগ্য দেখে হিংসে হয়। মনিরা তোর ঘরে গিয়ে আড্ডা দেয়, আর আমাকে যেতে হয় তার ঘরে আড্ডা দিতে। কিন্তু সে পথেও কাঁটা পড়ে গেল।

ওর বলার ভঙ্গী দেখে হেসে উঠলাম।—তোদের নেতারা যদি এসময় তোদের ক্ষুদে অনুচরটির মুখখানা দেখত সাদিক!

সাদিক দুতিনদিন না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, আমাকে বেশ উদাসী দেখাচ্ছে, কী বলিস!

—অবিকল ব্যর্থপ্রেমিক।

—তাহলে ঘটনাটা শোন। তোরও শুনে রাখা ভালো। ন্যাড়াদে বেলতলা-সচেতন থাকাই মঙ্গল।

—ভুমিকা রাখ, সাদিক!

—ইস্। মনিরার কথা শুনতে ভারী ভালো লাগে। না রে?

—থাক শুনে লাভ নেই।

—নাঃ, বলি শোন। সাদিক আমার পায়ের উপর তার একটা পা অলতোভাবে তুলে দিল। তারপর বলতে থাকল কাল সন্ধে বেলা বেশ কদিন পরে ওদের বাড়ি গেলুম। গিয়ে দেখি বারান্দায় থামের কাছে মনিরার ফুফু আর মা নমাজ পড়ছে। আমি পা টিপে টিপে উঠে গেলুম। তার মানে, ঘরে ঢুকে মনিরার সঙ্গে তার পড়াশুনা নিয়ে গল্প শুরু করলে তো আর কেউ এসে খান সাহেবের ছেলেকে বলতে পারছে না, বেরিয়ে যাও! ইচ্ছে ছিল, সন্ধ্যাটা সেই জানালার পাশে বসে মনিরার

মুখোমুখি কাটিয়ে দেব। সেই ছেলেবেলা থেকে ওই জানালার পাশে হেলান দিয়ে কত সকাল দুপুর সন্ধ্যা আমার কেটে গেছে। স্মৃতিটা বড্ড তাতাচ্ছিল তাই অমনি করে যাওয়া।

—তারপর ?

ওরে বাবা, যেই দুপা বাড়িয়েছি, যেন তক্কেতক্কে ছিল ওর ফুফু বুড়িটা। অমনি সালাম ফিরে * যেন খ্যাঁক করে উঠল, কেরে ওটা ? আমি একটু কেসে বললুম, খান সাহেবের ছেলে ফুফুজী, আমার নাম সাদিক। বুড়ি বলল কী জানিস ? ঘরে জোয়ান মেয়ে, তুমিই বা কেমন বে-আক্কেলের ছেলে বাবা, 'সাড়া নেউ—চুপচাপ যাচ্ছ ! আমি ঘামতে থাকলুম।

—মনিরার মা কিছু বললেন না ?

—না। মনিরাও বেরোল না ঘর থেকে। অথচ স্পষ্ট দেখছি আলোর সামনে বসে কী লিখছে।

—তারপর ?

—আমার রাগ হল খুব। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে আবার দেমাক দেখানো হচ্ছে। বললুম—আপনারা নমাজ পড়ছেন। সাড়া দিলে নমাজের ব্যাঘাত ঘটবে বলে চুপচাপ যাচ্ছিলুম। বুড়ি বলল, তাতে কী ? মুখে দোওয়া পড়ছি, কান তো জেগে রয়েছে। যেই হও, অমন করে আসা ভালো নয়, বাবা। তাছাড়া ও এখন বড় হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চলে এলুম।

—তার মানে তোর ওখানে যাওয়া বারণ।

—বুঝেছিস তাহলে।

বুঝেছিলুম। কিন্তু যা ভেবেছিল, তা নয়। আমি অন্য একটা বোঝা-বুঝির মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলুম। মনিরা, সেই প্রথম জীবনে প্রিয়তম সখার প্রতি বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলুম। তাহলে সাদিক আজীবন আমার প্রতি-দ্বন্দ্বী ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বী থেকেছে। এইটাই বুঝতে পেরেছিলুম। দুটি ছেলে একটি রঙিন বলকে ঘিরে হাসাহাসি করে পরস্পর জড়াজড়ি করে এগোনোর চেষ্টা করছে, একজন হঠাৎ পথের মাঝে আছাড় খেলে অন্যজন কি তখনই বুঝতে পারে না তারা যা করছিল, তা সত্যিকার লড়াই এবং সামনে বলটা তখন পড়ে আছে—হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে ? আমি ও সাদিক সারা জীবন ভেবেছি—এ আমাদের একটা খেলা একা মাত্র, দুজনে একটি মেয়েকেই ভাসবেসেছি—তাই নিয়ে পরস্পর আলোচনা করেছি। অথচ জানতুম না, এ কী বিপজ্জনক আগুন নিয়ে লোফালুফি করছি আমরা। শুনেছি মেয়েরা প্রেমের ব্যাপারে কম বয়সেই পাকে। জানতে ইচ্ছে করে, তুমি

* সালাম ফেরা—মনে নমাজ পড়ার সময় ডাইনে ও বাঁয়ে ঘুরে দুই দিকের দুই অদৃশ্য দেবদূতকে সেলাম জানানো।

আমাদের এ যৌথ ভালোবাসবার খেলাকে কী চোখে দেখেছিলে, মনিরা ? জানতে সাধ হয়, সেদিন তুমি আমাদের দুজনের মধ্যে কাকে প্রকৃত ভালবাসতে ?

অতি শৈশব থেকে তোমার সঙ্গে আমরা মিশেছি। পীরের মাজারের কাঠমল্লিকা ফুল কুড়িয়ে তোমার জন্যে পসার সাজিয়েছি। সাদিক সওদাগর সেজে বাণিজ্য করতে গেছে, শাহনশাহ সেজে আমি বলেছি—ওহে সওদাগর, আমার জন্যে একটা উড়ন্ত গালিচা এনো। তুমি শাহজাদীরূপিনী বলেছ—আমার চাই একটা আরসি—না, না, একটা হীরের ময়না।···সওদাগর, আমার জন্যে এনো সোনার কাঁখুই······ পরে ফিক করে হেসে বলেছো—থাকগে, একটা একটা···নাক খুঁটতে টুঁটতে বিব্রত হয়ে তাকিয়েছ চারপাশে। অতটুকু ফ্রকপরা মেয়ে। উদভ্রান্ত তোমার দৃষ্টি। কিন্তু মনঃপূত হয়নি তোমার ! অবশেষে ভ্রূকুঁচকে হাল ছেড়ে দিয়ে—থাক গে···

এমন করে খেলা জমে না। তবু আমরা খেলা করেছি সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা। তারপর আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠলুম। তবু খেলার শেষ নেই। তোমাকে সিগ্রেট টানতে বাধ্য করেছি। নস্যি নিতে শিখেছ। দুষ্টুমি করে দুজনকে দিয়ে পিঠে সুড়সুড়িও নিয়েছ—কচিৎ হাত বেতামজী করলে অমনি বিরক্তমুখে বলেছ—তোমাদের শুধু ওই···যাও।

তখন তোমার বয়স কত ? বারো কি তেরো। আমাদের এই আধাশহর আধা গ্রাম লিটনগঞ্জের বাজারে সেবার প্রথম ইলেকট্রিক আলো জ্বলল। প্ল্যাটফরম উঁচু করে ওভার ব্রীজ বানাল রেল কোম্পানী। গঙ্গার উপর ব্রীজের জন্যে লেখালেখি করতে থাকল মিশনারী সাহেবরা। পরের বছর কলেজ হল। তোমার আব্বা তখনও বেঁচে। বলেছিলেন—ভালোই হল। মনিরার একটা ভবিষ্যত গড়ে দেব মরার আগে। স্বাধীনচেতা সংস্কৃতিবান মকসুদ সাহেবই প্রথমই তার চতুর্দশী কন্যাকে বোরখাবিহীন বেশে কো-এডুকেশনের স্কুলে ভর্তি করে দেন। নৈলে মেয়েদের ওই জঘন্য মাইনর-স্কুলটায় তুমি হয়ত আমাদের আড়ালে কোথাও রোদ ছড়াতে ছড়াতে অস্ত যেতে। তোমাকে পরবর্তী জীবনে অমন করে কাছে পেতুম না আমরা।

আমাদের এই আশ্চর্য গ্রাম-নগরী লিটনগঞ্জের আবহাওয়ার বিদেশীর চোখে প্রথম যা পড়বে, তা হচ্ছে নির্জনতা। তারপর স্তব্ধতা। অথচ কুঠিবাড়ির সামনের খালটা পেরোলেই কারখানার চিমনী থেকে ধোঁওয়া ওঠা অস্পষ্ট যান্ত্রিক গর্জনও শোনা যায়। গঙ্গার কিনার ঘেঁষে তাঁতিপাড়ার মাকুর শব্দ, চরকার ঘর্ঘর, লাল নীল হলুদ সুতোর বহর পথের পাশে। ষ্টেশনের নীচে বাজার দোকানপাট, হল্লা কিছু থাকার কথা, তবু লিটনগঞ্জের আকাশটা এত বড় আর এত নীল, সবই শুকনো পাতার উপর হেঁটে যাওয়া শব্দের মত। এখানে জীবন ওই রূপকথার সুরে যেন বাঁধা। মাঝে মাঝে কুঠিবাড়ির ওদিকে স্কুল থেকে ফিরতে আমি আর সাদিক চুপিচুপি এই জীবনস্পন্দনের দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে থেকেছি। ছোটলাইনের রেলগাড়ী দেশলাই বাকসের মত ষ্টেশনে এসেছে, চলে গেছে ছোট ইঞ্জিনের ড্রাইভার লালমিয়া। আমাদের

দেখে ওর নেভিরু ন্যাকড়াটা নেড়েছে। বাঁকের মুখে হুইসল বেজেছে, আমাদের মনে হয়েছে এ এক স্বপ্নের রেলগাড়ি, চাকায় তার ঘুমপাড়ানি ছড়া, বাঁশীতে রূপকথার গান। আর তুমি মনিরা কোন কোন দিন মুখ তুলে রেলগাড়ির চলে যাওয়া দেখতে দেখতে বলেছ—কামাল, ওটা কদ্দূর যায় জানিস ?

আমি বলতুম—কলকাতা।

তুমি বলতে—আমার যেতে ইচ্ছে করে, নিয়ে যাবি ?

—দাঁড়া, বড় হতে দে। এখন পয়সা কোথায় পাবো ?

তুমি সাদিককে বলতে—এই, তুমি যাবে ?

—সাদিক বলত—হুঁ-উ। এখনি লালমিয়া ড্রাইভারের পাশে বসে চলে যাবো।

পরে নিভৃতে তোমাকে শাসিয়েছি—মনি, তুই সাদিককে তুমি বলিস, আমাকে তুই বলিস কেন রে ?

তুমি খিলখিল করে হেসেছ। —ওরে বাবা, ওকে কী জানি কেন, আমার ভয় লাগে খুব।

—আমাকে লাগে না বুঝি ?

নাঃ। এই তো তোকে ছুঁলাম। সাদিককে ছুঁতে ভয় লাগে।

বলতে বলতে তুমি ভীষণ ছোঁওয়া ছুঁলে আমাকে। প্রায় দু'হাতে জড়িয়ে ধরার মত। আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। এত নরম তোমার শরীর, এক মুঠো ফুলের স্পর্শ যেন। আর সেদিনই তোমার ফ্রক পরা শরীরের দিকে দৃষ্টি চলে গিয়েছিল আমার। তোমার উঁচু হতে থাকা বুক আমাকে কী একটা কথা ভাবাল। গম্ভীর স্বরে বলে উঠলুম—এবার তোর শাড়ি পরা উচিত, মনি।

তুমি চমকে উঠলে। কিন্তু লজ্জা পেলে বলে মনে হল না। বললে—আব্বা এবার ঘরে ফিরলে আমার জন্যে শাড়ি আনবেন বলেছেন।

সেই শরৎকালে লিটনগঞ্জে হিন্দু মেয়েরা নতুন পোষাক পরছিল। তখনই তাদের সঙ্গে তুমিও প্রথম সবুজ রঙের একটা শাড়ি পরে আমাদের বাড়ী এলে। তোমাকে এত বড় দেখাচ্ছিল। এত ভয়ঙ্কর আর সুন্দর, এত তীব্র, আর রসালো, সবুজ-পাতার মধ্যে রঙ ধরা আমার মত মসৃণ ও মনোরম। সেদিনই তুমি আমাকে কী জানি কেন তুমি সম্বোধনে সম্মানিত করলে। যেন কী গর্বে কী সুখে আমার ছেলে-মানুষ হৃদয় ফুলে উঠল। আমার ইচ্ছে করল তোমাকে আমার কিছু সম্মান দেওয়া উচিত। তাই বললুম, মনিরা এখন তুমি বড় হয়েছ আমাদের সঙ্গে একা-একা যেখানে সেখানে যেও না।

—কেন ? গেলে কী হবে ?

দুষ্টুমি করার ইচ্ছেয় গম্ভীরভাবে বললুম—যেওনা। শোনা-না-শোনা তোমার খুশী।

তুমি আমার এত কাছে ঘেঁসে দাঁড়ালে ! নতুন শাড়ির স্পর্শ আর কেমন একটা

গন্ধ আমাকে নাড়া দিচ্ছিল। তবু শান্ত থাকার চেষ্টা করে বললুম—এখন যাও। পড়ার ডিসটার্ব করো না।

—ইস, কী ভালোমানুষ। চিমটি কেটে চলে গেলে তুমি।

পরদিন আমি সাদিককে খেলার মাঠে খুঁজে না পেয়ে যখন কুঠিবাড়ীর ওদিকে যাচ্ছি—সাদিক আর তুমি আমবাগানের নীচে দিয়ে দৌড়চ্ছ। ছুটে গিয়ে সঙ্গ ধরলুম।—তোরা দৌড়চ্ছিস কেন রে সাদিক?

সাদিক ঠোঁটে আংগুল রেখে বলল—চুপ, বাঘ।

—বাঘ কোথায়?

—ওই জঙ্গলের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। তিনজনে রেললাইনে এসে দাঁড়িয়েছি তারপর। আর সেই সময় কারচুপিটা তুমি ফাঁস করে দিলে। বললে—আমরা কুঠিবাড়ীর বাগান থেকে গোলাপ তুলতে গিয়েছিলুম. মালীটা এমন তাড়া করলে···

আব্বা ছুটিতে বাড়ি ছিলেন। তাঁকে বলেছিলুম—এবার আসবার সময় একটা গোলাপের চারা আনতে হবে কিন্তু।

বাবার একমাত্র ছেলে। সচ্ছল সংসার। স্নেহময়ী মা। আমার গোপন সাধটি শীগগির [illegible] দেরী হয়নি। উঠোনের কোণে গাছটা পোঁতা হল। কাঁটা-তারের বেড়ায় ঘিরে দিলেন আব্বা। যাবার সময় বলে গেলেন, প্রথম ফুল ফুটলে আগে তোর দাদীর কবরে দিয়ে আসবি খোকা।

দিইনি। দিতে পারিনি। প্রথম ফুল ফুটল। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে বার-বার তার কাছে ছুটে আসছিলুম। কী অবিশ্বাস্য। কী আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্ন। স্তবকে স্তবকে উন্মোচিত এক সুন্দরের জগত। কেন্দ্রে কোথায় যেন বসে আছে এক মহান শাহানশাহ, সে কি আমি? আমি নিজেকে বারবার তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখলুম। মা বললেন, খোকা ফুলটা ঝরে যাবে মনে হচ্ছে। তোর দাদীর মাথার কাছে রেখে আয়।

ছিঁড়তে আমার কষ্ট হচ্ছিল। সেই প্রথম ফুল ছেঁড়ার ক্ষণ আমার জীবনে। কষ্ট আর আনন্দ পাশাপাশি সেই প্রথম। তবু ছিঁড়ে ফেললুম। হাতে করে নিয়ে গেলুম। হঠাৎ মনে হল এতদিন ধরে কুঁড়ি থেকে পূর্ণ প্রস্ফুটনের কাল অবধি তোমাকে ডেকে এনে দেখিয়েছি। তুমি চেয়েছ, ধমক দিয়েছি—আজ ছেঁড়ার দিনে তুমি তো দেখলে না। ব্যস। অমনি পকেটে সেটা রেখে সটান তোমাদের বাড়ি চলে গেলুম। গিয়ে দেখলুম জানালার পাশে সাদিক হেলান দিয়ে পা মেলে বসে আছে। তোমার ছোট ভাই রিজুর সঙ্গে আঙুল নেড়ে কী খেলা করছে। আর তুমি পাশের চেয়ারে বসে ওর মুখের দিকে কেমন তাকিয়ে আছ।

হঠাৎ মনে হল কোথাও একটা হার হয়ে যাচ্ছে আমার। একটা জগত থেকে পিছিয়ে যাচ্ছি। আমি তাই তোমাদের কাছে বসে বেলাটা কাটিয়ে দিলুম। সাদিক আমার মাফলারটা দেখে বললে—কত দাম রে?

বললুম—জানিনে। আব্বা পাঠিয়েছেন।

আর আমার গলা থেকে সেটা খুলতে গিয়ে সাদিক আমার পকেটে গোলাপটা দেখতে পেল। সে তার ক্ষিপ্র হাত ঢুকিয়ে দিল সেখানে। আমি বুক চেপে ধরলুম।—এই, এই ছিঁড়ে যাবে।

—হাত সরা। দেখি।

—না।

—ছিঁড়ে ফেলব বলছি।

—ঠিক আছে। হাত সরা, বের করছি।

সাদিক হাত সরাল। ফুলটা বের করলুম। বললুম—এর নাম কি জানিস? প্রিন্স এলবার্ট। আব্বা বলেছিলেন।

—কই দে, শুঁকে দেখি।

—উহু। এটা আমার দাদীর কবরে দিতে যাচ্ছি।

সাদিক কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় বাইরে খান সাহেবের হেঁড়ে গলা শোনা গেল। —সাদিক, সাদিক আছে এখানে?

খান সাহেব খড়ম পায়ে এগোচ্ছিলেন উঠোনে।

সাদিকের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। অস্ফুট কণ্ঠে জী বলেই সে বেরোল। আর খান সাহেব হঠাৎ এক পায়ের খড়ম খুলে ছুঁড়লেন ওর দিকে। খড়মটা চৌকাঠে গিয়ে লাগল। বাড়িশুদ্ধ লোক চুপচাপ ব্যাপারটা দেখছে। পরক্ষণেই সাদিক দৌড়ে বেরিয়ে গেল। খান সাহেব খড়মটা কুড়িয়ে নিয়ে গজরাতে গজরাতে ছুটলেন তার পিছনে—হারামজাদা, দিনরাত্তির যেখানে-সেখানে আড্ডা। সামনে পরীক্ষা, সে হুঁস নেই।

পরে আমি যত হাসছিলুম, তত তুমি। ওই হাসি যেন তোমার আমার মধ্যেকার অদ্ভুত ক্ষীণ ব্যবধানটা ভরে দিল কিছুক্ষণের মধ্যে। ফের যেন পরস্পর যোগসূত্র খুঁজে পেলুম। আর তখনই চুপি চুপি গোলাপটা তোমার হাতে গুঁজে দিয়ে বোকার মত পালিয়ে এলুম। আমার ভারি লজ্জা করছিল তোমার মুখের দিকে তাকাতে।

সেদিন বিকেলে স্পষ্ট অক্ষরে সাদা কাগজে লিখলুম—মনিরা, তোমাকে আমি ভালবাসি। ইতি—তোমারই কামাল। সেটা একটা গল্পের বই-এর মধ্যে রেখে দিয়ে এলুম তোমাকে। বলে এলুম—এর ভিতর একটা মজার জিনিস আছে, দেখো। কিন্তু সাবধান…

তোমাকে লেখা আমার প্রথম চিঠি সেই। আজও জানিনা, সাদিক তোমাকে আমার আগে চিঠি লিখেছিল কি না। সাদিক বলে নি। চিঠি পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমার ঘরে হাজির। লজ্জায় আমি কাঠ হয়ে গেলুম। তুমি এসেই বললে—ওসব কী লিখেছ ছাইপাঁশ? কেন লিখেছ?

মুখ ফিরিয়ে বললুম—আমার খুশী।

—আমি যদি মাকে বলে দিই ?

ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। মুখে বললুম—দিলেই বা কী। দাও গে না। আমি ওসব ভয় করিনে।

—তাই বলে গায়ের জোরে যা তা লিখবে ?

কী আশ্চর্য, তুমি কাঁদছিলে। গতিক দেখে বললুম—মনি, চুপ করো লক্ষ্মীটি, আর আমি চিঠি লিখব না। কথা দিচ্ছি।

তুমি দ্রুত চলে গেলে। তারপর কতদিন, কতদিন আর সীমানায় তুমি আসতে না। আমি সঙ্কোচের বিহ্বলতায় তোমাদের বাড়ি যেতে পারতুম না। পথে দেখা হলে আমার বিষণ্ণ দৃষ্টির সামনে তুমি নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে গেছ। আর সাদিক ? সে অবাক হয়ে বলেছিল মনিরার কী হয়েছে রে ? আর সিগ্রেট খেতেও কাছে আসেনা। ডাকলে সরে যায়। ওদের বাড়ি গেলে, কথা বলে না, তাই আমিও যাওয়া ছেড়েছি।

হুস করে বললুম—তুই চিঠি লিখিসনি তো ওকে ?

—চিঠি ? কিসের চিঠি ?

—প্রেমের চিঠি ?

—গাড়োল কোথাকার। সাদিক আমার মাথায় চাঁটি মারল। প্রেমের জন্যে মনিরাকে চিঠি লিখতে হবে ? ধুস ! পরক্ষণেই সে সকৌতুকে ফের বলেছিল—তাহলে তুই বুঝি লিখেছিস ?।

মুহূর্তের চপলতায় তাকে সব কথা খুলে বললুম। শুনে সাদিক কিন্তু হাসল না। কেমন গম্ভীর হয়ে গেল যেন। বলল—কামাল, এমন ভুল আর করিস না কখনো।

—ভুল কিসের ?

—একটা ভালো মেয়েকে গোল্লায় দেওয়া ঠিক না।

—কী মহাপুরুষ ! এতদিন একা একা বনবাদাড়ে নিয়ে ঘুরেছ, তোমার মুখে ওকথা সাজে না।

সাদিক ঘুরে তীব্রস্বরে বলল—আমি তোর মত বেলেল্লা নই।

ঝগড়ায় সুর এসেছিল কিন্তু সামলে নিলুম আমি। বললুম, ঠিক আছে, বেলেল্লার সঙ্গে আর মিশিস না, তাহলেই চলবে।

আমি চলে এসেছিলুম ক্লাসে। স্কুলের বাইরে বন করবী ফুলের বিস্তীর্ণ জঙ্গল। তার মধ্যে একটা সেকেলে মন্দির। ওই মন্দিরের দেয়ালটায় ফাটাফুটো ছিল বিস্তর। সেখানে আমরা সিগ্রেট লুকিয়ে রেখে আসতুম। সাদিক মন্দিরের চত্বরে বসে সিগ্রেট টানছিল তখন। ক্লাসে তবু মন বসছিল না আমার ! জানালা দিয়ে উঁচু ঢিবির উপর দূরে মাইনর গার্লস স্কুলটা দেখছিলুম। যেন তোমাকেই খুঁজছিলুম।

কখন ছুটির ঘণ্টা বাজল। দেখি সাদিক তখনও বাইরে। তার বইগুলো নিয়ে

আমি বের হলুম। মন্দিরের কাছে এসে দেখি সামনের ফাঁকা জমিতে রোদে শুয়ে আছে সাদিক। চিত হয়ে সিগ্রেট টানছে।

গিয়ে বললুম—ব্যাপার কী রে? তোর বই কে আনবে?

—এনেছিস? আয়, আর একটু বোস।

—না ঃ খিদে পেয়েছে, বসব না।

সাদিক উঠে দাঁড়াল। বইগুলো নিল আমার হাত থেকে। চলতে থাকল পাশাপাশি। বাঁক ফিরেই রেললাইনের ফটক। ফটক পেরিয়ে দুলেপাড়া। তারপর মুসলমানপাড়া। দুই পাড়ার মধ্যিখানে এক বিরাট বটগাছ। দিনের রোদেও তার নীচেটা অন্ধকার মনে হয়। অজস্র ঝুরি চারপাশে। খোয়া আর পাথরকুচিভরা পথ ঝুরি কেটে চলে গেছে। সেখানে এসে সাদিক বলল, একটু দাঁড়া এখানে। মনিরার সঙ্গে দেখা হতে পারে। ওদের স্কুলেও ছুটি হয়েছে।

একটু আগে তোমাকে নিয়ে সাদিকের সঙ্গে আমার কিছু মন কষাকষি দেখা দিয়েছিল, তাই তার প্রস্তাবটা আমার খারাপ লাগল। বললুম—আমি যাই সাদিক, আমার খিদে পেয়েছে।

সাদিক চোখ নাচাল।—সে কী রে? তুই না ওকে ভালবাসার চিঠি লিখেছিলি?

—ওটা একটা তামাসা। তাছাড়া একটা ভালো মেয়েকে আর গোল্লায় নাই বা পাঠালুম।

সাদিক আমার হাত ধরল। চৌধুরী বাচ্চার রাগ এখনও পড়েনি দেখছি। এখন মাথা ঠাণ্ডা কর দিকি। আমি তোদের ব্যাপারটা মিটমাট করে দিতে চাচ্ছি, বুঝলি উল্লুক?

—নো কমপ্রোমাইজ। চোখ মুখ লাল করে বললুম।—ও মেয়ে বড্ড সাংঘাতিক। আমি জীবনে ওর সঙ্গে কথা বলব না দেখে নিবি।

শীতের শেষবেলায় বটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সাদিক ফেরীওয়ালার ভঙ্গীতে মুখে হাতের চোঙ বানিয়ে ডাকছিল, আইসক্রীম! আইসক্রীম চাই!

আমাদের ঠিক পিছনে একটা মস্ত ঝুরি। তার কাছে পীরপুকুর—পীরপুকুরের পূর্বপাড়ে পীরের মাজার। সাদিক চিৎকার করার পরই পিছন থেকে হেঁড়ে গলায় কে বলে উঠল—কে হ্যা ছোকরা, বেজায় রসিক দেখি। শীতের সাঁঝে আইসক্রীম? এঁ্যা!

চমকে উঠে দেখি, মামুজী। নাদুসনুদুস গতরখানি, পরনে খয়েরী গরম পাঞ্জাবী, কাঁধে বিশৃঙ্খল শাল, চেককাটা লুঙ্গি আর হাতের ছড়ি। বড় বড় গোঁফের নীচে হাসি চকমক করছে। মামুজির হাসির রকমটা খুব অদ্ভুত। নিঃশব্দে অমন প্রচণ্ড হাসি তিনি ছাড়া আর কারুর দেখিনি। ভুঁড়ি ধকধক করে কাঁপছে তাঁর। আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন—আরে, তুইও যে রয়েছিস দেখি।

মুহূর্তে মনের মোড় ঘুরে গেল। আনন্দে হই হই করে বললুম—মামুজী!

—দেখতেই তো পাচ্ছিস।

—কখন এলেন?

—দুপুরে। এসেই তোর খোঁজ করলুম। শুনলুম স্কুলে আছিস। তারপরে এ বেলায় একবার পীরসায়েরের কবর জেয়ারত করতে বেরিয়েছিলুম।

সাদিক লুকিয়ে হাসছিল এতক্ষণ। এবার আদাব দিয়ে বলল—মামুজী কেমন আছেন? চিনতে পারেন?

মামুজী ভুরু কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে বললেন—খান সাহেবের সেই গুণ্ডাটা না? আইসক্রীম শুনেই বুঝেছি।

সাদিক বলল—আপনার ভাগ্নে বাবাজীবনের জন্য আইসক্রীম হাঁকছিলুম।

মামুজী অভ্যাসবশে কাঁচা পাকা চুলের মধ্যে বারকয় ক্ষিপ্র আঙুল ঘষে নিয়ে বললেন—তাই নাকি? ওর আবার কী ব্যারাম ধরল? এ্যাঁ? হ্যাঁ রে কামাল, ব্যাপার কী?

সাদিককে তীব্র কটাক্ষ হেনে বললুম—ও কিছু না মামুজী। চলুন, বাড়ীর দিকে যাবেন তো?

—বাড়িন দিকে না, এই এলুম তোর মায়ের হাতে ছিটেপিঠে খেয়ে। চল, একবার নদীর ওদিকে ঘুরে আসি।

মামুজী আমার হাত ধরে চলতে থাকলেন। সাদিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মামুজী তাকে ডাকলেন না দেখে আমিও ডাকা সংগত বোধ করলুম না। কিন্তু মনটা খচখচ করতে থাকল। সাদিক কী ভাববে বলে নয়, এখনই এ পথে যদি মনিরা আসে, তাহলে সাদিক তাকে ডাকবে এবং কথা বলবে—হয়ত তার কথাটা আমার চিঠি নিয়েই সুরু হবে, এই অস্বস্তি। কিন্তু মামুজী ছাগলবাচ্চার মত আমাকে আদর করে নিয়ে যাচ্ছেন, অন্য সময় হলে এই ভ্রমণ কত না সুখের হত! বস্তুত মামুজী আমার কাছে যেন স্বপ্নের মানুষ ছিলেন। [illegible] গল্প জান[illegible]ন। হাসতেন, উৎকণ্ঠায় অধীর করে দিতেন। আবার প্রশ্রয়ও কম দিতেন না। মা বলতেন, ভাইজান যদি মাসখানেক এখানে থাকেন, কামালের বারোটা বেজে যাবে। অত লাই ছেলেদের দিতে আছে? মামুজী দাড়িহীন গালে হাত বুলিয়ে বলতেন—ওরে কামাল, আমার কাছে আর আসিস না। তোর মা কী বলছে শোন। রেগে বলতুম—বেশী বললে আপনার সঙ্গে চলে যাবো, দেখবে'খন। মা হাসতেন—ছেলেটাকে একেবারে যাদু করে ফেলেছেন ভাইজান…

সাত-আটটি ছেলেমেয়ের পিতা মামুজীর সংসারটা ছিল এত বড়, এত বিশৃঙ্খল, মাঝে মাঝে আত্মভোলা মানুষটি যেন হাঁফ ছাড়বার জন্যে বেড়িয়ে পড়তেন এমনি করে। ছেলেদের আবার বৌ রয়েছে, ছেলেমেয়ে র[illegible]ছে। মরে গেলুম, মরে গেলুম, বলতে বলতে মামুজি আমাদের বাড়ি ঢুকতেন এসে—ও মরিয়ম, গোস্ত খেয়ে খেয়ে দাঁতের দফা রফা হয়েছে, তোদের গঙ্গার ইলিশ খেতে এলুম! মা আসলে ছিলেন

ভাই-অন্ত প্রাণ। সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে টাটকা ইলিশ আনিয়ে ধুমধাম সুরু হত। সামনে বসে ভাইকে খাওয়াতেন আর ভাইটি গল্প করতেন। এ ইলিশ অবশ্যি মন্দ নয়। তবে একবার পদ্মার ওদিকে এক জায়গায় সাদির পয়গাম নিয়ে গিয়েছিলুম। বললে তাজ্জব লাগবে, ইলিশের টুকরো দিলে পেয়ালা সাজিয়ে। যেন আস্ত রসগোল্লা ···থালা চেটে সাফ করে খাওয়া অভ্যাস মামুজীর এবং শেষে আঙুল চুষতেন আর বলতেন—এক-একটার ওজন কত জানো? একমণ থেকে দেড়মণ।

শুনে মা মুখে কাপড়চাপা দিতেন। কিন্তু আব্বা উপস্থিত থাকলে শালা-ভগ্নিপতিতে মহা তর্ক বেধে যেত। মামুজী রেগে মেগে বলতেন, কামাল, আমার ছড়ি দে। বেরোব। আব্বা হাসতে হাসতে ছুটে এসে হাত ধরেছেন তখন,—আপনার সংগে ঠাট্টাতামাসার সম্পর্ক। ওতে রাগতে আছে?

মামুজী গোঁফে তা দিয়ে বলেছেন—তুমি সবতাতেই তর্ক করো, চৌধুরী সাহেব। কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। দুনিয়াটা এত বড় একটা আজব জায়গা, কতটুকু মানুষ জানে তার?

···সোনার মানুষ রুপোর ঘর দেড়মণ ইলিশের একটা আশ্চর্য জগত যেন মামুজী বহন করে নিয়ে বেড়াতেন, সেই অপরূপ আকর্ষণে আমার কৈশোর মনেও রোমাঞ্চ জাগত চুপিচুপি। মামুজীর কাছ ঘেঁসে বসে মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম। আমাকে কবে নিয়ে যাওয়া হবে সে দেশে? সে রকম একটা প্রতীক্ষা নিঃশব্দে স্রোতের মত বয়ে যেত ভিতরে।

এবং সেকারণেই মামুজীর সংগে বেড়াতে যেতে সেদিন আনন্দ কম হচ্ছিল না। অথচ সাদিক বটতলায় একা মনিরার প্রতীক্ষা করছে···

আমার পিছু তাকানো একটু পরেই টের পেয়ে গেলেন মামুজী। বললেন—কী দেখছিস রে?

—কিছু না মামুজী।

—খিদে পায়নি তো? চল বরং বাজারের ওদিকে ঘুরে যাই। কিছু সিঙাড়া-সন্দেশ পেটপুরে খেয়ে নিবি।

নাঃ।

শেষ অব্দি যেতেই হল বাজারে। ষ্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছি, দেখলুম মনিরাকে। হ্যাঁ, তোমাকেই। একটা ষ্টেশনারী দোকানে সবে হ্যাজাগ জ্বেলেছে। তুমি কী কেনবার জন্যে একা দাঁড়িয়ে আছ। সেই ভরা শীতের সন্ধ্যায় তুমি অতখানি পথ একলা যাবে! মধ্যে সেই নির্জন ছায়াথমকানো বটতলা, সাদিক তোমার প্রতীক্ষায়···মুহূর্তে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলুম। ইচ্ছে করছিল তোমাকে সাদিকের কথাটা বলে দিই, কিন্তু মামুজীর হাতে কয়েদী! অক্ষম ও অসহায় আমার ছট-ফটানি বেড়ে যাচ্ছিল। শেষে মরিয়ার মত বলে উঠলুম—মামুজী আমি একটা পেন্সিল কিনবো।

মামুজী দাঁড়ালেন। —চল তাহলে আগে পেন্সিলই কেনা যাক।

আমাকে দেখে তুমি মুখ ফেরালে। তারপরই দ্রুত নেমে গেলে দোকান থেকে। মামুজী বললেন—মেয়েটা কে রে? চেনা চেনা মনে হল।

বললুম—মনিরা।

—মনিরা, মকসুদের মেয়েটা? সর্বনাশ! কত বড় হয়ে গেছে রে! বলে পিছনে ফিরে স্টেশনের দিকে হনহনিয়ে চলা তোমাকে একবার দেখে নিলেন। আবছায়ার মধ্যে তুমি হারিয়ে যাচ্ছিলে, মামুজী ফের ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন—বড় বে-আদব মেয়ে তো। দেখতে পেয়ে কথা বলল না? আদাব তো দূরের কথা।

বললুম, চিনতে পারেনি হয়ত।

—তুই তো সঙ্গে আছিস। চিনতে পারেনি মানে? আর তোকেও দেখছি কথা বলল না?

আমি চুপ করে থাকলাম।

—হ্যাঁরে ব্যাপার কি? ওদের সঙ্গে তোদের বাড়িতে কাজিয়া-ফ্যাসাদ হয়নি তো?

তারপর চাঁদ উঠেছে দিগন্তে। এমনি ডিসেম্বরের শীতাহত আকাশে জ্যোৎস্না চোঁয়াচ্ছে বিষণ্ণতার মতো। শীত করছিল। তাই গঙ্গার পাড় অব্দি গিয়েই ফিরে এলুম আমরা। রেললাইন ধরে আসতে থাকলুম। মামুজী অনর্গল কী সব বলছিলেন, কানে যাচ্ছিল না। অন্ধকার বটতলায় জ্যোৎস্নার আড়ালে সাদিক দাঁড়িয়ে মনিরার সঙ্গে দেখা করবে সে, মনিরাও একা চলে গেছে। কিছু কি ঘটে গেছে?

কখন সেই বটতলায় চলে এসেছি ফের। অন্ধকার ছায়ার গালিচায় যেন স্তবকে সোনালী ফুলের গুচ্ছ, ভাঙচুর জ্যোৎস্না ছড়ানো জলের ফোঁটার মত, আর সেই জ্যোৎস্নাচূর্ণ বটের শরীর ঘিরেছে। কুয়াশার ছেঁড়া চাদর ও টুপি পরা ভিখিরীর মত বটগাছটা যেন পথের পাশে হেসে হাত তুলে ভিক্ষা চাইল।

তীক্ষ্ন দৃষ্টে ঝুরিসঙ্কুল বটতলাটার দিকে তাকালুম। এখনও কি ওরা আছে? কোন ফিস ফিস? কোন ভালবাসার চুপিচুপি কথা? না, না, আমি সাদিককে হিংসে করছিলুম না। আমারই তো যত দোষ—সাদিক আমাদের মধ্যে মিটমাট করে দেবে বলেছিল, হয়তো তাই চলছে এখনও গোপন আড়ালে। এছাড়া আর কিছু অসম্ভব, অত্যন্ত অসম্ভব। ভালোবাসার কথা? মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে। সাদিক তো বলে—মনিরাকে আবার ভালোবাসার কথা জানাবো কী? ওই সাদিক তো একদিন বলেছিল—মনিরার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একেবারে ডাল ভাত। ওই গাছটা থাকার মত, চাঁদ সূর্যের উদয়াস্তের মত, দুনিয়ার দুনিয়াদারীর মত স্বাভাবিক। যেমন আমিও মাকে একদিন বলেছিলাম—আমি লোক দেখানো ভক্তিতে নেই বাপু, খোদা আছেন—তাঁকে ভক্তি করি মনে মনে, ব্যস। মা তো তৌবা তৌবা করে মারতে

এসেছিলেন।

হঠাৎ বটতলা থেকে পিছনে শব্দ হল—ম্যাও! লাফিয়ে উঠলাম। মামুজীও চমকে উঠেছিলেন। পরক্ষণে বললেন—খানসাহেবের সেই হারামীটা মনে হচ্ছে। কী করছে ওখানে?

হ্যাঁ, সাদিকই বটে! আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সে এসে বলল—আজ কতজনকে যে ডর দেখিয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। পাড়ায় গিয়ে শুনবি, বটতলার জিনটা আজ বেরিয়েছে। মামুজী হাসতে হাসতে থাপ্পড় তুললেন—হারামজাদা কাঁহাকা!

ঐখানে কী করছিলি এতক্ষণ?

সাদিক বলল—বললুম তো।

—আমাদের সঙ্গে গেলেই পারতিস।

—সঙ্গে নিলেন না তো! গুণধর ভাগ্নেকে নিয়েই হাঁটতে লাগলেন।

—ঘাট হয়েছে বাবা। এবার আয়। কামালের ঘরে বসে আজ একটা জব্বর গল্প শোনাব।

তার আগেই খান সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল দূরে। এবার আরও কাছে এল। —সাদিক, ওরে বাঁদীর বাচ্চা হারামজাদা!

সাদিক দৌড়ে দুলেপাড়ার দিকে পালাল।

সেই সন্ধ্যায় বটতলায় সাদিক আর তুমি কী করেছিলে, আজও জানি না মনিরা। তবে সাদিক আমাকে পরে বলেছিল—তোমাকেও নাকি দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তুমি চিৎকার করে উঠেছিলে। তখন সাদিক সাড়া দিয়ে বলে—আমি, আমি। তুমি নাকি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলে। সত্যি কি তাই? মনিরা, তোমাকেও এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি কিন্তু বলেছিলে—কই, পথে কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি তো!

তীব্র দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম—বুঝিবা সাদিক আমার আগেই তোমার কাছে কোন চরম পাওনা পেয়ে গেল। যদি বলো, কী সে পাওনা কামাল? সে কী দেহ?…হয়তো তাই, হয়তো তাও নয়। কৈশোরের শেষ ভাগে তখন মেয়েদের দেহ বাদ দিয়েই স্বপ্ন ছিল মনে। দেহ? ও যেন একটা তীব্র কিছু, ভয়ঙ্কর কিছু—কোন সাংঘাতিক আগুন, ছুঁলে মরে যাবো সেই আতঙ্ক। কখনও মনে হয়েছে, তোমার ওই দেহ এক আজব সাঁড়াশির মত আমাকে ধরতে আসছে। ত্রাস, ত্রাস, ত্রাস। আমার ভালোবাসার আলোকিত জগত ধূসর করে দেওয়া সেই ত্রাস।…তার চেয়ে দেহ দূরে থাক, শুধু তুমি। তুমি। কী বিচিত্র দুটি অক্ষর সমষ্টি। আমার সবখানে যেন নরম শীষওয়ালা পেনসিলে লেখা হচ্ছে 'তুমি' 'তুমি' 'তুমি'। মনিরা নয়, শুধু তুমি। মনিরা, তুমি কি সেদিন জানতে পারছিলে, আমার সকল গান তোমাকে লক্ষ্য করে? 'নির্জনে ঝরিয়া যাবো পথের ধূলায়' তুমি

আমার বুকের উপর দিয়ে হাঁটিবে কি ? এই বিনীত বিষণ্ণ নির্জন ইচ্ছাটিকে বেড়ালের বাচ্চার মত বুকে রেখে সেই শীতে পরস্পর উষ্ণ থেকেছি। খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে জানালা খুলে সকালের রোদ মাখা পুকুরের জলের কাঁপন দেখে ওপারের ঘাটের দিকে তাকিয়েছি। তুমি কি তোমাদের খিড়কি দরজার ঘাটে বসে মুখ ধুচ্ছো! ধুতে ধুতে তাকিয়েছ আমার জানালার দিকে, ঠিক আমারই মত ব্যাকুলতায় ?···দেখতে পেতুম না কোনদিনও। আর সেই বিষাদভরা ডিসেম্বরে আমার বার্ষিক পরীক্ষা। প্লেটে রাখা ডিম সিদ্ধ বেড়ালে খেয়ে যেতো। দুধের গ্লাস উল্টে পড়ে যেত দুপুর রাতে। মা ছুটে আসতেন পাশের ঘর থেকে। কামাল, কামাল। বেড়াল বুঝি কী ফেলে দিলে।

মামুজী যে কয়েকদিন ছিলেন, মা দহলিজে তাঁর শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বলেছিলেন, ওর পরীক্ষার সময় কোন গল্প শোনাবেন, সেটি হবে না ভাইজান। রাত্তিরটা আপনাকে কয়েদী করে রাখব।

মামুজী দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গাল চুলকে উঠে যেতেন। তবু রাগ করে পালাতেন না, সকালবেলা হাসিমুখে চায়ের কাপ হাতে উঠোনে দাঁড়িয়েই চা খেতেন। তারপর উঁচু বারান্দাওলা আমার ঘরের দিকে উঁকি মেরে বলতেন—ঠিক নটায় আমি আসছি কামাল। ত[illegible]টা পাবো গিলে নাও।

পরীক্ষার দিন বেরিয়ে যাবার সময় শুনলুম, মামুজী রান্নাশালে বসে মাকে বলছেন, এক্ষুনি বিয়েটা অবশ্যি দিতে বলছি না, মরিয়ম। কথা হচ্ছে, এখনই একটা কথা পেড়ে রাখা ভালো। তুমি বললেই, আমি ওবাড়ি একবার ঘুরে আসি চট করে।

থমকে দাঁড়ালুম। কান পাতলুম।

মা বললেন—পাগল হয়েছেন ? এখনই ওসব কথা কী ? চৌধুরী সাহেব শুনলে খাপপা হয়ে যাবেন। এতটুকু দুধের ছেলে···

—বুঝলে মরিয়ম ? ছেলেপুলের বিয়ে সকাল সকাল দেওয়াই ভালো। গোল্লায় যাবার পথে কাঁটা পড়ে।

মা হেসে ফেললেন নিজের ছেলেদের তো কচি বয়সে সব বিয়ে দিয়ে বসে আছেন। তারপর যা হয়েছে চোখের ওপর দেখেও একথা বলছেন ?

—তা একটু ঝামেলাঝঞ্ঝাট হয়েছে বৈকি। দিনরাত চিল শকুন উড়ছে বাড়িতে। কিন্তু তোমার তো একটি মাত্র ছেলে।

—তা হোক। ওকে এম, এ, অব্দি পড়ানোর ইচ্ছে আছে ওনার। তারপর ছেলে যদি চায় বিয়ে করবে। নিজে পছন্দ করেই করবে এ যুগের ছেলে সব।

মামুজী হতাশ কণ্ঠে বললেন—তাহলে আমি আমার ভাগ্নের বিয়ে দেখতে পাবো না ? ততদিনে গোরোর তলে শুয়ে ঘুমোব।

—বালাই। ওসব কি কথা ভাইজান।

আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল। কিন্তু এত হাসি পেল যে দৌড়ে চলে গেলুম বাইরে। সাদীর ব্যাপারে বা এই ধরনের সামাজিক হইচইতে মামুজীর কী নেশার ব্যাপার আছে। তাঁর এ স্বভাব আমি ছেলেবেলা থেকেই দেখছি। কিন্তু কনেটি কে? ...আমার বুক কাঁপতে থাকল তখন। যদি মনিরা হয়? যদি মনিরার কথাই মামুজী ভেবে থাকেন।

আমার মনে পড়ে গেল, একদিন মনিরাকে দেখে মামুজীই তো বলছিলেন—মেয়েটিকে তোমার বৌ-বিবি করে নিও মরিয়ম, খুব ভালো হবে।

সেদিন কথাটার অর্থ বুঝিনি। সেই কথাটা আজ এতদিন পরে তার পরিপূর্ণ অর্থ নিয়ে আমার চোখে ভাসল। মনিরা, তুমি জানোনা, সেদিন স্কুলের পথে পীরের মাজারের উদ্দেশ্যে চোখ বুজে (পাছে কেউ দেখে ফেলে) চট করে মনে মনে বলেছিলুম, মামুজীর মুখে শোনা মেয়েটি যেন মনিরা হয়, ও মনিরাই হোক বাবা সায়েব।

প্রাচীন মাজারে নিদ্রিত সেই মহান আত্মা কি আমার কথা শুনেছিলেন?

শুনেছিলেন। যেন মৃদু হেসে বলেছিলেন—সবুর বেটা, সবুর।

আগেই বলেছি, স্মৃতির তোষামুদী করে আমি হাঁটছি মনিরা। এও বলেছি, স্মৃতি শয়তানী করে। তার বেতামিজীর অন্ত নেই। আজ তার কাছে হাঁটু গেড়ে ভিখ মেঙে পুরনো দিনগুলিকে চাচ্ছি। অথচ কী অদ্ভুত অবহেলায় সে তার দান দিচ্ছে আমাকে। আগে পরের ধারাবাহিকতা নেই, পরেরটা আগে আগেরটা পরে তার খুশীমত দিচ্ছে। নাকি অশেষ দয়াময় স্মৃতি এমনি করে নানান জায়গায় সামনে-পিছনে আলো ফেলে ঠিক জিনিষটিই দেখিয়ে দিচ্ছে?

হয়ত তাই। জীবনের ভূমিকায় বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যত বা কালের সত্যির কি কোন মূল্য আছে? বিজ্ঞানী বলেছেন, কাল চির বর্তমান। আমি এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দেখি বলে মনে হয়, ওটা অতীত, এটা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কিছুই আমি দেখি না। কিন্তু আসলে চিরকালের বিন্দুতে যেন স্থিত আছি। তাই তার আগে-পরে নেই। বিন্দুতে দাঁড়িয়ে কোন জায়গা থেকে কোন জিনিষটি নিলে—বস্তুটির পূর্ণ রূপ ফোটে, মানুষের স্মৃতিই তা জানে।

ডিসেম্বরে পরীক্ষার পর কি ঘটেছিল কিছু মনে করতে পারছি না আজ। শুধু এটুকু মনে পড়ছে, হঠাৎ সেই নাড়াখাওয়া উৎসাহে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পেয়েছিলুম। মামুজী যেন আমার কোথাও একটা চমকে যাওয়া শিরা ঠিক করে দিতে পেরেছিলেন। হেঁচকিওঠা বন্ধ করতে যেমন মানুষকে হঠাৎ ভড়কে দিতে হয়।

তারপর মনে পড়েছে, জানুয়ারীর কোন এক দুপুরে স্কুলের বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে কোন একটা ক্লাসের ভিতর দিকে তাকিয়েছিলুম একবার। অমনি চমকে উঠেছিলুম। সামনের বেঞ্চে যে হিন্দু মেয়েগুলি বসেছিল তাদের ভিতর, হ্যাঁ,

তুমিই। মনিরা, তুমিই ছিলে।

রুদ্ধশ্বাসে ছুটে গ্রামে এসে সাদিককে চুপিচুপি বলেছিলুম—মনি স্কুলে ভর্তি হয়েছে দেখছিসরে? সাদিক লাফিয়ে উঠে বেরিয়েছিল। দেখে এসেছিল।

আমরা টের না পেলেও ভিতরে ভিতরে কবে লিটনগঞ্জের আকাশ বাতাস কেমন অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। বছরের পর বছর যারা মুখোমুখি আলাপ করেছে, কুশল সমাচার বিনিময় করেছে, তাদের মধ্যে একটা সুক্ষ্ম পর্দা আস্তে আস্তে নেমে আসছিল। দেখতুম প্রায়ই গঞ্জের ময়দানে সামিয়ানা তুলে জলসা বসছে। মাইকের প্রচণ্ড বেসুরো চিৎকার উঠছে—যেন কোত্থেকে দলে দলে রূপকথার দৈত্যেরা এতদিনে মানুষের শান্তির রাজধানীতে হানা দিচ্ছিল। অথচ উত্তেজনা—তীব্র উত্তেজনা মানুষের মুখে মুখে। ত্রাস কিংবা উল্লাসের তা বুঝতুম না, সকলেই একে একে সেই সামিয়ানার নীচে ছুটে চলেছে। যেন গঞ্জের জীবনে এসে বসল কোন বিদেশী সম্রাট। মাইকের চোঙটা তার বীভৎস মুখবিবর। শান্ত আর স্তব্ধ তারপর যুগযুগ ধরে যারা এখানে সুখের দুনিয়াদারী করছিল, তারাও মাথা নীচু করে দাসখতে টিপসই এঁকে দিচ্ছিল।

আর একদিন সেই দুরন্ত বিদেশী দৈত্য চোখ পাকিয়ে বলল, তোমরা দুদিকে ভাগ হয়ে যাও। একটা লাল খড়িতে দুটো ঘর এঁকে দিল। অবাক হয়ে দেখলুম লিটনগঞ্জে হৃদয় দুফাঁক হয়ে গেছে। রক্তময়, দুটি ফাঁকের উপর সে বিকৃত আকারে, ফের লিখে দিয়েছে ঃ হিন্দু-মুসলমান। সেই অদ্ভুত উত্তেজনার দিনগুলিতে সাদিকও হঠাৎ যেন আমার সামনে থেকে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখতে পেতুম অহরহ, এমন কি আমারই বেঞ্চের পাশে। অথচ সে-সাদিক সে নয়। কথা বলতে গেলে বলেছে আমার এখন অনেক কাজ কামাল। সঙ্গ ধরতে চাইলে নাগালের বাইরে হেঁটে গেছে—কামাল, পাঁচটায় মিটিং আছে। খুব ব্যস্ত ভাই।

রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে যেতুম। মনিরার জন্যে অনেক কথা যে আমার কাছে জমা হয়ে আছে। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। বোঝাটা চালান করতে চাই—অথচ সাদিকের সাড়া নেই। তারপর স্কুলের প্রাঙ্গনেই ছাত্রদের নিয়ে সে সভা করতে থাকল। মুষ্টিবদ্ধ হাত আর নির্ঘোষ ভরা কণ্ঠস্বর। প্রতিজ্ঞা আর প্রতিশ্রুতি আর প্রতিটি উচ্চারণে।

কমলদার সঙ্গে সেই সময় আমার পরিচয় হয়। কমলদা তখন কলেজের ছাত্র। ছোটোখাটো শরীর, তেমনি ছোটোখাটো চুল অবিন্যস্তভাবে কপালের উপর উড়ত। ফরসা রঙ। পাঞ্জাবীটা ছেঁড়া আর ময়লা। তাতে নস্যির ছোপ অজস্র। ডানপকেটে কোঁচাটা অনেকখানি ঢোকানো। প্রথম প্রথম আমাদের স্কুলে এসে ছাত্রদের সঙ্গে গল্প করে যেতেন। হাঁ করে সেগুলো গিলতুম। ভারী ভালো লাগত। আমাকে বলতেন—কী হে কামাল, তুমি এখানে যে। তোমার বন্ধুর সভায় গেলে না?

বলতুম—আমার ওসব হট্টগোল ভালো লাগে না।

অমনি কমলদা বলতেন—আমিও তো কম হট্টগোল করি না, বরং ওর চেয়ে হাজারগুণ বেশী, তবু আমার কাছে আসতে তোমার ভালো লাগে ?

সে কথা এড়িয়ে বলতুম—হাজার গুণ বেশী হট্টগোল ? কই দেখতে তো পাইনে।

—দেখবে ? বেশ তৈরী থেকো।

—তৈরী আমি আছি। শুধু মিটিং আর বক্তৃতা তো। সে আপনি যা বলেন, সাদিকও তাই বলে।

কমলদা অবাক হয়ে যেতেন যেন।—আমি যা বলি তা সাদিকও বলে ?

হ্যাঁ। আপনিও বলেন, এই আমাদের সুযোগ, এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আবার সাদিকও বলে, এই আমাদের সুযোগ, দাবী আদায় করার জন্য জানমাল কোরবান করতে হবে।

কমলদা হতাশ হয়ে যেতেন। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ মাথা দোলাতেন। তারপর বলতেন—কামাল, তোমাকে বুদ্ধিমান বলে জানতুম। সাদিক কী চায় আর আমি বা আমরা কী চাই তা তোমার জানা উচিত।

—আমি বুঝি না। হঠাৎ কমলদা খপ করে আমার হাতটা ধরে নিয়ে বলেছিলেন—সাদিক চায় মুসলমানদের জন্যে আলাদা দেশ। আর আমি চাই হিন্দু মুসলমান সকলের জন্যে একটি দেশ। কামাল, তুমি আমার চোখের দিকে তাকাও—আমি তোমার হাত ধরে আছি। এইবার বলো—তুমি কি এমন দেশ চাও—যেখানে আমি, মানে তোমার হিন্দু দাদারা থাকবে না ?

বলে ফেললুম—না, না, সে কী !

পরে সাদিকের সঙ্গে দেখা হলে, ঠিক একই ভঙ্গীতে তাকে আমি ওই প্রশ্ন করলুম। সাদিক কিছুক্ষণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—তুই একটা বিল্লী কামাল, বুঝলি ? বাঘের মত তোর আকার অথচ ম্যাও ছাড়া ডাক নেই। আমি বাঘের দলে তাই বিল্লীটিকে বরাবর এড়িয়ে রেখেছি—নিতে চাইনি।

অপমানে ক্ষোভে আমার গা জ্বালা করতে থাকল। আস্তে আস্তে ওর হাতটা ছেড়ে দিলুম। স্কুলের লম্বা বারান্দা ধরে চলতে লাগলুম। ভীষণ একা লাগছিল নিজেকে। কী হৃদয়বিদারক নিঃসঙ্গতা! আর সেই নিঃসঙ্গতার পরতে পরতে বিবর্ণ ধূসর মিনারার স্মৃতি যেন সবুজের চিহ্নবিহীন একটা ন্যাড়া পাহাড়ের খোঁদলে একদল প্রাচীন কালের পায়রা। মাঝে মাঝে সে ডানার শব্দ তুলে নিঃসীম নীল আকাশে উড়ে যায়, তবু পথ না পেয়ে কিংবা মায়া ও করুণার অভ্যাসে ঘরে ফিরে আসে। মুখর করে তোলে শিলাকন্দকর। তোমাকে দেখেছি অতি কাছে, কখনও দূরে—চকিত এক ঝলক দৃষ্টিতে শান্ত একখানি মুখ, মাছের চোখের মত চোখ, তার ভাষা বুঝিনি।

আজ বুঝতে পারি, ওই শব্দহীন দুরন্তের মধ্যে যেন নিজের নতুন পাওয়া যৌবনকে সম্মান করতে শেখাচ্ছিলে আমাকে। দুরন্তের ভাষায় সে ছিল তোমার নতুন জীবনের কথা বলা। যেমন করে একাগ্র যত্নে নিঃশব্দে মানুষ তার পুষ্প-তরুটিকে লালন করে, শুধু ফুলফোটার সাধ তার দুটি পরিশ্রমী বোবা বাহুকে ঘিরে কাঁপে—তেমনি ছিলে সেদিনের তুমি। বোবা দুরন্তের ভাষায় বলেছিলে—রোদ দাও, জল দাও, বাতাস দাও।

আমরা বিষণ্ণ জিজ্ঞাসু চোখের আয়নায় সেদিন অমন করে নিজেকে না দেখে নিলে বুঝি চলত না মনিরা?

স্কুলে দীর্ঘ বারান্দা পেরিয়ে যেতে যেতে সেদিন একবারটি তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম। যেন তোমার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব দিয়ে আমার নিঃসঙ্গতা ভরে তোলবার বিপন্ন প্রয়াস। দেখলুম, জানালাব পাশে তুমি বসে কী সেলাই করছ। দু-তিনটি মেয়ে তোমাকে ঘিরে বসে সেটা দেখছে। হাসছে. আর কী সব কথা বলছে। আমি মরিয়া হয়ে তোমাব কাছে গিয়ে বললুম—মনিরা তুমি তো সেলাই করছ, তোমার কাছে ব্লেড আছে? টিফিন পিরিয়ড। মেয়েগুলি কেন জানি না খিল খিল করে হেসে উঠল। তাদের মধ্যে কমলদার বোন সবিতাকে আমি চিনতুম। সে বললে—ব্লেড তো ছেলেদের কাছেই থাকে।

অন্য একজন বলল—যাঃ ওর তো এখনও দাড়ি গজায় নি।

হিন্দু মেয়েরা দারুণ ফরোয়ার্ড হয়—সাদিক বলত। এই প্রথম তাদের সান্নিধ্যে এসেছি। ভীষণ লজ্জা করছিল। রাঙা মুখে বললুম—পেন্সিল কাটবো।

সবিতা ফোঁস করে বলল—লাইব্রেরীরুমে যান না, সতীশ পিওনকে বললে ছুরি দেবে।

ওরা হাসতে থাকল। মনিরা, তুমি সেই নিষ্পলক মাছের চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ব্লেড এগিয়ে দিলে। হাত বাড়িয়ে নেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অপমান বোধ করছিলুম। তোমার বন্ধুদের হাসি, কৌতূহলে প্যাট প্যাট করে আমার মুখের দিকে তাকানো। গা জ্বালা করছিল।—থাক, বলে হঠাৎ বেরিয়ে এলুম। পিঠের উপর হাসির বিছুটির ঘা পড়তে থাকল।

কিন্তু পরমুহূর্তে মনের দেয়ালে তোমার সেই হাতের সেলাই করা কাপড় বাঁধানো এবং টাঙানো হয়ে গেছে। ক্রুচেট সুতোয় লাল ধ্যাবড়া অক্ষরে লিখেছিলে: 'রমণীর মন, সহস্রবর্ষের সখা সাধনার ধন।' স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলুম দাঁড়িয়ে থাকবার সময়। আর সারা বিকেল সারাটি রাত আমার ঘুম এল না। মনের ভিতর সর্বক্ষণ যেন তোমার হাতের সুচ ফুঁড়ে ফুঁড়ে রক্তলাল অক্ষরে লেখা হতে থাকল "রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখা, সাধনার ধন।" রমণীর মন সখা/সাধনার ধন/সহস্র বর্ষের/সাধনার/রমণীর মন/সখা···

কে রমণী? তুমি—তুমি, র-ম-ণী সখা—স-খা···আমি কি সখা? সখা হতে

পারি? তুমি রমণী হ'য়ো, আমি সখা হতে চাই। সহস্রবর্ষ ধরে সাধনা করব মনিরার মন/সহস্র বর্ষের/কামাল/সাধনার ধন/সহস্র বর্ষ কেন? এতদিন কেন? মনিরা, মানুষ তো অতদিন বাঁচে না।...

অনেক বেলায় ঘুম ভেঙেছিল। মা বললেন—ছুটির দিন বলে ডাকিনি, কিন্তু ঘুমের ঘোরে কী সব বলছিলি রে?

—কী জানি। মনে পড়ে না তো।

ফের সেই মনে পড়া নামক মারাত্মক কথা। মানুষের জীবনের সব গূঢ় কথা জানে স্মৃতি। একথা আগেই বলেছি, মনিরা। কিন্তু স্মৃতি—আমি যা দেখছি জানছি, আমার যে অজস্র ভাব রয়েছে প্রতিমুহূর্তে—হাসির ভাব, কান্নার ভাব, হর্ষ বিস্ময় বিষাদ শোক ক্রোধ ঔদাসীন্যের ভাব—সব মিলিয়ে যে অস্তিত্ব, তারা দীর্ঘ জমাখরচের খাতায় অন্তহীন হিসাব; সে হিসেবের সেরেস্তাদার যে, তার নাম স্মৃতি। কিন্তু তুমি কি জানো, যে সব্যসাচী তার ডানহাত যেমন লেখে, বাম হাতও তেমনি লেখায় পটু? ডান হাতে সে আলোয় লেখে, বাঁ হাত তার অন্ধকারে লিখে চলে?

মনের ভিতর অন্ধকার আছে। আর সেই অন্ধকার ঘরেও সঞ্চিত হয় যেন আমার সব অন্য রকম দেখা, জানাশোনা। অন্যরকম ভাব-ভিন্ন হর্ষ-বিস্ময়, শোক-ক্রোধ-ঔদাসীন্য। আমি তা দেখিতে পাই না। শুধু বুঝতে পারি। আর সেই বাঁহাতের লেখায় সেদিন যেন আলোয় লেখার গুটিকয় হিসাব অন্ধকারে যোগ করা হয়েছিল। তাই ঘুমের ঘোরে তাদের ঠেলে বাইরে পাঠানোর কঠিন চেষ্টা চলছিল। হয়ত নিষ্ঠুর লড়াই চলছিল সারাটি রাত।

তাহলে মনিরা, কোন জীবন কাহিনী লেখার বিপদটা কোথায় দেখ। ওই বাঁ হাতের লেখা অন্ধকারে হিসাবগুলি যে বাদ পড়ে যায়, অথচ তারাও তো সত্য। তারাও তোমার সমান্তরালে-ঘটে চলে জীবনে। তাকে বাদ দিয়ে সকলই অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে না কি?

যা মনে পড়ে না, তা কারুর কাছে শুনে যোগ করতে অসুবিধে নেই। কিন্তু ওই ভিতরের ঘটনাগুলো, সে তো অন্য কেউ তো দূরে থাক, আমি নিজে কতটুকু স্পষ্ট করে জানি?

ভিতরের স্মৃতিতে তোমাকে নিয়ে কী খেলার ইতিহাস জমে আছে আজও জানি না। যদি জানতে পারতুম একাকিনী সম্পূর্ণতা পেত। শুধু যেন নিরবিচ্ছিন্ন স্বপ্নের মত কী সব ভেসেছে ঘুমের মধ্যে কখনও জাগ্রত অবস্থায়। একাগ্র হয়ে থাকলে যেন টের পেয়েছি। শুধু এটুকু বলতে পারি, বহুরূপে তুমি —শুধু তুমি ছিলে; সকল প্রতিভাষে, রোদে-জ্যোৎস্নায়, অন্ধকারে। ঘাসগাছ, জল পাখি প্রজাপতিদের নিসর্গে বহু বিচিত্র আকারে। কখনও মনে হয়েছে তুমি লালমিয়া ড্রাইভারের বেশে লিটনগঞ্জ থেকে স্বপ্নের রেলগাড়ি নিয়ে নেভী রু

রুমাল নেড়ে ডাউন সিগনাল পেরিয়ে চলে গিয়েছ। কখনও দেখেছি তুমি পীরের মাজারে কাঠমল্লিকার কাঁটা লাফ দিয়ে পার হওয়া এক ছোট্ট কাঠবেড়ালী। কখনও স্কুলের ছুটিতে ভারী কাঁসর ঘণ্টা হয়ে বেজেছ। ছুটিতে আব্বা বাড়ী এসেছেন, অতএব আমার জন্যে উপহার সাদা মাফলার, মানে মনিরা। মামুজী এলেন। গল্প, ভ্রমণ, হাসির যোগফল মনিরা।

সাদিক একদিন মাথায় আচমকা চাঁটি মেরে বলল—ছোঁড়াটা বাঁচবে না।

ইকোয়েশনের অংক কষছিলুম মাথা নীচু করে। মুখ তুলে বললুম—তোর আর কী! তুই তো রাজনীতি করছিস, কদিন পরে স্বদেশে মন্ত্রী হয়ে যাবি। আমাকে তো চাকরী করে খেতে হবে।

সাদিক বলল—পরীক্ষার এখনও মাসখানেক দেরী। এরই মধ্যে ব্যস্ত হলি হতভাগা? নাঃ, তোর মত স্মার্টবয়গুলোকে নিয়ে গেলুম।

বললুম—অনেকদিন পরে উদয়, ব্যাপার কী?

—ব্যাপার তেমন কিছু নয়। একবার এলুম তোকে দেখতে। কতদূর এগোলি?

হেসে বললুম—টেস্টে সব সাবজেক্টে লেটার পেয়েছি, ম্যাট্রিকটা এমনিতে পাশ করিয়ে দেবে নিশ্চয়

সাদিক মুখ ভেংচে বলল—ম্যাট্রিকের খাতা তোর ন্যাংড়া ভোলানাথ মশাইয়ের হাতে নয়, দেখবে ইউনিভার্সিটি। বাঘা বাঘা প্রফেসর রয়েছেন বাছাই করা। কিন্তু হাঁদারাম, তোকে সে প্রশ্ন করিনি।

—তবে?

কানে ফিসফিস করে সাদিক বলল—মিস মনিরা বেগমের কথা শুধোচ্ছি।

দীর্ঘকালের নীরব জমাট অভিমান আমার ফেটে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।—খবরদার সাদিক, ও নিয়ে ফের কোন কথা বললে তোকে বেরিয়ে যেতে বলব!

সাদিক ভড়কে গেল যেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আঙুল ইসারা করে বলল—একটা সিগ্রেট দে তো!

সিগ্রেট দিলুম নিঃশব্দে। আমার কান দুটো জ্বালা করছিল। ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকলুম। মা পাছে সিগ্রেট খাওয়া টের পান, তাই সাদিক উঁকি মেরে দরজা অব্দি দেখে এল। তারপর সিগ্রেট জেলে একটা বই তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকলে।

কতক্ষণ সে এমনিভাবে বসেছিল, লক্ষ্য নেই। তারপর উঠে গেল তাও জানি কিংবা জানি না। মা এসে বললেন—ইস কী গন্ধ, কে সিগ্রেট খাচ্ছিল রে?

বললাম—সাদিক।

মা বললেন—আজ বিকেলের ট্রেনে পলাশগাঁ থেকে তোর খালা আসবেন। গাড়ি যাবে। তুই সঙ্গে যাস, খোকা।

নীরবে মাথা নাড়লুম।

বিকেলে স্টেশনে যাবার পথে আমার খুব কষ্ট হতে থাকল সাদিকের সঙ্গে অমন ব্যবহার করার জন্য। কেন ওর চোখে অমন ছোট হতে গেলুম? কী ভাবছে ও?

খেলার মাঠ ঘুরে গেলুম ওর জন্যে। সেখানে দেখতে পেলুম না। রেল ফটক পেরোবার সময় দেখলুম সাদিক সিগন্যালপোস্টের কাছে লাইনের উপর একা বসে আছে। ফেব্রুয়ারীর বিকেল। বেশ শীত আছে। পাশের মাঠে সব ফসল উঠে গেছে। সেখানে খয়েরী রঙের ভেজা জমিতে একদল কাক খুঁটে খুঁটে কী খাচ্ছে। যেন নিবিষ্ট মনে তাই দেখছে সে। আমাকে দেখে নীরবে হেসে একটা পাথরকুচি ছুঁড়ে মারল কাকগুলোকে লক্ষ্য করে। কাকগুলো উড়ে পালিয়ে গেল চিৎকার করতে করতে। আমি হলে কিন্তু বসে বসে দেখতুম। তাড়াতুম না।

সামনে গিয়ে ধুপ করে পাশে বসে পড়লুম। ঠিক ওরই ভঙ্গিতে অনভ্যস্ত হাতে একটা চাঁটি মারলুম মাথায়।

কারণ, ব্যাপারটিকে এমনি তীব্র ইয়ারকিতে উড়িয়ে না দিলে চলে না।

সাদিক হেসে বলল—মারলি যে?

শোধ নিলুম।

সাদিক সে কথার জবাব না দিয়ে বলল—জানিস কামাল, মনিরার সঙ্গে কাল আমার খুব ভাব হয়ে গেছে।

—সত্যি নাকি? আমার কণ্ঠস্বর কেমন ছন্নছাড়া শোনাল।

হ্যাঁ। বাপস, দু'দুটো বছর। অবশ্যি আমার সময়ও ছিল না ওসব নিয়ে ভাববার। তবে মধ্যে মধ্যে তোর জন্য খুব কষ্ট হত।

আমি চুপ করে থাকলুম।

কারণটা বেশ অদ্ভুত। ওর ছোট ভাই রিজু কাল বিকেলে মানিক ফকিরের সেই ডোবাটায় পড়ে গিয়েছিল। হতভাগা ছেলে। বাঁশের একটা ডগা ডোবার উপর বেঁকে পড়েছিল। তাতে চেপে ঘোড়া খেলছিল। ব্যস, পিছলে একেবারে অতল তলে। ভাগ্যিস, ঠিক সময়ে আমি যাচ্ছিলুম। ডোবাটা · ডোবাটা কী গর্ত? বাপস। ঠাণ্ডায় আমিও জমে যাবার দাখিল।

রুদ্ধশ্বাসে বললুম—তারপর?

—তারপর আর কী। ওদের বাড়ি আমার মেহমানী। ওর মা তো দিব্যি দিয়ে রাতে নেমন্তন্ন করে বসল। মনিরাও হেসে কেঁদে বাঁচে না। ভাইটিকে বড্ড ভালবাসে।

ফ্যাক্ট!

—ভাইকে সবাই ভালবাসে।

সাদিক মুচকি হাসল।—খেতে বসে তোর জন্যে কষ্ট হচ্ছিল। ইয়া বড় মোরগের রান, তেমনি খুশবো, ওর মা রান্নায় দারুণ এক্সপার্ট, ভাই।

আমি তুম্বোপানা মুখ করে বললুম—ইস!

মনিরা সামনে আসছিল না। ওরা ধমক দিলে—যা, সামনে বসে পুছ করে খাওয়া। বড় ভাই হয়। একই সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হলি। ও বাবা সাদিক, তুমি আজকাল এ বাড়ি আসা ছেড়ে দিলে কেন?

অবিকল মেয়েলী ভঙ্গী নকল করে সাদিক কথাটা বলছিল। হাসি পেল সে কারণে। বললুম—তারপর?

—তারপর আর কী। উঠে আসছিলুম। তখন মনিরা বলল—দাঁড়াও সাদিক ভাই. তোমাকে গলিতে আলো দেখাই. হোঁচট খাবে। ওর মা মেয়ের বুদ্ধি দেখে খুশী হয়েছে। বলল—হ্যাঁ, আলোটা পথ অব্দি দেখিয়ে দে। গলিতে সাপখোপ বেরোয় হামেশা। আমি বললুম—শীতে সাপ আসবে কী। শুনে ওর মা কী বলে জানিস? বিশ্বাস নেই বাবা। ও হচ্ছে আজরাইল। শীতই বা কী গরমই বা কী…

—পথে মনিরা তোকে·

বাধা দিয়ে সাদিক বলল—আগে সবটা শোন। তারপর ইচ্ছে হলে উড়িয়ে দিস।

—বেশ।

—গলির মধ্যে যেই ঢোকা, খপ করে হাত বাড়িয়ে দমটা কমিয়ে দিলুম। মনিরা বাধা দিয়েও পাবল না। শুধু বলল—এই, ছিছি। ওকী হচ্ছে? আমি তখন ওর গলাটা বেড় দিয়ে ধরে…

স্টেশনে ট্রেন এসে গেছে। সেকারণেই—নাকি আর বেশী শোনবার সহ্যশক্তি হারিয়ে, আমি উঠে দাঁড়ালুম। সাদিক বলল—কী হল?

—পলাশগাঁয়ের খালা আসবেন গাড়িতে। আমি যাই।

—দাঁড়া, আমিও যাচ্ছি।

সাদিকও উঠে এসে সঙ্গ নিল। অথচ ঠিক এটা যেন চাইনি। আমি ‥দিকের প্রতি হিংসায় নয়, তার ভাগ্যের প্রতি বিস্ময়ে বিচলিত হয়ে উঠেছিলুম। ভাগ্য মানুষকে এমনি করে? আমি তো কতদিন মাণিক ফকিরের ডোবার পাশ দিয়ে গেছি, রিজুর তো একবারও খেলা করার অবকাশ হয়নি।

সাদিকও বলতে বলতে চলেছে তখনও। ইচ্ছে করে, কানে নেব না। অথচ বাতাস পিছনে বা বাঁ-পাশ থেকে। সব কানে ঢুকে যাচ্ছে গল গল করে। আঃ ছি ছি। মনিরাকে সাদিক চুমু খেল অমন করে। ভালবাসা কি এই নোংরামি? ভালবাসা কি এমনি গায়ের জোরে টেনে আনা? চুমু খাওয়াই কি ভালবাসা?…

· অলক্ষ্যে আমার মধ্যে একটা প্রস্তুতি জেগে উঠছিল। শরীর শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। কালই দেখব, যে মনিরা আমার চুমু নয়, কোন অসভ্য আচরণ নয়—মাত্র, একটি ভদ্র সভ্য বিনীত ও সংযত আচরণের প্রকাশ স্বরূপ! আমি তোমাকে ভালবাসি এই কয়েকটি শব্দের প্রতিবাদে দীর্ঘ দুটি বছর দূরে সরে আছে, যাকে এই দীর্ঘ

সময়ের ব্যবধানে ভুলে যাওয়া অতি সহজ অথচ পারছি না, সেই মনিরা এরপর, সাদিকের সঙ্গে কী প্রত্যাচরণ করে।

দেখেলুম মনিরা। পরদিন থেকে দেখলুম। তুমি অতি সহজে ওই বীভৎস আচরণটা মেনে নিয়েছ। কী হিসেবে মেনে নিয়েছ, বুঝলুম না। সাদিকের ওই গায়ের জোরে চুমু খাওয়াকে ভালবাসার আচরণ বলে ধরে নিয়েছ কি না জানলুম না। যদি তা সাদিকের ভালবাসাই হবে, তাহলে আমার চিঠি লেখার মধ্যেই গায়ের জোরের প্রমাণ পেলে কেন—এই ধাঁধা আমাকে অস্থির করে তুলল। যদি দুটোই গায়ের জোর হয়, তাহলে আমি কেন অপরাধী থাকবো? বিচিত্র, মনিরা অতি বিচিত্র মেয়ে তুমি।

নাকি তোমার কাছে ভালবাসার ভাষা চিঠিতে নয়, চুমুতে? ভালবাসার দাবী তোমার মনের কাছে নয়, দেহের কাছে? তা যদি হয় তাহলে তুমি খুবই বাজে মেয়ে বলে ধরে নেব। খুবই সাধারণ 'চতুর্থ শ্রেণীর মেয়ে তুমি' কমলদার ভাষায় নিছক সেক্সি। তোমার ভালোবাসা পাবার যোগ্যতা নেই। তুমি নায়িকা নও, নায়িকা দেহের ভাষায় কথা বোঝে না, সে মনের ভাষায় কারবারী। সে অর্ধেক কল্পনা আর অর্ধেক বাস্তব। তুমি পুরো বাস্তব।

এইসব ধারণার বোঝাপড়া আমার দু-বছরের বিষণ্ণতার শুকনো পাতার স্তূপে আগুন জেলে দিল।

স্মৃতি আবার পর্দা তুলল। দেখছি, ১৯৪৫ সাল, জুলাই মাসের এক সন্ধ্যা। অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়ছে। কলেজের বই খুলে বসে আছি। জানালার বাইরে অন্ধকারে পুকুরের জলে বৃষ্টির শব্দ। গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দ। ঘরের ছাদে বৃষ্টির শব্দ।

পোকা এসে জ্বালাতন করছে। দেয়ালে বিজলী বাতি সেবার গ্রীষ্মে মুসলমান পাড়ায় ইলেকট্রিক লাইন এল প্রথম। মসজিদ, তারপর কাজিবাড়ী, তারপর আমরা নিলুম। তোমাদের ঘরে তখনও নাওনি। সাদিকরা সম্ভবতঃ নিয়ে ছিল। বিজলী আলোর সঙ্গে একটা কেমন চতুর আর গোপন দম্ভও আমাদের কয়েকটি পরিবারকে ঘিরে ধরেছিল। সকলে এসে দেখে যেত। তারিফ করত। মা শহরের মেয়ে। দীর্ঘকাল এখানের জীবনে বাস করে গ্রাম্য হয়ে পড়ছিলেন। ততদিন তাঁর সেই পুরানো অবিবাহিত জীবনের মাজাঘসা রূপটি ফের ফুটে বেরোচ্ছিল। তাঁর চলাফেরায়, কথাবার্তায় সেই পরিবর্তন টের পাচ্ছিলুম।

মনে পড়ছে, অনেকে এসে আলো দেখে গেল। ফ্যান ঘোরালো, দেখল। এমন কি তোমার মা এলেন, বিদেশিকে ফুফু এসে দেখে গেলেন, তোমার ভাই রিজুও দিনরাতি আনাগোনা করতে থাকল, শুধু তুমি এলে না। শুধু তুমি।

এখন বুঝতে পারি, তোমাকে মন থেকে মুছে (সত্যি কি?) আমি যতটা সহজ হতে পেরেছিলুম, তুমি হয়ত পারো নি। নৈলে কিসের অত সংকোচ ছিল মনিরা?

শুনেছি ছেলেবেলা থেকে সব মেয়েই এক রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখে—কারণ সেই এসে তার যৌবনের ঘুম ভাঙায়—তার পথ চেয়ে থাকা মেয়েদের সহজাত বৃত্তি। আমার চিঠি যেন তোমার যৌবনের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েই বিষন্নচিত্তে তার কাজ শেষ দেখতে পেরেছিল। তোমারও প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছিল। এবং তুমি যেন শুধু নিজের ঘুম ভাঙাতেই চেয়েছিলে, রাজপুত্রকে চাওনি।—তাহলে তো তুমি আশ্চর্য মেয়ে মনিরা। নাকি সব মেয়েই ওইরকম। যাকে-তাকে দিয়ে ঘুমটা ভাঙিয়ে নেয়।

সব মেয়ে তা নয়। আমি দেখছি। তাই ভেবেছি, তুমি ছিলে জলের ধারে সেই নিঃসঙ্গ গাছ—যে জলের আয়নায় নিজের দিকে চেয়েই থাকত শুধু অনির্বাণ কাল ধরে। সেই গ্রীসকন্যা নার্সিসাস। আমি তোমার সামনে ছিলুম নিষ্কম্প জল। আগেই বলেছি, সাদিক বাতাসের মত। সে শুধু যেন দোলাতেই পেরেছিল তোমাকে। তুমি তাঁকে তাকিয়ে দেখনি। দেখেছিলে শুধু নিজেকে।

সে কথা পরে। এখন জুলাই মাসের সন্ধ্যায় বৃষ্টির শব্দ চারপাশে। এখন অন্ধকারে গাছে গাছে জোনাকী। ১৯৪৫ সাল। ক্যালেন্ডারে ঘন নীল অক্ষর : ১৭, বুধবার।

হঠাৎ বাইরে [illegible] আর্তনাদ শুনলুম,—খোকা, খোকা, আমাদের কপাল ভেঙেছে রে বাছা।

ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলুম। বারান্দায় মা মূর্ছিতা। তাঁর হাতে একটি ভেজা টেলিগ্রাম। 'মিঃ চৌধুরী এক্সপায়ার্ড টুডে মর্ণিং' বাকী শব্দ পড়া গেল না।

জানতে পারলুম, দূরের শহর থেকে আর কেউ আনবে না আমার জন্য রঙীন মাফলার, বাদামী শার্ট, রবিনসন ক্রুসো, ট্রেজার আইল্যান্ড, রবি ঠাকুর, কাজী নজরুল। লাভের মধ্যে পেয়ে গেলুম শুধু একটা বাড়তি রিষ্টওয়াচ আর দামী কলম। আর...

সেই তো এলে আবার। কেন মিছি মিছি অ[illegible]লো দিন [illegible] দিয়েছিলে বলতো? এ তোমার কী খেলা মনিরা। মায়েব পাশে মাতামহীর [illegible] আশ্চর্য সাহসে তুমি এসে দাঁড়ালে। মা চলতে ফিরতে উঠতে বসতে সব ভুলে মনিরা, মনিরা, মনিরা—এই নিয়ে শুধু ব্যস্ত থাকলেন। আর আমি? ...এত কাছে কাছে নিভৃতে পেতে থাকলুম যে আমার কাছে তোমার অস্তিত্ব আকাশের মত সহজ হয়ে উঠল। তখন ইচ্ছে করত না, দুষ্টুমি করে তোমার গায়ে চিমটি কাটি, একবার ছুঁয়ে দেখি ততদিনে তোমার দেহে কোষেকোষে কী অপরূপ পূর্ণতার আয়োজন .কিছু ইচ্ছে করত না। হারানোর পর পেয়ে তোমার যেন মূল্য বুঝতে পারছিলুম জীবনে। তাই এতটুকু ত্রুটি ঘটতে দিতুম না যাতে তোমার সম্মানের হানি হয়। কারণ,তখন তুমি আমার কাছে একটি পরম পবিত্রতার প্রতীক হয়ে উঠেছ।

আব্বার আকস্মিক মৃত্যুর উপহার একমাত্র তুমি। তোমাকে মা যেমন শোকের সান্ত্বনার উৎস বলে বরণ করে নিলেন, আমিও তেমনি মাথায় করে রাখলুম। আর

হারাতে চাইনে এখন পথের ধুলোয়।

প্রকৃতপক্ষে, তোমার এ আসা ছিল নিঃশব্দ দুঃখের রাতের অতিথির মত। ঘরে ডেকে এনে ধন্য হলুম। তারপর মাও অসুখে পড়লেন। দিনের পর দিন রাতের পর রাত তাঁর সেবা করতে থাকলে নিপুণ হাতে। মামুজী আব্বার মৃত্যুর পর ঘন ঘন আসছিলেন আমাদের খোঁজ খবর নিতে। সেবার এসে সব দেখেশুনে একেবারে স্পষ্ট করে আমাকে বলে বসলেন—কামাল, মেয়েটিকে তোর পছন্দ হয়?

আমি অবাক।

—তোর মায়ের অবস্থা ভাল বোধ করছি না। খুবই তাড়াতাড়ি চুকেবুকে যাক, কেমন?

আমি তবু চুপ করে থাকলুম।

মামুজী মায়ের কাছে গেলেন। আমি বেরিয়ে পড়লুম। আমার মধ্যে এক অব্যক্ত চঞ্চলতা প্রকাশের পথ খুঁজছিল। সাদিককে খুঁজে বেড়ালুম। হতভাগা তখন রাজনীতির মহা পাণ্ডা সেজে বসেছে। ওদিকে সেই অস্থির প্রশান্ত মাতন দেশে। কংগ্রেস-মুসলিম লীগ দ্বন্দ্ব। সর্বত্র উত্তেজনা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা প্রচণ্ড ওলটপালটের থমথমে প্রতীক্ষা। সাদিককে কোথাও পেলুম না। আর কী আশ্চর্য, যখন একা ফিরে আসছি, সন্ধ্যা নেমেছে পৃথিবীতে—হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সাদিক একদিন তোমাকে চুমু খেয়েছিল—তারপর তারপরও কি আরও কিছু… ?

মনটা দমে গেল। মনিরাকে বিয়ে? …তার মানে সে আমার শয্যায় শোবে, তখন আমিও তাকে সাদিকের মত…তার মানে সমাজের এই রকম 'নিয়ম' তার দেহে আমার দেহের সংযোগের মধ্যে দিয়ে সন্তান আসবে…

কী বিশ্রী নিয়ম, কী রুচিহীন জঘন্যতা মানুষের জীবনে নির্দিষ্ট!

কেন শয্যা, কেন একত্র শয়ন, কেন সন্তান?…আমি তো মনিরাকে দেখি শুধু তুমি নামে দুটি অক্ষরের মধ্যে। শুধু আমি আর তুমি…প্রেমের জন্য আর কিছু অবান্তর।

সাদিককে ধরতে পারলুম। পরদিন তাকে কথাটা বলতেই সে লাফিয়ে উঠল। —অপূর্ব হবে ভাই কামাল। এক্সেলেন্ট। তোফা। …তারপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। চুমু খেল। কামাল, আমি এখন টু মাচ বিজি রে! অনেক দায়দায়িত্ব মাথায় আছে। তুই ভাই বিসমিল্লা বলে ওকে ঝুলিয়ে নে তো। সত্যি, আল্লা খুশী হবেন। মেয়েটাকে দেখলে দুঃখ হয়।

—কিন্তু আমি এম এ, অব্দি পড়তে চাই যে সাদিক!

—তাতে কী? বিয়েটা করে বৌকে বাপের বাড়ি রেখে দেনা ততদিন।

—মায়ের শরীর যে ভালো নয় এদিকে। সংসারের চাপেই এটা হচ্ছে বুঝছিস না?

—ওরে শালা। সাদিক চাঁটি মারল অভ্যাস মত। ভাই ভালো মানুষের মেয়েকে ডেকে এনে কাঁধে সংসারের জোয়াল চাপানোর মতলব? তোর মামুজীর মাথায় বুঝি এটা খেলেছে?

—ঠিক ধরেছিস।

সাদিক আমার চোখে চোখ রেখে বলল—আমার আইডিয়া অন্যরকম। তোরা একটা বেহস্তের ঘরে বাস করবি। দুটি মানুষ—প্রেমিক-প্রেমিকা। —শান্ত নির্জন ঘর, একটুকরো ফুলের বাগান, নীচে নদী···

হাসতে থাকলুম।— আইডিয়া দিয়ে স্বপ্নের চলে, বাস্তব জীবনে চলে না সাদিক।

—তুই তো চিরকাল আইডিয়ার জীব ছিলি রে, বরং আমি বাস্তববাদী। তোর হল কী বলতো?

—আব্বা নেই। সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে না?

—নিতেই তো বলছি। শীঘ্র বিয়েটা চুকিয়ে নে। মকসুদ সাহেব তো হাতে বেহস্তে পাবেন মনে হয়। তোর মত ধনবান হীরের টুকরো ছেলে।

—যাঃ। [illegible] শুনে স্রেফ না বলে দেবেন। সত্যি সাদিক, তেমন কিছু হলে আমি কেমন করে সহ্য করব জানি না। তাই ভয় হয়।

—অপমান করবে? সাদিক লাফিয়ে উঠল। তাহলে আর লিটনগঞ্জে বাস করতে হবে না। সাদিক খানের চেলারা একেবারে উত্তর মেরুতে রেখে আসবে।

—ছিঃ সাদিক! একথা বলে মিছেমিছি ওকে অসম্মান করা কেন?

ধুস্ শালা, তোর দ্বারা কিছু হবে না। বলে সাদিক দ্রুত চলে গেল। আমি ফিরে এসে মামুজীকে বললুম—আপনি আজ বেরোননি দেখছি যে? অর্থাৎ মামুজী ও বাড়ি গিয়েছিলেন কি না জানবার ইচ্ছা।

মামুজী একগাল হেসে বললেন—বেরিয়েছিলুম। কথা পাক [illegible]কি মায় দিনক্ষণ অব্দি স্থির করে এলুম।

—কিসের বলুন তো?

মামুজী তেড়ে উঠলেন—ন্যাকা! মারব মুখে এক থাপ্পড়। বলে হাসতে লাগলেন খুব।

আমি মায়ের কাছে গেলুম দেখি, মা হাসিমুখে বিছানায় ওঠবার চেষ্টা করছেন।

এরপর? প্রশ্ন করো না, মনিরা। বলতে দাও আমাকে! [illegible]মার নির্জন নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছি আজ আঠারো বছর পরে। ডিসেম্বরের শীতার্ত অন্ধকার রাতে চুপি চুপি চলে এসেছি তোমার কাছে জানতে এসেছি, কাকে তুমি প্রকৃত ভালবেসেছিলে? যাকে দেহ দিয়েছিলে, না যাকে দাওনি, তাকে? সাদিক না আমি তোমার নারীজীবনের সে গৌরবের মালাবহন করছি? সাদিকই

কি ? আমার গলা যে শূন্য ছিল মনিরা। সাদিক তার রাজনৈতিক স্বপ্নের দেশে চলে গেছে। শুধু আমি যেতে পারিনি। এই লিটনগঞ্জই আমার স্বপ্নের দেশ। তাই তাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাইনি। আজও কামাল চৌধুরী নিঃশব্দ। বিষণ্ন, বিভ্রান্ত। সে জীবনের পরম মূল্য বলে প্রেমকেই শ্রেয় করে বসে আছে। যে প্রেম তাকে শাহান শাহ করেছিল, সেই প্রেমই তাকে পথের ফকিরের মত নিঃস্ব করে ফেলেছিল। প্রেম তার কাছে তাই শক্তিমান এক অলৌকিক। এবং তারই নির্দেশে আজ মধ্য-যৌবনের মধ্যরাতে হঠাৎ দরজা খুলে লিটনগঞ্জের গোরস্থানে এসে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটি প্রশ্ন তার। জবাব দেবে কি তুমি ?

কেন সেদিন বিয়ের ঠিক আগের রাতে অমন করে সাদিকের ঘরে গেলে, দরজাটাও বন্ধ করলে না ? তুমি কি জানতে আমি ঠিকই ওর কাছে যাবো তোমার খোঁজে—? কারণ, তোমার মা-বাবা তোমার খোঁজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। সবখানে তোমার খোঁজ করা হচ্ছিল। গায়ে হলুদ সাদীর কনে বিকেল থেকে উধাও, কোন পাত্তা নেই—অথচ হাতের কাছে প্রত্যক্ষ একটা জায়গা সাদিকের ঘর, কেবল আমি ছাড়া কারুর মাথায় ওকথা এল না ! তাদের দোষ নেই। বাঘের ঘরেই ঘোগ নাকি বাসা করে। রাজনীতিসর্বস্ব যার জীবন, সেই সাদিককে সেদিন ওই জঘন্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকার সন্দেহ কেউ করতে পারেনি। শুধু আমি —একমাত্র আমি ছাড়া। আশ্চর্য সাদিক আর তোমার রণকৌশল !

আমারও কি ইনটুয়্যিশন আছে ? মাথায় টনক নড়েছিল কি ? ··আর, গিয়ে দেখলুম দুটি দেহ। একমাত্র দেহ।

আমার নতমুখে পিছু ফিরে চলে আসা উচিত ছিল। চিরকালের মত নীরব হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অথচ আমি দরজায় শিকল দিয়ে চিৎকার করে উঠলুম। তখন তুমি বুঝি তোমার সারা নারীজীবনের সকল ঘৃণায় আমাকে ডুবিয়ে দিচ্ছিলে।

তাহলেও জানি, এ তুমি ইচ্ছে করে করেছ। সবই আমাকে নিবৃত্ত করার কৌশল। সাদিক দেহের মধ্যেও তোমাকে পায়নি। অসম্ভব। পেতে পারে না। মনিরা, তুমি অত ছোট নও, ছোট ছিলে না। তুমি শুধু দেহের তালা এঁটে দিতে চেয়েছিলে আমার ভালবাসার ঘরে।

তা নাহলে সেই রাতে তুমি আত্মহত্যা করতে না মনিরা। এর পর সাদিকের সঙ্গে মিলনে তোমার বাধা ছিল না। সাদিকই তো মাথা উঁচু করে বলেছিল— ওর যদি বেইজ্জতি ঘটে থাকে, আমি তার দায় মাথা পেতে নিলুম। আমি ওকে আজই বিয়ে করতে রাজী আছি। কেলেঙ্কারী ঢাকবার জন্য অতি দ্রুত সে ব্যবস্থাই করা হচ্ছিল। অথচ ঠিক এমনি মধ্যরাতে তুমি খিড়কির দরজা খুলে চুপিচুপি ডুমুর গাছে—

ওই ডুমুর গাছে ছেলেবেলায় আমরা কত খেলা করেছিলুম, সেদিন ভেবেছিলে

কি এ ঘটনার কথা ? তাহলে মনিরা, আত্মহত্যা দিয়ে তুমি কী যেন বোঝাতে চেয়েছ মনে হচ্ছে। কী সেটা ? সেই আমার প্রশ্ন আজ আঠারো বছর পরে।

তুমি কি আমি আর সাদিক উভয়ের মধ্যে কাকেও বেছে নিতে না পাবার অক্ষমতায় জীবন থেকে ছুটে পালিয়ে গেলে ? কিংবা তুমি সেই গ্রীসকন্যা নার্সিসাস—শুধু চেয়েছিলে—আমি হই তোমার পায়ের নীচে জল—যার আয়নায় তুমি নিজেকে দেখবে আর সাদিক হোক আন্দোলিত বায়ু, যার দোলায় তুমি কাঁপবে। দুলবে। নুয়ে পড়বে জলের আয়নায় দেখা নিজেরই ঠোঁটের দিকে। নিজেকে নিজে ভালবেসেছিলে তুমি, তুমি নিজের দেহে মধুস্বাদ পেতে চেয়েছিলে নিজে। তাই সাদিকের মত ঝড়োয়া বাতাসের অত প্রয়োজন।

আজ আঠারো বছর পরে একটা পুরনো খাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখেছি একটা বিবর্ণ গোলাপ। কবে কখন রেখে এসেছিলে জানি না। সেই প্রথম উপহৃত গোলাপটা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলে গোপনে। আর সেই আঁকাবাঁকা হরফে লেখা ঃ আমিও তোমাকে ভালবাসি। ইতি মনিরা। কেন আমি জানতে পারিনি একথা ? তাহলে তো তোমার চিঠির জবাব পেয়েছিলুম! পেয়েছিলুম! নিজের অজ্ঞাতে গলায় দুলছিল জয়ের মালা। গলা আমার শূন্য ছিল না।

ছুটে বেরিয়ে এসেছি সঙ্গে সঙ্গে। গোরস্থানে এসে দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে। আঠারো বছর আগে আমি আমার অজ্ঞাতে যা পেয়ে বসে আছি, তার সুখে আমার বিষাদের শুকনো ঝরা পাতায় আবার আগুন জ্বলে উঠেছে।

মনিরা, অন্ধকারে হাত বুলিয়ে অনুভব করছি তোমার বুকের উপর শরতের দুর্বাঘাসগুলি এবার শুকিয়ে যাচ্ছে। শিয়রের তরুণ কাঠমল্লিকার পাতায় ঝরার অস্ফুট ধ্বনি বাজছে। এখন এই শীত পাতাঝরার ঋতু। কুয়াশার টুপি পরে নিঃসঙ্গ সর্বত্যাগী ফকিরের মত গাছগুলি আলাদা হয়ে যাচ্ছে পরস্পরের কাছ থেকে। যেন মাটি থেকে পা তুলে পথে বেরোতে দেরী নেই তার। এবং আমার চার পাশের এই বিষাদময় বৈরাগ্যের পৃথিবীতে তোমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখলুম, দূরে কারা শুকনো ঝরাপাতা জড়ো করে আগুন জেলে দিল। শীতের রাতে সেইটুকুই এখন সুখ। আমিও এবার তেমনি আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে আছি।...



গল্পগুচ্ছ

আলমারির মাথায় রাখা ফ্লিটের কৌটোর ওপর একটা বিশাল মশা উড়ে গিয়ে বসল, শশাঙ্ক দেখতে পায়। পোকামাকড়ের ব্যাপারে তার কিছু ট্রেনিং আছে। তাই মনে হয় মশাটা এনোফিলিস। নিশ্চিন্তে বসে থাকে সেটা। লাল চকচকে কৌটোর ওপর সাদা হরফ ছুঁয়ে লম্বা পা দুটো চক্রান্তের আপাত নিরীহ কোড মনে হয় শশাঙ্কের। পিছনে দেয়ালে সেঁটে আছে একটা মাকড়সার কঙ্কাল। কোণার দিকে কাগজপত্রের মাথায় টিকটিকির সাদা ডিম। আগের অফিসারটি মানুষ হিসেবে নোংরা ছিল বোঝা যায়। গা ঘিনঘিন করে শশাঙ্কের। আসলে বংশের গোড়ায় কালচার-ট্রাডিশনের কোন ব্যাপার না থাকলে এমন তো হবেই। কত্তাবাবা হয়তো মুদীখানায় তেল-নুন বিক্রি করত—নাতি লেখাপড়া শিখে পাস-টাস দিয়ে গেজেটেড ব্যাংকে প্রথম শ্রেণীর অফিসার হয়েছিল। চার্জ নেবার সময় শশাঙ্ক লক্ষ্য করেছে, লোকটার চেহারায় যেন মেঠো ছাপ আছে অজস্র। একেই বলা চলে মাটির গন্ধ ভুরভুর করা। প্রিডিসেসরের (পূর্বসূরি বলবে শশাঙ্ক?) গা থেকে মাটির গন্ধ ভুরভুর করে বেরোত বলেই নাকি এলাকার লোকেরা এখনও নেপথ্যে আক্ষেপ করে—আহা, অমন বিডিও আর হবে না। সেই মেঠো লোকটা স্রেফ মাটির গন্ধের জোরেই প্রোমোশন পেয়ে কলকাতায় রাজ্যীয় তাড়ি উৎপাদন বিপণনের ডাইরেক্টর হয়ে চলে গেল। ভাগ্য দেখে ঈর্ষা হয়। আঃ কলকাতা! আবার কবে ফিরে যাওয়া হবে শশাঙ্কের কে জানে! তার এই মফঃস্বল মোটেও ভালো লাগে না। তার সুন্দরী স্ত্রী ইরারও "ভাল্লাগেনা"। স্রেফ গাছপালা ধুলো কাদা পোকাপাকড় স্রেফ নির্বাসন। শুধু একঘেয়েমি, অশালীন ক্ষুৎপীড়িত ভীড় মিছিল দাবী ডেপুটেশান নলকূপ বাঁধ রিলিফ ড্রাইভোল ওঃ ওঃ!

'কী স্যার?' তারিণী কন্ট্রাকটার চমকে ওঠে।

শশাঙ্ক বলে, 'আপনাদের এখানে বড্ড মশা।'

'হ্যাঁ স্যার মশা'।......তারিণী নিবেদন করে।... ..'তবে এখন তো অনেক কমেছে। একসময় সন্ধ্যাবেলা গা থেকে ছুরি দিয়ে চাঁছলে এক আস্তর পলেস্তারার মতন খসে যেত।'

'কী?'

'আজ্ঞে মশা।' · তারিণী মৃদু হাসে।...'খালের ওপারে জঙ্গল ছিল প্রচণ্ড স্যার। বাঘ থাকত। চিনুবাবুর ঠাকুর্দা নাকি হরিণও মেরেছিলেন, একটা— দলছুট একচোখ কানা হরিন। ওনাদের সদর ঘরের দেয়ালে একটা চামড়া দেখেছি

ছেলেবেলায়। পরে অনেক অস্থাবর শুদ্ধ নীলাম হয়ে যায়। তো…জঙ্গল গেল। তখন পাটক্ষেত হল। খালে পাট পচতে দিত চাষীরা। আশ্বিন থেকে তখন আর মশার অত্যাচারে এদিকে পা বাড়ানো কঠিন ছিল। ব্লক অফিস হবার পর অবশ্য অনেক কমেছে। তবে সাপ বলছেন, সাপের অবস্থাও তাই। এখনও অনেক থাকবে বই কি। এখানটা ছিল একটা মস্ত ডাঙা। কোভাঝোপ কেয়া ফণীমনসায় ভরতি। লোকেরা আঁতুড়ের নোংরা আর হাঁড়িকুড়ি ফেলত। ওই যে সেণ্টারে পার্ক রয়েছে গোল বেদী দেখছেন? ওখানটায় ছিল একটা মাঁদার গাছ। বোশেখ-মাসে থোকা থোকা লাল ফুল ফুটত। তার পায়ের তলায় যত নোংরা জিনিস-পত্র।…এবার তারিণী মিত্র পাঞ্জাবির পকেট থেকে দামী সিগ্রেট বের করে। সামনে ধরে বলে, 'নিন স্যার।'

শশাঙ্ক গম্ভীর হয়ে বলে, 'থ্যাঙ্কস। এখন নয়।'

তারিণী মনে মনে বলে, 'শালা তুমলক ডাঁট দেখাচ্ছে! আ বে, আমি কত ডিসট্রিকট অফিসারই ভেসে পুড়িয়ে খেলুম, আর তুমি কলকাতায় নয়া কেতুনে। রোসো।' প্রকাশ্যে বিনীত হাসে।…'হু, বেশী স্মোক ভাল নয়, ক্যান্সার হয় নাকি।'

শশাঙ্ক আরও গম্ভীর হয়ে বলে, 'নো—নট ফর দ্যাট। আপনি কার কথা বলছিলেন যেন, নাম চিনুবাবু অর…'

'হ্যাঁ স্যার, চিনুবাবু। চিন্ময় ব্যানার্জি। এমন অদ্ভুত লোক দেখা যায় না। তবে বড্ড খেয়ালী মানুষ। আসবে কি না বলা মুশকিল। দেখি তো, কী বলে।' …তারিণী কণ্ট্রাকটার সিগ্রেট ধরাতে আর সাহস পায় না; সুদৃশ্য কৌটো পকেটে রেখে দেয়।

শশাঙ্ক বলে, 'আমি ডেকেছি বলবেন। সাপ ধরতে পারুক আর নাই পারুক, আলাপ করতে চাই।'

তারিণী ব্যস্ত হয়ে বলে, 'ধরতে পারবে না কী বলছেন স্যার? ও সাপুড়েদের রাজা, রীতিমতো ফেমাস স্নেকোলজিস্ট…'

শশাঙ্ক ঝুঁকে আসে।…'কী বললেন, কী বললেন?'

'স্নেকোলজিস্ট স্যার—সর্পতত্ত্ববিদ!'

অমনি শশাঙ্ক হো হো করে হেসে ফেলে। তারপর ফের গম্ভীর হয়।

তারিণী মিত্র জেদের স্বরে বলে, 'ইয়েস স্যার। দেশবিদেশে কত সেমিনারে ওর ডাক পড়ে। সাপের ওপর একগাদা বই লিখেছে। চিনুবাবু খুব সাধারণ লোক নয়। অবশ্য, সামনা সামনি দেখে তা বুঝতে পারবেন না। ওর বিস্তর হিস্ট্রী রয়েছে। সেকেণ্ড গ্রেটওয়ারে বর্মায় মিলিটারীতে ছিল। গা'ময় গুলীর পোড়া দাগ আছে। বিয়েটিয়ে আর ভাগ্যে হল না। টোটো করে ঘুরে বেড়ায় দিনরাত্তির। বর্মার জঙ্গলে থাকতে সাপ ধরা শিখে এসেছিল। দেশে ফিরে ওই

একমাত্র নেশা হয়ে দাঁড়াল। বাড়ি গেলেই দেখতে পাবেন। নানা সাইজের কাচের বাক্‌সে রাজ্যের সাপ কিলবিল করছে। ঘরময় নানান জাতের পাখির মমি…'

পাখির মমি শনুনে ফের হাসি পেল শশাঙ্কের—কিন্তু কৌতূহল তাকে নিঃশব্দ করে।

'তার ওপর প্রজাপতির ছড়াছড়ি। প্রতিদিন একটা অদ্ভুত জাল নিয়ে বিলের দিকে চলে যায় প্রজাপতি ধরতে। কখনো সাপও ধরে আনে। সাপ আর সাপের বিষ দুই-ই চালান দেয় কলকাতায়। তবে ব্যবসা ঠিক নয়—স্রেফ সখ।' তারিণীর মুখটা উত্তেজনায় এবার লাল দেখায়।…'ওকে সাধারণ মানুষ ভাববেন না।'

নাকি ভান—শশাঙ্কের সঙ্গে খাতির জমানোর চালাকি! শশাঙ্ক বলে 'তাহলে আপনাদের চিনুবাবু একজন ন্যাচারালিস্ট বলুন।'

'আজ্ঞে?'

'ন্যাচারালিস্ট—প্রকৃতিবাদী।'

তারিণী কন্ট্রাক্টার ম্যাট্রিক পাশ। বুঝতে পেরে সে বলে, 'হ্যাঁ স্যার নেচার নিয়েই চিনুবাবুর কারবার। ওই নেচারই তো খেল লোকটাকে।'

এতক্ষণে দু'কাপ চা আসে ভিতর থেকে। তারিণী খুব খুশী হয়ে চায়ের টলটলে চমৎকার কাপটা লক্ষ্য করে। এই কিশোরী ঝি নিশ্চয় বানায় নি। নতুন বিডিও সায়েবের বউটি প্রচণ্ড সুন্দরী। অফিসারপাড়ায় এক্ষুণি বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেছে, তারিণী জানে। চায়ের কাপটা মোটামুটি নিষ্ঠার সঙ্গে সে তুলে নিয়ে বলে, 'কিন্তু সাপ ঠিক দেখেছিলেন তো? চোখের ভুল নয়তো?'

শশাঙ্ক তার চায়ে আলতো চুমুক দিয়ে বলে, 'ইমপসিবল! পরিষ্কার জ্যোৎস্না ছিল কাল রাত্রে। আর দেখছেন তো, আমার আইসাইট ভালো—চশমার দরকার হয় না।'

'তাহলেও অনেক সময়—বিশেষ করে চাঁদের আলোয়…'

শশাঙ্ক কথা কেড়ে বলে, 'হ্যালুসিনেসান? আমার স্ত্রীও দেখেছেন। একই সঙ্গে দু'জনে দেখেছি। আলো লোকজন আসতে আসতে বুগানভিলিয়ার তলায় লুকিয়ে পড়ল। এখন প্রশ্ন হল—অন্তত রাত্রিবেলা বাইরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি না করলে তো মশাই এখানে অসহ্য লাগবে ক্রমশ। দিনমান এতসব হইহল্লা—নার্ভের বারোটা বেজে যায়। রাত্রিটা কিছু অবকাশ দেয়। তখন একটুখানি বাইরে ঘোরাঘুরি করতে ভালই লাগে।'

তারিণী মৃদু হাসে।…'একশো বার। তাছাড়া স্যার, এমন বসন্তের টাইমটা—রাত্রিবেলা মুনলাইট—জায়গাটাও বিউটিফুল সিনারি স্যার।…'

একটু পরে তারিণী মিয়া চলে গেলে শশাংক পর্দা তুলে ভিতরে ঢোকে। ইরা জানালার ধারে বসে বাইরে কিছু দেখছে। একবার মুখ ঘুরিয়ে স্বামীকে দেখে নেয়। একটু হাসে। 'কী হল সাপের?' ছোট্ট প্রশ্ন করে সে।

শশাঙ্ক তার গা ঘেঁসে বসে বলে, 'ঐ যে কে এক চিনুবাবু আছে—আমি চিনিনে, সাপটাপ ধরে নাকি। ছেড়ে দাও। কাল রাতটা কিন্তু চমৎকার লাগছিল।'

'ভ্যাট্! আমার তো সারারাত ঘুমই হয়নি।' ইরা চোখ ছুঁয়ে বলে।···'জ্বালা করছে। কখন হয়তো দেখব বুকে সাপ নিয়ে ঘুমোচ্ছি।'

শশাঙ্ক ঘরের ভিতর দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলে, 'না—সিমেণ্টের মেঝেয় সাপ চলতে পারে না। তাছাড়া যথেষ্ট কারবলিক এ্যাসিড ছড়ানো হয়েছে। বাই দা বাই, বিকেলে মৌরী গ্রামের ফাংশনে যেতে হবে—মানে, তুমিই তো....'

'কী আমি?'

'প্রিজাইড করছ। যা বাব্বা! এরই মধ্যে ভুলে গেলে।'···শশাঙ্ক ইরার কাঁধ দুহাতে ধরে প্রেমিকের গলায় বলে।···'এ এক অন্য জীবন, রিয়েলি! তুমি অবশ্য নির্বাসন বলছিলে। কিন্তু কাল রাতে আমার চোখ খুলে গেছে। মুখে যাই বলি, মনে হচ্ছে জায়গাটা খুব অসহ্য না হতেও পারে। অবশ্য লোকগুলো ভীষণ বাজে এই যা।'

ইরা একটু হাসে।···'কী ছিল কাল রাতে?'

শশাঙ্ক বলে, 'প্রেম।' তারপর খুব শান্তভাবে একবার ওর ঠোঁটে চুমু খায়।

ইরা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'আমি আবার শোব। ঘুম পাচ্ছে।'

তারপর সত্যিসত্যি সে শুয়ে পড়ে এবং কাল রাতে সত্যিসত্যি কী ঘটেছিল—যাতে শশাঙ্কর মতো উচ্চাকাংখী আর উন্নাসিক মানুষের চোখ খুলে গেছে, খুঁজতে থাকে। কী ছিল কাল রাতে? চাঁদ, প্রবল হাওয়া, হাসনুহানার গন্ধ, দূরে গাছপালার কালো দেয়াল। নির্জনতা আর হৃদয়স্রাবের মতো চারিদিকে ছড়ানো নরম একটা আলো।, আর একটা আকস্মিক সাপ। কিন্তু তার জন্যে স্ত্রীর হাত ছেড়ে নিজে নিরাপদে সরে গেল কেন?

*   *   *

মৌরীগ্রাম ফাংশান থেকে ফেরার পথে মাঠের মাঝামাঝি একটা উঁচু ব্রীজ। নিচে সরু শুকনো নদী। নদীর ধারে কে কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জীপ থামিয়ে শশাঙ্ক দেখতে পায়। বিশাল নির্জন মাঠ এবং জ্যোৎস্নায় এমন ব্রীজে দাঁড়ানো কিছুক্ষণ, ইরা সঙ্গে থাকার দরুণই, অভিপ্রেত ছিল শশাঙ্কের।

এ জায়গায় ভূতের মতো দাড়িয়ে কে? শশাঙ্ক ড্রাইভারকে বলে, 'মুকুন্দ, টর্চ আছে?'

'আছে স্যার।' মুকুন্দ টর্চ বের করে দেয়।

শশাঙ্ক ডাকে, 'ইরা, নামবে না? তোমার ভালো লাগতে পারে। ইরা নামে না। গাড়ি থেকে একটু ঝুঁকে বলে, 'কী?'

শশাঙ্ক নীচে আলো ফেলেছে। একজোড়া নীল জ্বলজ্বলে চোখ ঘোরে তার দিকে। ভারি গলায় আওয়াজ আসে—'কোন শালা রে?'

মুহূর্তে রি রি করে জ্বলে ওঠে শশাঙ্ক। …'কে তুই? ওখানে কী করছিস?'
চাপা গলায় নদীর ধার থেকে জবাব আসে—'তোর বাপের তর্পণ।'

এমনি শশাঙ্ক ক্ষেপে এক দৌড়ে নেমে যায়। লোকটার গায়ের ওপর টর্চের আলো নাড়া দিয়ে বলে, 'এক ঘুঁষিতে নাক ভেঙে দেব। ডু ইউ নো হু অ্যাম আই?' মাকুন্দ, মুকুন্দ। প্রচণ্ড গর্জায় সে। 'দেখ তো লোকটা কে। নির্ঘাৎ চোরডাকাত—'

হা হা হা হা করে লোকটা হাসে। তারপর টলতে টলতে হাঁটে। রাজগঞ্জের নতুন বিডিও সায়েব হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মুকুন্দ মাঝপথ থেকে বলে, 'পাগলটাগল হবে স্যার। চলে আসুন।'

শশাঙ্ক টের পায়, পাগলটাগল হলেও আজ রাতটা পুরো স্ম্যাসড। দা ফাইন মুনলাইট গেম ইজ স্পয়েল্ড। সে ফিরে দেখে ইরা হাসিতে ভরে দিচ্ছে জীপের অন্ধকার অংশটা। ইরা হাসির মধ্যেই একবার বলে, 'অপূর্ব। ভাবা যায় না।' ফের খিল খিল হাসে। শশাঙ্কও তখন না হেসে পারে না। জীপ গড়ায়। চৈত্র-রাতের উদ্দাম হাওয়া ঝাঁপিয়ে আসে। কিন্তু শশাঙ্ক অপমানটা ভুলতে পারে না। মাঝে মাঝে তার সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে সেই নীল জন্তুচোখ দুটো। অদ্ভুত! মানুষের অস- -শ হতে পারে, জানা ছিল না।…

পরদিন সকালে তারিণী কনট্রাকটাবেব মোটরসাইকেলের শব্দ শোনা গেল। বড় রাস্তা অর্থাৎ হাইওয়ে থেকে খালের সাঁকো পেরিয়ে ব্লক চৌহদ্দীতে ঢুকছে। পিছনে আরেকজন বসে রয়েছে। মাথায় বিলিতি খড়ের টুপি, চোখে গগলস, হাতাগুটোনো বুসের বুশশার্ট গায়ে, পরনে খাঁকি ব্রিচেস মতো, কাঁধে একটা সাধারণ ব্যাগ ঝুলছে। বর্ণাঢ্য বাগিচা ও লনেব ধারে গাড়ি রেখে বাংলোর দিকে দুজনে হেঁটে এল। তারিণীর সঙ্গী ভদ্রলোকের হাতে এবার দুটো ছড়িও দেখতে পেল বিডিও সায়েব। তাহলে এই সেই চিনুবাবু—চিন্ময় ব্যানার্জি, দ্য ন্যাচারালিস্ট। শশাঙ্ক উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা কবে।

'চিনুদাকে আনলুম স্যার। অনেক বলে তারপর—আপনার অনারে।' তারিণী দাঁত বের করে।

শশাঙ্কও। দুটো হাত একটু তুলে বলে, 'বসুন।'

চিনু ব্যানার্জি গগলস খুলে সামনের বেতের সোফায় বসে, পায়ের ওপর পা এবং ছড়িদুটো উরুতে দোলায়।…'আপনি নতুন ব্লক অফিসার? বেশ। এসেই সাপের পাল্লায় পড়েছেন—হ্যা?' হাসে সে।

তখন শশাঙ্ক স্তম্ভিত। আরে আরে, এই তো সেই ক-‿-র লোকটা—সেই নীলচে চোখ, লম্বা নাক উড়ুক্কু চুল। মদে চুর হয়ে টলছিল। কী বলবে ভেবে পায় না সে। অন্তত একটা মিনিট সিদ্ধান্ত নি‿ই কেটে যায় তার। তারপর খুব শান্তভাবে বলে, এবং গাম্ভীর্যে—"কাল রাতে ব্রীজের কাছে…"

কথা কাড়ে চিনুবাবু। ভুরু কুঁচকে বলে, 'সে আপনি নাকি? রিয়েলি মিঃ

বাঁড়ও, আমার কাল রাত্তিরটা মাটি হয়ে গেছে। আই ওয়াজ জাস্ট ওয়াচিং এ্যান্ড অবজারভিং সামথিং...' এবং হাসে সে।...'ওখানে একটুকরো পাথর আছে লক্ষ্য করেছেন? তার ওপর বসেছিল ব্যাটা। সবে ঘুম ভেঙে উঠে হাই তুলছিল যেন। এ ভেরি স্ট্রেনজ এ্যান্ড রেয়ার স্পেসিমেন—এ তল্লাটে ওই একটাই আছে। প্রতি বছর ঠিক এইমাসের প্রথম পূর্ণিমায় ওকে বেরিয়ে আসতে' দেখা যায়। ইচ্ছে করেই ওকে স্লিপ দিয়েছি।'—

কাল পূর্ণিমার রাত ছিল নাকি? শশাঙ্ক খোঁজে গত রাতের দিগন্তে সেই চাঁদটা। এবং গত রাতের বাকীটুকু নিয়ে মাথা ঘামায় না।—'আপনি, তা জানতুম না।' সে সরলভাবে বলে। 'পাথরের ওপর কী ছিল বললেন? সাপ না কি?'

'হ্যাঁ। বায়ালজিকাল ফ্যামিলিনেম নাজা হান্না—গোত্র হামাড্রায়াড। আমরা শঙ্খচূড় বলি। আসলে এই হচ্ছে কিং কোবরা। পাহাড় অঞ্চলেই এর বাস। ওই নদীটা পাহাড় এলাকা থেকে এসেছে—এটুকুই যা যোগসূত্র। তিনবছর আগে এদিকে একটা বড়ো বন্যা হয়েছিল। তারপর ওকে আবিষ্কার করলুম।'

ক্রমশ তেঁতো স্মৃতিটা সরে যেতে থাকে শশাঙ্কের। লোকটাকে তার খুব ভালো লেগে যায়। চেহারায় বয়সের আঁচ পাওয়া কঠিন—এখানকার মাটির মতো। একটু সোনালি, একটু খসখসে—কিন্তু সবুজ ঘাস ও শস্যের নরমতাও আছে।... 'কী কান্ড!' গত রাতের উদ্দেশ্যে এই শব্দ দুটো ছুঁড়ে দিয়ে সে ওঠে। · 'চলুন, জায়গাটা দেখাই। আমার তেমন কোন এলার্জি নেই—আমার স্ত্রীর ভয়ে সে ঘুমোতে পারে না। গ্রাম সম্পর্কে তো ওর কোন ধারণাই ছিল না। চলুন, ফিরে এসে চা খাওয়া যাবে। আপনার গল্পও শুনব।'

লনে নেমেছে, তখন চঞ্চল ইরা এসে পড়ে। সাপধরা দেখবে। শশাঙ্ক আলাপ করিয়ে দ্যায়—রাতের ব্যাপারটা স্ত্রীর কাছে ফাঁস করেনা অবশ্য।

ইরা নমস্কার করে। চিনুবাবু কপালে হাত ছুঁইয়ে সাড়া দ্যায়। তারপব একবার দেখেও নেয় স্ত্রীলোকটিকে।...'ভয়ে ঘুম হচ্ছে না আপনার—এ্যাঁ? ও কিচ্ছু না। দেখে আসবেন আমার ঘরে কত রকম সাপ আছে। সবই অভ্যাস।'

ইরা কিছু বলেনা। স্বামীর পাশে পাশে হাঁটে। ইতিমধ্যে দুচারজন করে ভীড় বাড়াচ্ছে চারপাশের কোয়াটার থেকে। সেই ভীড়ে একটা সংহত গাম্ভীর্য থমথম করছে। অস্বাভাবিক স্তব্ধ লাগে জায়গাটা। অদূরে হাইওয়েতে যেসব গাড়ি যাচ্ছে, তাদের শব্দও এখন আর শব্দ নয়। এবং এই ভিড়ও আর ভিড় নয়। চিনু ব্যানার্জি বলে, 'সাপ থাকলে ধরা পড়বে—এটা ঠিক। আমি দেখেছি, সাপ হোক কিংবা বাঘই হোক, কোন হিংস্র জন্তু একবার কোনগতিকে প্রকৃতি থেকে ছিটকে মানুষের সীমানায় এসে পড়লে তার যেন একটা স্পর্শদোষ ঘটে যায়। তার আর ফিরে যাবার পথ থাকে না। তাকে বারবার মানুষের কাছে আসতেই হয়—যতক্ষণ না মানুষের হাতে ধরা বা মারা পড়ে।' এই বলে কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে সে হাসতে

হাসতে থোরে ইরার দিকে ।…'এই যেমন দেখুন না আমি। হ্যাঁ, আমি। প্রাণী-জগতের একঘরে দলছুট সদস্য। আমার আর ফেরার পথ নেই…ধরা পড়ে গেছি।'

'কেন?' ইরা ছোট্ট প্রশ্ন করে দীর্ঘকায় রহস্যটির দিকে—যার চোখজোড়া নীল।

তার আগেই শশাঙ্ক বুগানভিলিয়া ঝোপটা দেখিয়ে বলেছে, 'এই যে, এখানে।'

চিনু ব্যানার্জি স্থির দাঁড়িয়ে ঝোপটা দেখছে। তারিণী চাপা স্বরে ভিড়কে বলে—'সব সরে যান, সরে যান সব। খুব সাবধান!' ভিড়টা অমনি একটু দূরে সরে। কেউ কেউ পায়ের কাছটা দ্রুত দেখে নেয়। চিনুবাবুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল তারিণী কন্ট্রাক্টার, বিডিও সায়েব আর তার সুন্দরী স্ত্রী।

চিনুবাবু হাঁটু দুমড়ে ঝোপের তলায় মাটি দেখতে থাকে। দুমিনিট পরে ঝোপটার চারদিকে ঘোরে। একদিকে কাঠের খুঁটিতে কাঁটাতারের বেড়া—তার নীচে গভীর খাল। ধারের মাটিতে একটা আকন্দ গাছ। অজস্র গর্ত আর ফাটল। 'একটা কোদাল চাই।' অবশেষে চিনুবাবু জানায়।

'একটা কোদাল চাই।' শশাঙ্ক আওয়াজ দ্যায়।…'শিগ্‌গির!'

যখন চিনুবাবু গর্ত খুঁড়ছে, বুগানভিলিয়ার ঝোপটা থর থর করছে, ফুলগুলো ভীষণ দুলে উঠছে, তারিণী মিত্র ভাবছে—জায়গাটা ফের ভরাট করতে একটা টেন্ডার কল করা হবে। শশাঙ্ক উদ্দেশ্যহীনভাবে সিগ্রেট টানছে। ইরা টের পায়, তার রক্তে আগুন জ্বলছে।

হাঁটু দুমড়ে বসে থাকা পরিশ্রমী লোকটাকে দেখতে দেখতে চঞ্চলতা বাড়ে তার। দাঁতে দাঁত বসে যায়। মাটি খুঁড়ে জ্যান্ত বিপজ্জনক একটা শিকড় বের করার অভ্যস্ত ওই ভঙ্গীটা খুব প্রিমিটিভ লাগে।

আজ বিকেলের ডাকে চিঠি লিখবে ইরা।…স্বচক্ষে সাপধরা দেখলুম। বিশাল ফণা, সুন্দর সোনালি রঙের সাপটা। আর একটু হলেই ছোবল মারত—ইস্‌, ভাবা যায় না। উঁহু, চিড়িয়াখানার সাপ নয় মশাই, একেবারে দা রিয়েল থিং। আমি সাপের বিষ কখনও দেখিনি। এবার দেখতে পাব। বিষের রঙ নাকি প্রচণ্ড নীল। পরে জানাব কী রঙ দেখলুম। তুমি চলে এসো না এ কদিন। ধরো, দৈবাৎ এসে পড়েছ এখানে। তোমার তো অভ্যেস আছে ঘোরার। ও কী ভাববে? কিচ্ছু না। প্রমোশনের ভাবনায় ব্যস্ত।…

* * *

সেদিন বিকেলেই রিক্‌শা চেপে ইরা চলে গেছে চিনু ব্যানার্জির বাড়ী। 'গ্রাম-নগরী' বা রাজগঞ্জ টাউনশিপের শেষ প্রান্তে—মাঠের ধারে বাড়িটা। শশাঙ্ক গেছে দূরে কোথায় ইরিগেশান ব্যারেজ তৈরী হচ্ছে দেখতে। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

'আরে আপনি! আসুন, আসুন!'…সেকেলে প্রকাণ্ড বাড়ির গাড়ি বারান্দায় চিনুবাবু তাকে স্বাগত জানায়। চারদিকে প্রাঙ্গণে নিজের ঝোঁকে বেড়ে ওঠা দেশী-বিদেশী গাছপালা ও ফুল। বর্মী বাঁশ। শ্যাওলাধরা ভাঙ্গা পাথরের পরী। খাঁ

খাঁ জনহীনতার অগাধ নৈঃশব্দ মৃদু কাঁপিয়ে কিছু পাখি ডাকছে। ছাদ চুড়ে ঝর্ণার মতো ল্যাভেন্ডার ফুলের গাছ। বনেদী বাড়ি বোঝা যায়। হয়তো বসার ঘরটা হলঘর—যার দেয়ালে নিশ্চয় আছে সব রাজকীয় প্রতীকে গাঁথা পুরনো পুরুষদের ফুলসাইজ পোর্ট্রেট। কিন্তু কোথাও আর মানুষ নেই। একটু অস্বস্তি আসে ইরার। এমনভাবে এসে পড়া ঠিক হয় নি।

প্রাঙ্গণ ঘুরে বাড়ীর পিছনে চলে যায় চিনুবাবু। ইরা আরও অস্বস্তিতে পড়ে। আশ্চর্য, টের পায় লোকটা। একটু হেসে বলে, 'আমার চিড়িয়াখানা। আসুন! আমাকে দেখতে কেউ আসে না।'

একটা পুকুর আছে ওদিকটায়। দামে ভরা—ভাঙা ঘাটের সামনে শুধু একফালি চারকোণা পরিষ্কার জল, যেন আয়না। ডাইনের পাড়ে কাঠের ঘর কয়েকটা। লোকটার চিড়িয়াখানা।

এ আর নতুন কী? ইরার অপরিচিত কিছু নয়। নানান প্রখ্যাত জু তার দেখা আছে। সে কেবল তারের জালের মধ্যে প্রজাপতিগুলো দেখে নিয়ে বলে, 'সকালের সেই সাপটা কই?'

চিনুবাবু টেবিলের ওপর একটা মাটির হাঁড়ির দিকে আঙুল নির্দেশ করে। তারপর সুইচ টিপে বাতি জ্বালায়। ভীষণ উজ্জ্বল আলো। সে বলে, 'কৃত্রিম আলো আমার অসহ্য লাগে। কিন্তু কাজের দরুণ বাধ্য হয়ে জ্বালি।'

ইরা বলে, 'সাপটা বের করা যায় না?'

'উহু। এখনো বিষদাঁত ভাঙিনি।' …চিনুবাবু হাঁড়িটার গায়ে সস্নেহে হাত বোলায়।

'এখন ভাঙা যায় না? ইচ্ছে করে দেখতে।'

'যায়। তবে রিস্ক্ আছে। বরং কাল সকালে এলে দেখাতে পারি।'

'আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, সাপের বিষ কি ডার্ক ব্লু, নাকি…'

'ব্ল্যাক বলতে পারেন। তবে একটু নীলচে দ্যাখায় অনেক সময়।' চিনুবাবু সরে আসে।…'আসুন, এবার এই সাপগুলোর ব্যাপার বলি। এই যে একটা ভেরি পিকিউলার সাপ—লক্ষ্য করছেন?'

ইরা অবাক হয়ে বলে, 'সে কি! সাপের মাথায় চুল!'

হাসে চিনুবাবু। ‥দোজ আর প্ল্যান্টেড, নট রিয়াল। এক ব্যাটা বেদের কারসাজি। খুব পয়সা কামাচ্ছিল। আমি বোকার মতো দেড়শো টাকায় কিনে ফেললুম। তারপর কারচুপিটা ধরা পড়ল।'

'আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, সাপ ধরতে মন্ত্রতন্ত্র কী সব লাগে—সত্যি?'

'মোটেও না। আজ দেখলেন তো স্রেফ হাতের ট্রিক্স। তবে এ একটা ডেঞ্জারাস গেম—মাইন্ড দ্যাট।'

'মিঃ ব্যানার্জি, এখনও আপনার ফ্যামিলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না

কিন্তু।'

'দিস ইজ মাই ফ্যামিলি।'

ইরা হেসে ফেলে।…'না—মানে, আপনার স্ত্রী…'

'আই'ম এ ফ্রি ম্যান মিসেস রায়।'

'কেন?' অস্ফুট প্রশ্ন করে ইরা থেমে যায়।

চিনু ব্যানার্জি তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পুরনো পৃথিবীর মতো।

যে পৃথিবীর জন্যে নস্টালজিয়া আছে, কিন্তু প্রত্যাবর্তনে সুখ নেই। এই সময় কতকগুলো ভাসাভাসা ল্যাণ্ডস্কেপ সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যায় ইরার চোখের সামনে সেই পুরনো পৃথিবীর, যখন কোন প্রশ্ন ছিল না জীবনমৃত্যুর। জীবন-মৃত্যুময় বহতা সময়—যার মধ্যে ভেসে যায় বড়ো ও ছোট প্রাণীরা, উদ্ভিদ, পাখির ডিম সাপের খোলস আর নিষ্পিষ্ট ছত্রাক, তখন পৃথিবীকে খুব উদ্দেশ্যহীন করে রেখেছিল।

ইরা ভাবে, এই অদ্ভুত দৃশ্যাগুলো তার এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেন? চিনু-বাবু চুপ করে থাকবার পর দশ সেকেণ্ড কেটেছে ইতিমধ্যে। এবং আরো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ইরার মনে পড়ে যায় পার্থের স্টুডিওতে এমন অনেক ছবি সে দেখেছে। তাই তো, তাই-ই তো! পাওয়া গেছে! পার্থ একটা অদ্ভুত মুখ এঁকেছিল, নিচে ক্যাপশান দিয়েছিল: 'ফিরে যাওয়া।' পার্থ বলেছিল, 'আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে পথ এবং আমরা ক্রমশ ঘরে ফিরে যাচ্ছি। নির্বাসনের পালা শেষ। ইরা এর থেকে কিছু অনুভব করতে পারে, স্পষ্ট বোঝেনা—অর্থাৎ কবিতাকে গদ্যে সাজানোর ফলে মনের মতো যে একটা রক্তমাংস নাড়িভুঁড়ি দাঁড়ায়, সেইরকম কিছুও বুঝতে পারে না। ইরার মনে হয়, পার্থের সঙ্গে এই লোকটির কোথায় যেন সূক্ষ্ম জায়গায় একটা মিল আছে। কতকটা—একই নাজা হান্না ফ্যামিলি, গোত্র হামাড্রায়াড, আমরা বলি শঙ্খচূড়।'

আর ততক্ষণে অনেক সরে আসে চিনুবাবু। একটু হা[illegible]।…'আমি প্রথম যৌবনে দশবারোটা বছর মিলিটারিতে কাটিয়েছি জানেন তো? এর মধ্যে বছর খানেক বর্মায় ছিলুম। ফ্রণ্টে গেছি বারপাঁচেক।

ইরা শুধু বলে, 'শুনেছি।'

'যুদ্ধ আমাকে হাত-পা থেকে শেকল খুলে দিয়েছে। যে শেকল পরে আপনি—আপনার স্বামী—তাহের কন্ট্রাক্টার এবং আরও আরওমানুষ দিব্যি আনন্দে আছেন। সমাজ সভ্যতা চিৎপ্রকর্ষের রাশি রাশি জঞ্জাল! ছাড়ুন!' হঠাৎ চাপা গর্জায় লোকটা।…' একেকটা যুদ্ধের ধাক্কায় নাকি পৃথিবী খানিকটা সরে প্রগতির দিকে গড়ায়। কোথায় কোথায় কার কী প্রগতি হয়, আমি তার খোঁজখবর রাখিনা। নিজেকে দিয়েই আমি দেখি। আমার কী প্রগতি হয়েছে মিসেস রায়? আমার

গায়ে পঞ্চাশটা ক্ষতচিহ্ন। আমি···হাঁফাতে হাঁফাতে চিন্ ব্যানার্জি বলে ওঠে,··· ‘আমি আসলে একজন মরা মানুষ। আমার শরীর আছে, মন আছে—কিন্তু এর সবটাই অতীতকাল। স্মৃতি মাত্র। আমার কোন বর্তমান ভবিষ্যত নেই।

ইরা ফের অস্বস্তিতে পড়ে যায়। তবু মুখে হাসি এনে বলে, ‘বারে! বেশ তো আছেন। এতসব সাপ-টাপ ধরছেন, রীতিমতো একটা জু’এর মালিক।’

চিনু ব্যানারজি বলে, ‘শুধু অভ্যাস, মিসেস রায়। অভ্যাস আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। আমি কিছু করিনে আসলে। সাইকেলের প্যাডেল ঘোরানোর মতো।’

ইরা বালিকার মতো মাথা দোলায়।···‘ওসব ভাববেন না বরং চলুন, আপনার বাগানটা দেখি এবার। রিকশো দাঁড় করিয়ে রেখেছি—দেরী হয়ে যাচ্ছে।’

চিনুবাবু নড়েনা। কী চোখে তাকিয়ে বলে, ‘আপনি যান। আমি এখন এখানেই থাকব। হ্যাঁ, চলে যান আপনি।’

শেষ বাক্যটা একটু রূঢ়ভাবেই বলে সে। ইরা মনে মনে ‘স্রেফ পাগল!’ বলে চলে আসে।

পাছে শশাঙ্ক ক্ষুণ্ণ হয়, চিনুবাবুর বাড়ি যাওয়াটা চেপে গিয়েছিল ইরা। কিন্তু সকালে লোকটা হঠাৎ অকারণ এসে হাজির বাংলোতে এবং খুব হাসিখুসি অন্যরকম মানুষ। বিডিও এবং তাঁর স্ত্রীর সামনেই ফাঁস করে দিল কথাটা। বলল, ‘আপনিও যাবেন মিস্টার রায়। দেখে আসবেন। ইউ উইল এনজয় মাচ।’

শশাঙ্ক পলকে গম্ভীর হয়েছে। ‘হ্যাঁ চেষ্টা করব। কিন্তু যা ব্যস্ত বুঝতেই পারেন।’

তার মূল্যবান দুটো ঘণ্টা নষ্ট করে সেদিন উঠলো চিনুবাবু। কিছু বলতে পারে না শশাঙ্ক। সাপ ধরে দিয়েছে। যে-সে সাপ নয়, ভয়ঙ্কর বিষাক্ত—‘এলাপিডে’ পরিবার, গোত্র ‘নাজা’, প্রজাতির দেশোয়ালি নাম ‘গোক্ষুর।’ বিষদাঁত ভাঙ্গা হয়ে গেছে সক্কাল বেলা। বিকেলের ঠাণ্ডা আলোয় ডিটেল ছবি তোলা হবে। মিঃ ও মিসেস রায় যেতে পারেন, খুব থ্রিলিং ব্যাপার হবে।···আর স্নেকস অফ ইণ্ডিয়া নামে যে বইটা লিখছি, খানিকটা শোনাব। ভেরি ইনটারেস্টিং। অজস্র ফটো তোলাও হয়েছে।

শশাঙ্ক ইরাকে একটু তিরস্কার করবে ভেবেছিল, পারল না। শুধু বলল, ‘নতুন জায়গা। একা না বেরিয়ে বরং এইও’র বউকে সঙ্গে নিলেই পারতে।’

ইরা কিছু বলল না। শশাঙ্কর ওই রকম বলাটাই তো অভিযোগের বাড়া।

কিন্তু যত বিকেল হয়ে আসে একটা আশ্চর্য দূরের আকর্ষণ লক্ষ্য করে সে। অবচেতনে কী শুরু হয়ে যায় হুলুস্থুল। ভাল্লাগেনা—কিছু ভাল্লাগেনা, এই পচা জঙ্গলে পাড়াগাঁ, এইসব নোংরা পোষাক পরা লোক চতুর্দিকে, হাঁ করে সবাই তাকিয়ে থাকে যেন স্বর্গের অপ্সরা এসেছে রাজগঞ্জ ব্লকে। বিডিও সায়েব বেশির ভাগ সময় বাইরে জীপে ছোটাছুটি করে—ঘরে এসেও রেহাই নেই। ফাইল, দরখাস্ত,

ডেপ্রটেশান। শশাঙ্ক কী করছে, কেন করছে, অথবা কী হতে চলেছে—ইরার কাছে পরিষ্কার। প্র্বস্রীর ছায়ার চেয়ে অনেক বড়ো একটা ছায়া ফেলতে চায় এতদঞ্চলে। ইরা ব্রতে পারে, ক্রমশ তার স্বামী একটা জীবনমরণ প্রতিযোগিতায় লড়ে যাচ্ছে। আগের বিডিও যতক্ষণ না তার জ্যান্ত ম্র্তির পাশে কাকতাড়্য়াটি হয়ে পড়ছে, ততক্ষণ শশাঙ্কের ক্ষান্তি নেই। ইরার খারাপ লাগে। আস্তে আস্তে যেন মেঠো হয়ে যাচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই তীক্ষ্মধী ডিবেটার, ইংরিজীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী শশাঙ্ক রায়। দ্রন্ত অটোমোবাইল খোলস ভাঙতে-ভাঙতে ছ্যাকড়া গর্র গাড়ি হতে চায়।

আর এদিকে ইরার চুপচাপ দাঁতে ঠোঁট কামড়ানো এবং কী করে কী-করে ভাবনা। আশ্চর্য, পার্থর জবাব নেই। চিঠিফিটি পাচ্ছে না আসলে। হয়তো বোম্বে দিল্লি একজিবিশান করে বেড়াচ্ছে ছবির। ভ্যাট্, ভ্যাট্।

চিনবাব্র আসার কিন্তু ক্ষান্তি নেই। এসে দ্যাখে, বিডিও ভারি ব্যস্ত। তখন বেহায়ার মতো যেচে ইরাকে ডাকে। বাইরের ঘরে কাজ হচ্ছে—বসা যায়না। তাই পর্দার ধারে দাঁড়িয়ে কিছ্ এলোমেলো কথা এবং 'কেন যাচ্ছেন না আর একদিন, অবশ্যই যাবেন' বলে চলে যায় লোকটা। শ্ধ্ উপযাচক বলতে যা বোঝায় তা নয়—একট্ অদ্ভুত লাগে ওকে। ইরা চুপি চুপি হেসে ভাবে, বিডিও সায়েবের স্ন্দরী ভার্যার প্রেমে পড়ে গেল না তো ও ?

একদিন শশাঙ্ক বলে, 'বরং বিকেলের দিকে একট্ ঘোরাঘ্রি করলেও পারো। ভালো লাগবে। মায়া কিংবা ঝর্ণাকে সঙ্গে দিও।'

হঠাৎ ইরা বলে, 'চিন্বাব্র ওখানে গেলে আপত্তি নেই তো তোমার ?'

শশাঙ্ক প্রসন্ন হাসে।...'কিসের আপত্তি ? গেলেই তো পারো। সেবার গেলে—কিছ্ আপত্তি করেছিল্ম ?'

'কে জানে বাবা! কার মনে কী থাকে।'...ইরাও সরল হাসে...। 'জানো ? ভদ্রলোক আমার প্রেমে পড়ে গেছেন।'

শশাঙ্ক আরো জোরে হো হো করে হাসে। তারপর বলে, 'কে.। দোষ নেই। ভদ্রলোক বিষাক্ত সাপ নিয়ে কারবার করেন, নিজে কিন্তু প্রো নির্বিষ। তাই, চণ্ডীদাসী শ্দ্ধতার স্পর্শ পাবে।'

ইরা ভ্র্ কুঁচকে বলে, 'তার মানে ?'

'মাই গ্ডনেস!' লাফিয়ে ওঠে শশাঙ্ক।...'তোমাকে বলিনি ? তুমি জানোনা ?'

'না তো! কী ?

'ঔ! আই'ম ইন দা হেল অফ এ মেস! আশ্চর্য, তোমাকে বলি নি ?'

'ভ্যাট্!'

শশাঙ্ক চাপা গলায় জানায়, চিন্ ব্যানার্জি য্দ্ধের সময় অনেকগ্লো গ্লী খেয়েছিল। সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত লাগে ওর তলপেটের নিচে। অপারেশান

হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে ভদ্রলোক পুরো ইমপোটাণ্ট হয়ে ভুগছেন—আই মিন, সেক্সুয়ালি !

ইরা ক্ষেপে যায় কেন।...সেক্স-ফেক্স তুমি ভালো বোঝো। যাও, আমি কোথাও যাব না।

শশাঙ্ক বুঝতে পারে না, এ কথায় রাগের কী আছে। এবং রাতের দিকে সে বিপদের মুখোমুখি হয়। ইরার রাগটা যায় নি। অনেক সাধাসাধির পর ইরা জানায় কোয়াইট ইনসাল্টিং ! তুমি তোমার স্ত্রীকে অপমান করেছ। ইরা বিকৃত মুখে আরও বলে, 'বাঃ, কী চমৎকার সুশিক্ষিত ভদ্রলোক !' স্ত্রীকে বলছেন—অমুক লোক ইমপোটাণ্ট, অতএব—উত্তেজনায় থেমে যায় সে। পাশ ফিরে শোয়। শশাঙ্ক ক্লান্ত। ঘুমোনোর মুহূর্ত অব্দি তার সংশয় খচখচ করে, ইরা নিঃশব্দে কান্নাকাটি করছে কিনা।

তারপর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল ইরা, চিনুবাবু আর আসছে না। ঠিকই তো। ইমপোটাণ্ট হোক, আর যাই হোক মানুষ তো সে। একটা সীমানা চিনতে ভুল হবে না তার।

এক বিকেলে আরও আরও অনেক বিকেলের সেই অবচেতনার হুলুস্থুল এবং দূরের আকর্ষণ খুব স্পষ্ট হয় ইরার কাছে। এখানে সে এত একা হয়ে গেছে। আর সেইসব এবং এইসব বিকেল তাকে ব্যস্তভাবে ড্রেসিং টেবিলের দিকে টানত, খুব সাজগোজ করতে প্ররোচনা দিত, এবং বাইরে পতনশীল সূর্য দেখে আসন্ন যে অন্ধকারের জন্য চারপাশে প্রকৃতিতে অতসব ব্যস্ততা হুড়োহুড়ি—পাখির ডাক বেড়ে যায়, লোকেরা কাজ থেকে ফেরে, ঝটপট ছায়াগুলো লম্বা-লম্বা বিছানা হতে থাকে, আকাশে ঝাঁট দিয়ে জড়োকরা আবর্জনায় আগুন লাগানোর মতো দিগন্তের কাছটা হু হু জ্বলতে থাকে, ঠিক তেমনি একটি অন্ধকারমুখী গমনের জন্যে ইরার যত ছটফটানি ছিল না কি ?

সেখানে পার্থর ছবির রাজত্ব—সেই অন্ধকারে। নক্ষত্র ভরা আকাশের নীচে প্রসারিত তৃণভূমি, এক প্রজাপতি চলেছে, হঠাৎ দেখতে পায় বুকে হাঁটছে যূথভ্রষ্ট সরীসৃপের মতো খসখসে ঠাণ্ডা রঙীন নীলচক্ষু বিশিষ্ট মানুষ কিংবা মানুষ নয় —তার বুকের তলায় ভিতরের ভাঙ্গা ডিম, ছেঁড়া খোলস, শামুকের খোল, মরা কাঁকড়াবিছের কংকাল, ভিজে ঘাস শ্যাওলা ছত্রাক। গা শিউরে ওঠে ইরার। পার্থ —পার্থ তাকে কী সব দেখিয়েছিল। আর পার্থই তাকে বলেছিল, প্রকৃতির অভিধানে অনুশোচনা, শোক বা দুঃখ বলে কোন শব্দ নেই।

ইরা ভীষণ সাজে। নিজের প্রতিবিম্বটা মনে হয় দাউদাউ জ্বলে যাচ্ছে। ডিমালো ভরাট মুখের ওপর একটা আলো থমথম করে। পুষ্ট লাল ঠোঁটদুটো কাঁপে। দুই সরল নগ্ন বাহু দুটি জোরালো স্বাধীনতার মতো ছড়িয়ে থাকে। সে স্বাধীনতায় প্রকৃতিতে ফুল ফোটে এবং কীটপতঙ্গ বংশবীজ বহন করে।

বিডিওর অপ্সরা স্ত্রীলোককে নামিয়ে দিয়ে রিকশোওলা বলে, 'দেরী হবে ম্যাডাম ?'

ম্যাডাম শুনে ইরা তাকায় ওর দিকে। চোদ্দপনের বছরের ছেলে মাত্র। চেহারায় বাঙালী ভদ্র পরিবারের ছোপ আছে।

—'কোথায় থাকো তুমি ?' ইরা একটু হেসে প্রশ্ন করে।

'কলোনীতে, ম্যাডাম।'···সে আরও জানায়, 'ক্লাস এইটে পড়ি।'

ইরা বলে, 'তাই বুঝি। শোন—আমার ফেরার ঠিক নেই। তুমি অপেক্ষা করো না।'

একটা টাকা নিয়ে এবড়ো-খেবড়ো সরু পথে ফিরে যায় রিকশোটা। পথের ওপাশে ঘন গাছপালা। ওদিকে খাঁ খাঁ গ্রীষ্মের মাঠ। এপাশে চিনুবাবুর বাড়ি। ঠাকুর্দার আমলে ছোটখাটো জমিদারী ছিল নির্ঘাৎ।···

* * *

পরে সেই ছেলেটির কাছেই তোলপাড় রাজগঞ্জ ব্লক নতুন বিডিও সায়েবের স্ত্রীর সর্বশেষ খবর জানতে পারল। বলে গিয়েছিল, 'আমার ফেরার ঠিক নেই।'

তার ফলে চিনুবাবুর চিড়িয়াখানার মেঝে খুঁড়ে কিছু মাংস নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি বেরিয়ে আসে। যা নিশ্চিতভাবে সৌন্দর্য নয় কিংবা নারীত্বও নয়।

শোকার্ত 'নতুন বিডিও' খালি ভাবে সেই জ্যোৎস্না রাতটার কথা। বেড়াতে বুগানভিলিয়ার ঝোপে সাপ দেখেছিল। সেই রাতে তার স্ত্রীর মধ্যে কী একটা দেখেছিল, তখন বুঝতে পারেনি—শুধু চমক খেয়েছিল। এখন বুঝতে পারে। কিন্তু সেই স্কাউন্ড্রেল জানোয়ারটাও কি বড্ড ভয় পেয়েছিল ইরাকে ?

আগের রাতে পাহাড়ের মাথায় সারকিট হাউসের উঠোন থেকে দক্ষিণের পাহাড়-গুলো চোখে পড়েছিল। তখনই প্রোগ্রাম ঠিক হয়। জ্যোৎস্না ছিল। উঁচু জায়গায় বাতাসের বেয়াদাপিতে অস্থির রিনি খিলখিল হেসে সিলকের শাড়ি আর কখনো নয় বলতে বলতে বারান্দায় থামের আড়ালে চলে গিয়েছিল। পরে যখন ওর মুখোমুখি হই, গুম হয়ে রেগে বসে আছে ঘরের মধ্যে। বেচারীর হাল্কা ছিপ-ছিপে শরীর। পাহাড়ের চূড়োয় জ্যোৎস্না রাতে একা দাঁড়িয়ে থাকলে পরী হয়ে উড়ে যেত। এইসব রসিকতার পর ওকে জানিয়ে দিই। পরদিন বিকেলে কোথায় যাচ্ছি। কিন্তু ও শাসিয়ে বলে—পাহাড়-টাহাড়ে নয় কিন্তু। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।

সেইসময় ঘরে ঢোকেন প্রভুগোপাল। দুঁদে উকিল ওড়িশার এই হিলস্টেশনের। বাংলা মাতৃভাষার মতো বলেন। রিনির ব্যাপারটা উপভোগ করে বলেছিলেন—সব পাহাড়ে গাড়ি ওঠে না। কারণ এটার মতো ঘোরালো রাস্তা নেই। আর পায়ে হেঁটে ওঠার মানেই হয় না। আমরা সমতলে ঘুরব। ভাববেন না।

রিনিকে নিয়ে এই হয়েছে মুশকিল। মাত্র শ তিনেক ফুট উঁচু ধাপ বাঁধানো পাহাড়ের মাথায় বুড়ো রাজার মন্দিরে উঠতে গিয়ে কেলেঙ্কারি করেছিল। গায়ে শাড়ি থাকে না, এবং সায়া পালের মতো ফুলে উরুর যুগলমান্ডল ঝলমলিয়ে দেয়। তখন ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে ঝড়ে অসহায় নৌকোর মতো টালমাটাল হয়। এবং হীরাকুদ ড্যামে গান্ধীমিনারে উঠেও এই অবস্থা হয়েছিল। সুতরাং, ওর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—আর পাহাড় নয়। কথামতো বিকেলে সম্বলপুর-কটক হাইওয়ে দিয়ে যেতে যেতে রিনি ভয়ে ভয়ে দক্ষিণের পাহাড়গুলো দেখছিল। প্রভুগোপাল টের পেয়ে বললেন—শিশির ক্যানেলের ধারে থাকে ফার্ম হাউসে। ভারি সুন্দর, দেখবেন।

রিনি আমার দিকে তাকাল। চোখে প্রশ্ন ছিল। বললুম—শিশিরকে তুমি চেনো না। মেদিনীপুরের ছেলে। খড়্গপুরে আই আই টি থেকে মাইনিং পাশ করে বেরিয়েছিল। পরে চাকরি ছেড়ে চাষবাস করছে ওখানে। আমার সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ হয়েছিল গতবার।

—এতদূরে! রিনি অবাক হয়ে বলল। এতদূরে চাষবাস মানে কী?

প্রভুগোপাল বললেন—ব্যাপারটা সোজা। হীরাকুদে একটা মাইনিং প্রজেকটে শিশির ছিল। আমার গ্রাম ছিল ওই এলাকায়। ড্যাম হবার পর অনেক গ্রাম জলে ডুবে যায়। লোকেদের নানা জায়গায় নিয়ে গিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। তো আমি ওকে খবর দিলুম, ঝাঁকরপালি এলাকায় জলের দামে মাটি বিকোচ্ছে। অনেকটা কিনে ফেলেছি। তুই কিনবি নাকি? ওর মাথায় তখন চাষবাস ভর করেছে। জমি দেখে নিরাশ হল। পাথুরে মাটি। শুকনো জঙ্গলে ভরা। আমি

বলালুম—সবুর। ক্যানেল আসছে। একবছরে হীরাকুদে জল এলাকার চেহারা বদলে দেবে। তারপর ঠিক তাই হল। শিশির শেষঅব্দি চাকরি ছেড়ে দিল। এখন সে কিং অফ দা গ্রীন।

ওঁর ক্রিমরঙা এ্যামবাসাডারে আমি, রিনি আর উকিল প্রভুগোপালেরই এক উকিল বন্ধু অবিনাশবাবু আছেন। প্রভুগোপাল সামনে বসেছেন। ড্রাইভার আছে। অবিনাশবাবু বাঙালী। প্রভুগোপালের সঙ্গে যখন কথা বলছেন তখন ভাষা প্রাঞ্জল-ওড়িয়া। হঠাৎ বললেন—এনাদের শম্বরে মাংস খাওয়ানো যেত। বন্দুক আনলেই পারতে।

—এনেছি। বলে প্রভুগোপাল কেমন ধূর্ত হাসলেন। আমি রিনির দিকে তাকালাম। উভয়ে শিহরিত বলা যায়।

রিনি অস্থির স্বরে বলে উঠল—শম্বর আছে নাকি ওখানে?

প্রভুগোপাল বললেন—একসময়ে প্রচুর ছিল। আজকাল কদাচিৎ দেখা যায়। গতবছর একটা দৈবাৎ পেয়ে গিয়েছিলুম। শিশির আবার দারুণ অহিংস। মাংস খায় না, তা নয়। কিন্তু ওর কতকগুলো আইডিয়া আছে।

অবিনাশবাবু হেসে বললেন—রাতে শুয়ে-শুয়ে শম্বরের ডাক শোনা তো?

এই কথায় অকারণে গাড়িসুদ্ধু সবাই হাসল, রিনি বলল—শম্বরের ডাক কেমন?

প্রভুগোপাল তক্ষুনি নির্দ্বিধায় শুনিয়ে দিলেন—ঢাক ঢাক্। অবিনাশবাবু বললেন—উঁহু, ঢাঁ আ-ক ঢাঁ-আ-ক্! রোগা প্যাকাটি এবং গুঁফো ড্রাইভার বলল—না স্যার, এইরকম। সেও আওয়াজ দিল বার দুই। রিনি রোমাঞ্চিত হয়ে বলল—আমরা রাত্তিরে থাকছি তো?

প্রভুগোপাল বললেন, শিশির ছাড়বে না। বিশেষ করে আপনারা দুজনে আছেন। ও কী নিয়ে আছে, আদ্যোপান্ত না দেখিয়ে কোন গেস্টকে রেহাই দেয় না। আপনাদের বোরিং লাগবে। হতচ্ছাড়া তা টের পায় না। দুধারে কোথাও রুক্ষ অনাবাদী মাটি, কোথাও ঝিরঝিরে জলস্রোতের দুধারে কয়েক খাবলা ঘন উজ্জ্বল সবুজ শস্য। দূরে ও কাছে ক্ষয়াখর্বুটে পাহাড়, শুকনো খটখটে ঝোপঝাড়। কদাচিৎ আদিবাসীদের কয়েকটা কুঁড়ে ঘর। যে পাহাড়গুলো সারকিট হাউস থেকে ঘন সন্নিবদ্ধ দেখাচ্ছিল, তারা কোথায় গেল? জ্যোৎস্নারাতে দেখা সেই হাতির পাল যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। এক-একটি অবিনশ্বর অর্থহীনতা নির্জন হয়ে ছড়িয়ে আছে। তাদের ডান কাঁধে জলে গলে-গলে উপত্যকায় গড়িয়ে পড়ছে তরল ধাতুর মতো টুকরো টুকরো লাল বিকেল। ওই বিকেল-প্রবাহে হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি কোন গ্রাম্য স্ত্রীলোক ধীরে ভেসে চলেছে যেন নিরুদ্দেশে। বড় ভয়হীন ওই নির্ভরতা।

—কচ্ছপ দেখাবেন বলেছিলেন। হাত থেকে খাবার খেয়ে যায়! রিনি বলে উঠল।

অবিনাশবাবু বললেন—ওই যাঃ! ফেলে এসেছি। মন্দিরের পুকুরে আছে। খাবার নিয়ে ডাকলেই…

প্রভুগোপাল হেসে বাধা দিলেন। —গিয়ে হয়তো দেখবেন, ডাকলে আর কিছু আসে না।

রিনি বলল—কেন?

—কেন? প্রভুগোপাল হাই তুলে বললেন। থাকলে তো আসবে? মানুষের তর সইছে না। যেমন ধরুন ঝাঁকরাপালির পাহাড়গুলো। ছেলেবেলায় কত জন্তু ছিল দেখেছি। এখন পাহাড়ের গা ন্যাড়া। শুধু দক্ষিণের একটাতে গাছপালা আছে। ওখানেই শম্বর-টম্বর দু-একটা টিঁকেছে। তো অবিনাশ কী যেন বলল, ডাকলে আসে। হুঁ, ঝাঁকরাপালিতে তিন বোন আছে। আদিবাসী তিন বুড়ি। বালমতী, ফুলমতী, মালতী। ওরা ডাকলে নাকি শম্বর এসে হাত থেকে খাবার খেয়ে যায়। শোনা কথা। পরীক্ষা করে দেখিনি। শিশির বলবে শুনবেন। ও বড্ড রোমাণ্টিক।

প্রভুগোপাল ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার জন্যেই যেন হো হো করে হাসলেন।

আমি শিশিরের কথা ভাবছিলুম। হুঁ, যুবকটিকে বড্ড রোমাণ্টিক মনে হয়েছিল। এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে গেছি, ও এসে আলাপ করল। ভারি লাজুক। বড় বড় চোখ, নাকটা একটু মোটা, প্রসারিত পুরু ঠোঁট—না হাসলেও হাসছে মনে হয়। সে-হাসি নির্বোধদের শোভা পায়। অথচ ও খনি ইঞ্জিনিয়ার—কৃতী ছাত্র ছিল। দুধেখড়িসের মতো খসখসে চামড়া ও রঙ। পলকে আপন হওয়ার স্বভাব ওর। কথায় কথায় ওর এখানে পড়ে থাকার কারণ হিসেবে বলল—ওড়িশার এই জেলাটা পৃথিবীর কিছু নয়, বুঝলেন? মনে হয়, অন্য গ্রহের মাটি।

কিন্তু সেবারে ওর ফার্মে আসার সময় ছিল না। কেউ জ্যান্ত সবুজের চর্চা করছে কিংবা সোনা ফলাচ্ছে—এতে আমার আগ্রহ বরাবর কম। আমি মানুষের চরিত্রে বন্য কিছু—আদিম কিছু, কিংবা সাংঘাতিক স্বাধীনতার শক্তি দেখলে আগ্রহী হই। ওর মধ্যে অতটুকু সময়ে তা কিছু টের পাইনি। কিন্তু এবার এসে অবিনাশবাবুদের সেই একই বাঙালী ক্লাবের অনুষ্ঠানে প্রভুগোপালের সঙ্গে আলাপ হল এবং প্রভুগোপাল শিশিরের একটা গল্প বললেন। শিশির নাকি এক আদিবাসী যুবতীকে আইনানুসারে বিয়ে করেছে। নিরক্ষর সভ্যতাবোধহীন জঙ্গলের মেয়ে! প্রভুগোপাল হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলছিলেন—বুঝি না। শুনে ঘেন্নায় আমি শিশিরের ফারমে যাওয়া ছেড়েছি। ওয়াইফ না রক্ষিতা—ব্যাপারটা আসলে কী দাঁড়াল? খচ্চরটা নিছক পা—। জিভ কেটে চুপ করেছিলেন আইনজীবী ভদ্রলোক।

রিনির যা খুঁতখুঁতে স্বভাব, এটা জানাইনি। জানলে হয়তো আসতে চাইবে না, তাই। গিয়ে মুখোমুখি হলে যদি টের পেয়ে যায়, তখন রিনিকে অরণ্য জীবজন্তু ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়ে ব্যস্ত রাখব বরং। কে কী করেছে, তার জন্যে

নিজেদের সৌন্দর্যতৃষ্ণা নষ্ট করার মানে হয় না।

হাইওয়ে থেকে গাড়ি নামল কাঁচা রাস্তায়। ক্যানেলের পাড় ধরে এগোল। একটু দূরে একতালা হলুদ বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। খুব একলা ধরনের বাড়ি। ওদিকে আবছা গ্রামের আভাষ দূরে। ওটাই ঝাঁকরাপালি। একটা ন্যাড়া লম্বাটে পাহাড়ের কোলে বসে আছে। ফার্মের গেটের কাছে ওই তো সেই শিশির দাঁড়িয়ে আছে। সেই আকর্ণ টানা হাসি—নির্বোধদের যা মানায়। ওর খসখসে সাদা চামড়া একটু পোড়খাওয়া দেখাচ্ছিল। গায়ে গেঞ্জি, পরনে পাজামা, খালি পা। হাত নাড়ছে। প্রভুগোপাল ঘোষণা করলেন—খচ্চরটা দাঁড়িয়ে আছে। এ্যাদ্দিন বাদে আমাকে দেখে ভড়কে যাবে।

পাশে ভুট্টার ক্ষেত থেকে একটা প্রকাণ্ড কুকুর বেরিয়ে আমাদের গাড়ির পাশে-পাশে দৌড়ুতে থাকল। প্রভুগোপাল তার দিকে হাত নাড়তে-নাড়তে বললেন—খবর্দার! বেয়াদপি করলে চলবে না। গেষ্ট আছেন।

মনে হল, কুকুরটাকে উনি ভয় করেন।…

* * *

শিশির খুব হইচই জুড়ে দিল। প্রভুগোপাল যা যা বলেছিলেন, ঠিক তাই। খামারে হারভেস্টার কমবাইনে গম মাড়াই দেখিয়ে ভুট্টাক্ষেতে নিয়ে গেল। বিশ ইঞ্চি লম্বা ভুট্টা ফলানোর রহস্য ফাঁস করল। কিসসু বুঝলাম না। উঁচু-নীচু জমি। ধানক্ষেতের আলে অনেকগুলো এক ইঞ্চি মোটা নল সাত-আট ফুট খাড়া হয়ে আছে এবং অবিকল বর্ষার মতো চারদিক থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ক্ষেত ভাসিয়ে দিচ্ছে। এরপর নিয়ে গেল আরেকটা ধানক্ষেতে। তলায় টলটলে স্বচ্ছ জল জমে আছে। তাতে মাছ নিয়ে কী সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। তারপর কমপোসট সার তৈরিও দেখাল। বেলা ফুরিয়ে আসছিল। একটা পুকুরের ধারে নিয়ে গেল আমাদের। বলল—মাছ ধরবেন নাকি?

আমরা সবাই নেচে উঠলুম। তক্ষুনি ছিপ এসে গেল কয়েকটা এবং একদলা ময়দার টোপ। পুকুরে অসংখ্য মাছ না থাকলে এমন হয় না। অবিনাশবাবু দুটো, আমি একটা, প্রভুগোপাল তিনটে। ছোট মাছ সব। ততক্ষণ রিনিকে শিশির কী যেন বোঝাচ্ছিল। রিনি মন দিয়ে শুনছিল, আর মাথা দোলাচ্ছিল। হাল্কা লাল রোদ্দুর এসে পড়েছিল দুজনের ওপর। আচমকা অদ্ভুত একটা ধারণা এল মাথায়। রিনি যদি আমার বউ না হয়ে শিশিরের বউ হত, তাহলে কি সে বেশি সুখী হত? এইসব গোলাভরা ধান পুকুরভরা মাছ জাতীয় ভাণ্ডার এবং বিশাল আকাশ, খোলামেলা অসমতল মাঠ, জঙ্গলে সাজানো শাশ্বত স্থিরতার প্রতীক পাহাড়-পর্বতের সুখ কি বেশি আছে। গভীরতর একটা হীনমন্যতা আমাকে পেয়ে বসেছিল। আর অন্যমনস্কতায় ভাল খ্যাঁচ মিশ করলুম। মাছটা উজ্জ্বল রুপোলি রকেটের মতো উড়ে গিয়ে কালো ছায়া ভরা জলের কোথায় বিঁধল। প্রভুগোপাল

ছত্রখান জলের দিকে মর্মভেদী দৃষ্টি ফেলে বললেন—ধাঃ!

কিন্তু একটু পর পর আমার দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল ক্যানেলের ধারে উঁচুতে খামার-বাড়ির দিকে। শিশিরের 'মেয়ে মানুষ'টিকে খুঁজছিলুম। অতিথিদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রশ্নই ওঠে না, বুঝতে পারি। অবশ্য নাকি রেজিসটারড বিয়ে! হাসি পাচ্ছিল। শিশিরের ওই দিশী কুকুরটা যেমন, তেমনি কিছু কি? কিংবা মাঠঘাট জঙ্গল চাষবাস ইত্যাদি মাটির কাছাকাছি থাকার সঙ্গে আদিবাসী যুবতী নিয়ে বসবাসের মধ্যে কি শিশিরের একটা সামঞ্জস্য-সাধনের ব্যাপার আছে? ওর আদিম আবহসঙ্গীতে ওটা একটা মেঠো বাঁশির সুর হওয়াও স্বাভাবিক।

প্রভুগোপাল বললেন—এনাফ! শিশির আমি এঁকে একটু ঘুরিয়ে আনি। শিগগির ফিরব।

শিশির বলল—চা হচ্ছে গোপালদা।

—এক্ষুনি আসছি। তোমরা চলো। বলে প্রভুগোপাল আমার হাত ধরলেন। রিনির দিকে ঘুরে বললেন—আপনি যাবেন নাকি? সামান্য একটু পাহাড়ে চড়তে হবে কিন্তু।

রিনি মুহূর্তে মুষড়ে পড়ল।—থাক।

প্রভুগোপাল বুনো টাট্টুর মতো হাঁটছিলেন। কৌতূহল চেপে রাখলুম। নিশ্চয় অদ্ভুত কিছু দেখব। বেলা শেষের নিষ্প্রভ সবুজ ধানক্ষেত, পোড়ো জমি আর ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে গিয়ে দেখি সেই পুবের পাহাড়ের ধারে চলে এসেছি। ডাইনে একটু তফাতে ঝাঁকরপালি গ্রামের প্রথম বাড়িটা চোখে পড়ল। কুয়ো থেকে মেয়েরা জল তুলছে। ওদিকে গেলেন না প্রভুগোপাল, সোজা নাক বরাবর হেঁটে পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেলেন। একটু উঁচুতে কয়েকটা জীর্ণ কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছিল। প্রভুগোপাল আঙুল তুলে বললেন—ওখানে যাচ্ছি আমরা।

বাইরের দাওয়ায় বসে ছিল তিন বুড়ি। তেমনি বিকট রাক্ষুসী চেহারা। নির্বিকার দৃষ্টি পলকহীন। তোবড়ানো গালের ওপর দেখতে দেখতে রোদ্দুর মুছে গেল। নিজের অজান্তে আকাশ দেখে নিলুম। মেঘ-ঝড়-বৃষ্টির আভাস আছে কি কোথাও? ম্যাকবেথের তিন ডাইনী অবচেতনায় এসে জুটেছে শেষবেলার নির্জন মাঠে। হোয়েন শ্যাল উই মিট এগেন / থানডার লাইটিং অর ইন রেইন /···

বালমতী ফুলমতী মালতী। প্রভুগোপাল ঘোষণা করলেন।

তাহলে এরাই তারা, যাদের ডাকে পাহাড়ী জঙ্গলের শম্বর আসে। প্রভুগোপাল ওদের সঙ্গে আমার অজানা ভাষায় কথা বলছিলেন। ওরা তেমনি নির্বিকার তাকিয়ে আছে। মুখগুলো দক্ষিণের পাহাড়ের দিকে ঘোরানো। প্রভুগোপাল আমাকে দেখিয়ে কী বললেন। তাই ওরা একবার আমাকে ঘুরে দেখে নিল। চাহনি দেখে বুক কাঁপল। তারপর দেখি, হঠাৎ তিন বুড়ি হেসে উঠল। হাসতে হাসতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছিল ওরা। প্রভুগোপাল আমাকে চোখ টিপে কী যেন

বোঝাতে চাইলেন। তারপর পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে একজনের হাতে দিলেন। সে নোটটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে আরেকজনকে দিল। এভাবে তিনজনেই নোটটা দেখাদেখি করতে থাকল। ততক্ষণে আলো কমে ধূসর হয়ে এসেছে।

প্রভুগোপাল আরও কী সব বলে আমার হাত ধরলেন—চলে আসুন।

মাঠের মাঝামাঝি এসে কাঁচা রাস্তায় প্রভুগোপাল চাপা হেসে বললেন—দশ টাকায় সম্ভবত শেষ শম্বরটা বায়না দিলুম। যদ্দূর জানি, দক্ষিণের ওই পাহাড়ে আর একটাই আছে। আমার ইনফরমেশন ভুল হয় না।

আমি হতভম্ব। বললুম—ওরা ডাকলে সত্যি শম্বর চলে আসে?

—হ্যাঁ। শুনতে অবাক লাগছে, কিন্তু বাস্তবিক। গাড়িতে তখন অবিনাশ ছিল, তাই শিশিরের নামে নিছক গল্প বলে চালিয়ে দিলুম। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা ঘটেছে, মশাই, মিরাকল বলুন। মিরাকল এবং আজ রাতে আপনি স্বচক্ষে দেখবেন। কিন্তু প্লীজ, ওদের টাকা দেওয়ার কথা যেন কাকেও বলবেন না।

* * *

ফারমহাউসে এসে দেখি বিদ্যুতের আলোর সভ্যতা যেন এতদূরে এসে দাঁত বের করে হাসছে। এতক্ষণ অন্ধকার ও আদিম পরিবেশের পর ব্যাপারটা বিসদৃশ লাগল। আসতে আসতে দেখছিলুম পুবের পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠে এসেছে শিগগির। তারপর হঠাৎ এত আলো, ঝলমলে রঙীন শাড়ি পরা রিনি, অবিনাশ-বাবু এবং শিশির ইত্যাদি চোখে বিঁধছিল কাঁটার মতো।

কুকুরটা উঠোনে গমের শীষের ওপর নাচানাচি করছিল। প্রভুগোপাল সাবধানে তাকে এড়িয়ে ঘরে ঢুকেছেন। শিশির বলল—এত দেরী?

প্রভুগোপাল বললেন—গ্রাম দেখতে চেয়েছিলেন। ঝটপট কিছুটা দেখা হল। অবিনাশ বললেন, আমার থাকা হবে না গোপাল। তুমি তো থাকছ?

—হুঁ। বন্দুক এনেছি। দেখি, কিছু জোটে নাকি।···প্রভুগোপাল শিশিরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তাহলে অবিনাশ, থাকবে না বলছ? ঠিক আছে। ড্রাইভার তোমাকে পেঁাছে দিয়ে আসুক। অবিনাশ উঠলেন। প্রভুগোপালের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। শিশির বলল—কেমন লাগল দাদা? বউদির তো দারুণ লাগছে। তাই ভাবছি, কাল একটা প্রোগ্রাম করব। জঙ্গলের দিকে···

হঠাৎ দেখলুম, বাইরে বারান্দায় কে দাঁড়িয়ে আছে। আলো কম। আবছা দেখা যাচ্ছিল। স্ত্রীলোক বলেই মনে হল। ভাল করে দেখার আগে শিশির দ্রুত বেরিয়ে গেল এবং বাইরে চাপাগলায় কিছু বলল। ফিরে এল যখন, তখন বারান্দা খালি। রিনি বোকার মতো বলল—কী?

শিশিরের চেহারায় একটা অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠেছে। শুকনো হেসে বলল—কিছু না।

আমি টের পেয়েছি বাইরে কে এসেছিল। মনে মনে হাসলুম। শিশিরের চাষবাস বা বিজ্ঞান-সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা খুটিয়ে অতিথিদের দেখানোর সাহস আছে, কিন্তু তার নিরক্ষরা আদিবাসী বউকে অতিথিদের সামনে এনে পরিচয় করানোর সাহসটা নেই। একথাটা খুলে বলারও সাহস কোথায়? তার মানে, ওই দিশী কুকুরটার মতো প্রয়োজনে মেয়েমানুষ পুষছে। কুকুরটার কথাও অবশ্য বলা যায়। একথাটি বলা যায় না। তাই তো?

আবার বারান্দায় পায়ের শব্দ হল। অমনি শিশিরও ঘুরল। আর রিনি বলে উঠল—মেয়েটিকে ডাকুন না, আলাপ করি। তখন থেকে দেখছি, বার বার আসছে। উঁকি দিচ্ছে।

আমিও বললুম—ডাকো, শিশির।

শিশির মাথা নীচু করে বলল—দাদা!

—সব শুনেছি। ডাকো।…তবু সে ডাকল না দেখে রিনিকে বললুম—শিশিরের বউ। তুমি নিয়ে এসো ডেকে।

রিনি চোখ বড় করে তাকাল। তারপর হাসিমুখে বেরোল। শিশির কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে রিনি একটি আদিবাসী মেয়ের হাত ধরে টেনে আনল। সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরা স্বাস্থ্যবতী কালো কুচকুচে মেয়ে। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলুম।

শিশির কে জানে কেন, অস্ফুটস্বরে ইংরেজিতে বলল—শি ইজ ব্লাইন্ড।

অন্ধ! রিনিও চমকে উঠে ওর মুখের দিকে তাকাল। মেয়েটির ঠোঁটে হাসি। নিঃশব্দে হাসছে। তার একটা হাত রিনির কাঁধে আস্তে নড়ছে। যেন পরখ করে দেখছে রিনিকে।

শিশির আমার পাশের চেয়ারে বসে বলল—এখানে আসার পর ওকে দেখি। আমার ফারমে এসে কাজ চাইত। বাবা-মা কেউ নেই। অন্ধ্র থেকে ওর বাবা-মা এসেছিল এখানে মরশুমে ফসল কাটতে। কলেরায় মারা যায়। যাই হোক, শেষ অব্দি ডিসিশানটা নিলুম। জাস্ট কমাস আগে।

ওর কাঁধে হাত রেখে বললুম—খুব খুশি হয়েছি, ভাই। আশীর্বাদ করছি। এই সময় প্রভুগোপাল এলেন। এসেই ভুরু কুঁচকে গম্ভীর মুখে বললেন। শিশির বলল—ব্যাপার কী গোপালদা?

প্রভুগোপাল বললেন—ধুর! বালমতীদের কাণ্ড! তোমাকে বলিনি। ওদের টাকা দিয়ে শম্বর ডেকে মারব ভেবেছিলুম। ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি। আগেও এমন করেছি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। কিন্তু এইমাত্র ওরা টাকা ফেরত দিয়ে গেল। মালতীটা বড় পাজি মেয়ে।

বলল—একটা শম্বর ছিল পর্বতে। সে চাঁদে পালিয়ে গেছে। বলে আমাকে চাঁদের গায়ে শম্বরটা দেখিয়ে দিল।

একথা শুনে হাসতে হাসতে আমরা সবাই, অন্ধ মেয়েটাকে নিয়েই চাঁদ দেখতে বেরোলুম।

অনেকদিন পরে হঠাৎ শ্রাবণীর ফোন পেয়ে খুব চমকে গেলুম। প্রথমে তো বিশ্বাস করতেই পারিনি শ্রাবণী আমাকে ফোন করবে। ধাতস্থ হতে খানিকটা সময় লাগল। তারপর ভরাট কেজো গলায় বললুম, 'বলো, শ্রাবণী!'

মিঠে আওয়াজ এল—'আজ বিকেলে তোমার সময় হবে?'

'কী ব্যাপার?'

'তোমার সঙ্গে ভীষণ, ভী-ষ-ণ একটা জরুরী কথা আছে।'

এখন লক্ষ্য করলুম, আমি খুব একটা আনন্দ পাচ্ছি না। বরং কেমন একটা চাপা উদ্বেগ মনের ভিতর গর গর করে উঠেছে। একটু বিচলিত বোধ করছি এই ভেবে যে যদি সত্যি-সত্যি শ্রাবণীর সঙ্গে আজ বিকেলে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করি, তাহলে বেচারী ইরা আমার স্ত্রী ইরাকে না জানি কতক্ষণ মেট্রোর সামনে পথ চেয়ে তাকাতে হবে! ছ'টার আগেই শ্রাবণীর হাত থেকে মুক্তি নিতে পারব তো?

বললুম, 'শ্রাবণী, কথাটা এখন বলা যায় না?'

ওপার থেকে শ্রাবণীর হাসি ভেসে এল।—'না। তুমি কার্জন পার্কে ক্যাকটাস ঝোপটার কাছে গেলেই আমাকে দেখতে পাবে। আচ্ছা, ছাড়ছি তাহলে। কেমন?'

বলেই সে ফোন ছেড়ে দিল। কোন কথা বলার সুযোগও দিল না। আমি খানিকটা দ্বন্দ্বে পড়ে গেলুম। শ্রাবণীর প্রতি আমার দারুণ মোহ একসময় ছিল, এটা ঠিকই। খোলাখুলি বলতে গেলে আমাদের মধ্যে পরস্পর প্রেমজাতীয় একটা কড়া ব্যাপার নিশ্চয় ছিল। হয়তো সেই প্রাক্তন ব্যাপারটার জোরেই শ্রাবণী অল্প কথায় ওই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট সেরে নিল। সে ধরে নিল যে আমার পক্ষে এর খেলাপ করা একান্ত অসম্ভব হবে। মেয়েরা কেন এত বোকামি করে!

শ্রাবণী তো ভালই জানে, আমি একদা তার আশা ছেড়ে দিয়ে ভাল ছেলের মত বিয়ে করে ফেলেছি। ইরাকে সে দেখেছেও। তার চেয়ে সুন্দরী আর স্বাস্থ্যবতী পাত্রী ইরা। তাছাড়া বিয়ের পর শ্রাবণীর কাছ থেকে আমি পুরো সরে গেছি। এ ছ'মাস আমাদের আর দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে হয়নি। তবু আজ হঠাৎ শ্রাবণী আমাকে এমন কী জরুরী কথা বলতে চায়, ভেবে পেলুম না। আস্তে আস্তে উদ্বেগটা আমাকে আড়ষ্ট করে ফেলল। একবার ভাবলুম, থাক—ওর সঙ্গে দেখা করব না। আবার মনে হল, এটা খুব অভদ্রতা হবে। ও ভাববে, ওকে বউ করা হয়নি বলেই আমি ভীষণ চটে আছি। নিজেকে অমন স্বার্থপর দেখানোর সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না।

অফিসের দেয়ালে গোল ঘড়ির ছোট কাঁটা যত পাঁচের দিকে এগোল, শেষে দেখলুম—ততে একটা হালকা চাপা লোভ আমার মধ্যে জাগতে লাগল। অনেকদিন দেখিনী শ্রাবণীকে। তার সেই ডিমালো মুখ, টানা ভুরু, চিবুকের তিলটা মনে পড়ল। আমার কষ্ট হল। ইরাকে পেয়ে আমি সুখী হয়তো—কিন্তু শ্রাবণীকে পেলে আরও কিছু তো পেতুমই! একটার পর একটা স্মৃতি আমার চেতনার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, আমাকে আরও বেশি কষ্ট দিতে থাকল। অমন আশ্চর্য হাসি কি ইরা হাসতে জানে? এক কথা বলতে-বলতে হঠাৎ দুম করে অন্য কথায় গিয়ে পড়ার মত সুন্দর অন্যমনস্কতাও তো ইরার নেই। ইরা মেপে ওজন করে কথা বলে। ইরার মধ্যে শুধু একজন নিপুণা গৃহিণীর আদল আছে। শ্রাবণী ছিল নায়িকা। তার পৃথিবীটা নিতান্ত কমার্শিয়াল ছিল না।

নিজের অজানতে দুটো মেয়েকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তুলনা করছিলুম। একসময় দেখলুম শ্রাবণীই শ্রেষ্ঠা। তখন শ্রাবণীর জন্যে হু-হু করে পুরনো প্রেমের আটকানো জলরাশি বাঁধ উপচে পড়তে দেখলুম। কার্জন পার্কের ক্যাকটাস গাছটার দিকে হন-হন করে এগোতে থাকলুম। যেন আজ এই বিকেলে এক অসমাপ্ত ধামাচাপা-দেওয়া মামলার নথি উঠবে এবং রায় দেওয়া হবে।

শ্রাবণী রেলিঙের কাছে ঘাসের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি যে আসবই, সেই নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ওর মুখে উজ্জ্বল দেখতে পেলুম। এখন ভাবলুম, মেয়েরা অত বোকা নয়। কিন্তু কেমন যেন পাংশুটে হয়ে গেছে ওর চেহারাটা। গায়ের রঙ শুকনো, চোয়ালের মাংস অনেকটা কমেছে, কোন অসুখ-বিসুখে ভুগেছে নাকি? আমাকে দেখে ঘাসে বসে পড়ল শ্রাবণী। তারপর ঠোঁটে হাসি নিয়ে ঘাস ছিঁড়তে থাকল।

বললুম, 'তারপর—কেমন আছ, বল?'

শ্রাবণী মুখ তুলল। '···ভাল। তুমি?'

'চলে যাচ্ছে।···'বলে সিগ্রেট ধরালুম। '····তা শ্রাবণী, তুমি যেন খানিকটা রোগা হয়ে গেছ।'

'ও কিছু না।'··· শ্রাবণী জবাব দিল। তার মুখে এখন আর সেই হাসিটা নেই। কী একটা গাম্ভীর্য থম থম করছে। অবাক লাগল। অনর্গল হাসি আর কথায় কেন সে মুখর হচ্ছে না আগের মত?

কিন্তু কী বলবে শ্রাবণী? কৌতূহলে এবং যেন কী অসঙ্গত গোপন লোভে আমার মধ্যে অস্থিরতাটা আবার বেড়ে গেল। কিন্তু ও নিজে থেকে না তুললে আমার চুপ থাকাই ভাল। বললুম, 'তোমার মা কেমন আছেন?'

শ্রাবণীকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বলল, 'তেমনি। অসুখটা বাড়ছে-কমছে। মধ্যে হাসপাতালে ছিলেন একমাস। ভাবলুম, সেরে গেছেন। হঠাৎ আবার বেড়ে

গেল। খয়রাতি চিকিৎসায় কী হবে, সে তো জানা।'

'কোন নার্সিংহোমে স্পেশালিস্টের কাছে রাখলেও পারতে।'···পরামর্শ দিলাম।

'আমার জানাশোনা একজন আছেন। ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

শ্রাবণী শুধু হাসল মাত্র।

'আচ্ছা শ্রাবণী, রুণুর খবর কী? এখনও রাজনীতি করছে-টরছে নাকি?'

শ্রাবণী বাঁকা ঠোঁটে বলল, 'কে জানে কী করছে!'

বললুম, 'অবশ্য ওর দোষ কী! কলেজেও যা অবস্থা চলছে আজকাল। কিস্যু পড়াশোনা হয় না।'

শ্রাবণী বলল, 'কিন্তু মাইনেটা ঠিকই লাগছে।'

'হ্যাঁ,—তা তো ঠিকই। আচ্ছা, তোমার ছোটবোন গতবার কী পরীক্ষা দিল যেন?'

'হায়ার সেকেন্ডারি।'

'কলেজে ভর্তি হয়েছে তো?'

'নাঃ। পারলুম না।' ···বলে শ্রাবণী আবার হেসে উঠল। '···যাক্ ওসব কথা। চারপাশে শত্রু নিয়ে জন্মেছিলুম, সারাজীবন শত্রু নিয়েই কাটবে। সেটা তো কেউ দেখতে পায় না।'

একটু চুপ করে থেকে বললুম, 'শ্রাবণী, আমি কিন্তু দেখতে পেতুম। পেতুম বলেই বলেছিলুম, সব লড়াই আমাকেই করতে দাও—তুমি আড়ালে থাক। কিন্তু তুমি···'

শ্রাবণীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল পলকে।···'আবার সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে তোমাকে ডাকিনি।'

'তবে কেন ডেকেছ, শ্রাবণী?'

শ্রাবণী সহজ হল পরক্ষণে। ঠোঁটে হাসি মেখে বলল, 'দিব্যেন্দু ঘোষের সঙ্গে তো তোমার আলাপ আছে—তাই না?'

প্রথমে তত চমকাই নি—বললুম, 'হ্যাঁ। ও আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। কেন?'

'উনি রয় এ্যান্ড বার্নাডের পি-আর-ও না?'

'হ্যাঁ। কী ব্যাপার?'

শ্রাবণী কয়েক মিনিট কোন জবাব না দিয়ে রাস্তা দেখতে থাকল। তারপর বলল 'গত মাসে আমার চাকরি গেছে, জানো?'

এবার চমকে উঠলুম।···'সে কী!'

'হ্যাঁ—চাকরিটা গেছে। কাগজে সব বেরিয়েছিল—তোমার নিশ্চয় জানার কথা। পড়নি যে একটার পর একটা প্লেন কোম্পানি কলকাতা ছেড়ে দিল্লী বম্বে গিয়ে উঠল? কাজেই কয়েকশো লোকের চাকরি গেল। কলকাতা এয়ারপোর্ট আর ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্ট নয় এখন—শোননি?'

আশ্চর্য, এসব খবর তো আমি পড়েছিলুম কাগজে! এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছিল। অথচ—আশ্চর্য আশ্চর্য! শ্রাবণীরও তাতে চাকরি গেছে, একটুও খেয়াল করিনি। আসলে এ ক'মাস সে আমার মন থেকে যেন মুছে গিয়েছিল—ইরাকে অতি প্রযত্নে ফাঁকা দেয়ালে সোনালী ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিলুম। এখন শ্রাবণীর জন্যে আমার মায়া হল। রুগ্না মা, আরও দুটো ভাইবোন, একটা মস্ত সংসার আর জীবনযাত্রার বোঝা তার কাঁধে!

সেদিন মনে-মনে তার ওই চাকরিটার মুণ্ডুপাত করতুম। কারণ, মনে হত—আসলে অমন ভাল একটা চাকরিই যেন শ্রাবণীকে কারো ঘরের বউ হতে দিচ্ছে না। আমি বিয়ের প্রস্তাবই শুধু দিইনি—ওর সংসারের দায়িত্বও নিতে চেয়েছিলুম। শ্রাবণী রাজী হয়নি। বলেছিল, 'বা রে! তুমি দায়িত্ব নেবে কেন? আর মা তাতে রাজী হবেন না।' বলেছিলুম, 'বেশ—তুমি তো চাকরি করছ। তুমি যেমন চালাচ্ছ, তেমনি চালিয়ে যাবে। তারপর রুণু পাস করে চাকরি-বাকরি পেলে···' শ্রাবণী বাধা দিয়ে বলেছিল, 'সেটা হয় না। আমি বিয়ে করে বসলে মা ভাববেন, আমি ওঁদের দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছি স্বার্থপরের মত। এ বয়সে মা মনে কষ্ট পাবেন কিংবা ভুল বুঝবেন—সে আমি চাইনে। তাছাড়া তুমি জানো না, মা বড্ড জেদী আর সেণ্টিমেণ্টাল মানুষ।'···যাই হোক, শ্রাবণীর সঙ্গে আমার বিয়েটা হয় নি। এবং হয়তো সেই ব্যর্থতার দুঃখ ভুলতে আমি হট করে ইরাকে খুঁজে নিয়ে বিয়ে করে বসেছিলুম। অবশ্য, আমারও একটা জরুরী কারণ ছিল বিয়ে করার। উত্তর-তিরিশের নিঃসঙ্গতাবোধটা খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল—শ্রাবণীর সঙ্গে প্রেমটা এর মূলে। আমার স্বভাবে এই ব্যাপারটা আছে—যা কিছু চাই, দ্রুত পুরোপুরি হাতের মুঠোয় চাই—তা না হলে স্বস্তি থাকে না।

আজ শ্রাবণীর এইসব খবর শুনে যেমন খারাপ লাগল, তেমনি দমে গেলুম। এ বাজারে চাকরি গিয়ে ওরা কী ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়েছে বুঝতে পারছিলুম। চাকরি! মাসান্তে কিছু টাকা! অথচ এই দিয়েই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। রূপ-সৌন্দর্য হাসি আনন্দ কিংবা আধিব্যাধিহতাশাদারিদ্র্যদুঃখ।

দিব্যেন্দু—সত্যি বলতে গেলে, আমার খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি জানি, সে আমার কথা ঠেলতে পারবে না। সে উঁচুতলার মানুষ এখন, তার মাইনে আমার চার-পাঁচ গুণ বেশি, তার গাড়ি আছে—আমি সামান্য ইউ ডি কেরানী। তাহলেও দিব্যেন্দু আমার সঙ্গে ছেলেবেলার মতই ব্যবহার করে। বরং আরো বেশি খাতির করে যেন। আমি জানি, সে ইচ্ছে করলেই আমাকে তার আপিসে একটা উৎকৃষ্ট চাকরি দিতে পারে—কিন্তু তাতে আমারই আপত্তি আছে। কারণ, বন্ধুর অধীনে চাকরি করা আমার পক্ষে যেমন, তার পক্ষেও সমান অস্বস্তিকর।

হ্যাঁ, শ্রাবণীর চাকরিটা হয়ে যাবে আমি বললেই। দিব্যেন্দুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের খবর শ্রাবণী বরাবর জানত। তাই সে ঠিক জায়গায় এসে বোতাম

টিপেছে।…

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে শ্রাবণী বলল, 'কী ? কথা বলছ না যে ?'

মুখ তুললুম। নির্ঘাৎ আমার মুখ একটা কারণে হঠাৎ সাদা হয়ে উঠেছিল।

শুকনো হেসে শুধু বললুম, 'আচ্ছা—দেখছি।'

শ্রাবণী বলল, 'দেখছি নয়। এটা তোমাকে করে দিতেই হবে। তা না হলে…'

'তা না হলে…' শ্রাবণী হঠাৎ বলে উঠল—'সুইসাইড করা ছাড়া আমার পথ নেই।'

'শ্রাবণী ! ছিঃ !'

দেখলুম, শ্রাবণীর চোখ ভাসিয়ে জল আসছে।…

শ্রাবণীর কথা শুনে আমার মুখ সাদা হয়ে উঠেছিল—একটা কারণে। শ্রাবণী ঠিক জায়গায় বোতাম টিপল। কিন্তু হায় শ্রাবণী, মূল যন্ত্রটা বিগড়ে বসে আছে তুমি জানো না। ইরা—আমার স্ত্রী ইরার জন্যে দিব্যেন্দুর আপিসের ওই চাকরিটা পাইয়ে দিতে আমি ব্যস্ত।

ক'দিন আগে দিব্যেন্দুর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যা ছ'টায় ইরাকে নিয়ে আমার দিব্যেন্দুর কাছে যাওয়ার কথা। দিব্যেন্দুর সঙ্গে ফোনে যথারীতি অ্যাপয়েন্টমেন্টও হয়ে গেছে। লেডি রিসেপসনিস্টের পদে ইরাকে ভালই মানাবে। দিব্যেন্দুর দেখলেই পছন্দ হয়ে যাবে, আমার বিশ্বাস।

আর শ্রাবণী হঠাৎ এসে আমার সামনে দাঁড়াল। শ্রাবণীও মোটামুটি সুন্দরী—খুব সাধারণ মেয়ে নয়, ব্যক্তিত্ব আছে, শিক্ষা-দীক্ষা আছে। তাছাড়া ও-কাজে তার অভিজ্ঞতা আছে কয়েক বছরের। চমৎকার ইংরেজি বলতে পারে।

দুটি মেয়েই সর্বদিক থেকে তুল্যমূল্য। বরং শ্রাবণীর যোগ্যতা একটু বেশি—কারণ, তার অভিজ্ঞতা আছে।

কিন্তু ইরা আমার স্ত্রী।

ইরা আমার ঘরে আসার পর আমাকে আর আমার ঘরটাকে অনেক স্বপ্ন সাধ আকাঙ্ক্ষায় ভরে ফেলেছে। দেখাদেখি আমিও একেকটা অদৃশ্য আসবাবের মত স্বপ্ন দিয়ে-দিয়ে বাকি শূন্যস্থানগুলো ভরে দিয়েছি। ইরার মাথায় প্রথমে এই প্ল্যানটা এসেছিল। আজকাল শুধু একা স্বামীর আয়ে সংসারের শ্রী বাড়ানো যায় না—স্ত্রীর আয় জুড়লে সেটা সম্ভব হয়। বিয়ের আগে ইরার চাকরি করার দরকার হয়নি। 'কিন্তু এখন'…ইরা বলেছিল,…'এখন তো পাকাপাকি ভাবে ঘরকন্নায় বসে গেলুম। যেমন তেমন ভাবে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না।' তারপর সে একে একে রীতিমত একটা পাঁচশালা যোজনা দাখিল করে আসছে। এ দুকামরার ফ্ল্যাটে আর চলে না। কিচেনটা ছোট। একটা ডাইনিং স্পেস চাই—পুরোপুরি ঘর হলেই চমৎকার হয়। অতএব শিগগির তিন কামরার ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়া দরকার।

একটা ফ্রিজ চাই সবার আগে। একটা রেডিওগ্রাম না হলে তো চলেই না। তারপর ফোন। আর, এইসব ফার্নিচার বদলাতে হবে। দরজা-জানলার পর্দাগুলোয় থাকবে সমুদ্রের সুগভীর নীলাভাস। ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠবেই একটা সবুজ মৃদুভাষী গাড়ির প্রয়োজন। ততদিনে কিন্তু ছেলেপুলের কোন কথাই ওঠে না। বেডরুমটা এয়ারকণ্ডিশনড করলে খুব বেশি কী খরচ হবে! তারপর মাঝে মাঝে উইকএণ্ডে আমরা সবুজ গাড়িটা নিয়ে চলে যাব কোন নির্জন সমুদ্রসৈকতে, কোন স্নিগ্ধ পাহাড়ের পাদদেশে, কোন নির্ভয় অরণ্যসীমায়—আদিবাসীদের কাছে রঙীন পাথরের মালা কিনবে ইরা, তার দুচোখে মায়াবী গগলস এবং পিঠের কাছে গাড়ি!…

সত্যি বলতে কী, সারাদিন ধরে একা ঘরে অস্থির ঘোরাঘুরি করে এইসব স্বপ্ন কুড়িয়েছে মুঠো মুঠো, এবং সারারাত আমাকে ফিসফিস করে মন্ত্র দিয়ে গেছে। তারপর থেকে অনেকদিনের নিশ্চিন্ত আরামদায়ী তৃপ্তিকর আমার এই ফ্ল্যাটটা আমার চারপাশে কাঁটাওয়ালা একটা বিদঘুটে সজারু হয়ে উঠেছে। একটু নড়াচড়া করতেই খোঁচা লাগে। অস্থির হয়ে মনে মনে বলি, এখানে আর নয়—অন্য কোথাও!

কিন্তু তার মানে মাসে আরো অন্তত একশো-দেড়শো টাকার খরচ-খরচা, শুধু ফ্ল্যাট বদলেই। একটা তিন কামরার চমৎকার ফ্ল্যাট গত রোববারে আমরা দুজনে দেখে এসেছি। এখন দুজনে লোভে ছটফট করছি নিরন্তর। শিগগির ওটার জন্যে এ্যাডভান্স দিয়ে আসা দরকার। দিব্যেন্দুর কাছ থেকে ফিরেই, কথা আছে—আমরা বাড়িওলা ভদ্রলোকের কারখানায় হাজির হব।

এবং এই আসন্ন সুন্দর ভবিষ্যতের ধবধবে সাদা পর্দায় হঠাৎ এখন ভেসে উঠল শ্রাবণীর বিশাল কালো ছায়া—ক্ষুধার্ত।

শ্রাবণী একটু পরেই চলে গেল। আমি ইরার উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ ক্লান্ত আর হতাশভাবে ধুপ করে বসে পড়লুম আবার। আমার পাশ দিয়ে চাওলা-বাদামওলারা সন্দিগ্ধ স্বরে হেঁকে গেল কতবার। রাস্তার ছেলেদের ক্ষুদে বল লাফিয়ে কোলে পড়ল। আমি বোকা-বোকা হেসে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলুম। কে পিছন থেকে ভারি গলায় বলল, মালিশ, মালিশ! কে সামনে এসে আদুরে স্বরে বলল, পালিশ, বাবু পালিশ! আমি শুধু নিঃশব্দে হাসলুম…

ইরা এই চাকরিটা পেলে আমার তিনকামরা ছিমছাম আধুনিক ফ্ল্যাট হয়, ফ্রিজ রেডিওগ্রাম ফোন গাড়ি নিয়ে সভ্যতা আস্তে আস্তে সেই ফ্ল্যাটের দিকে এবং সিঁড়ি বেয়ে বুড়ো খৃষ্টমাস ফাদার সান্টাক্লজের মত উঠতে থাকে…

শ্রাবণী এই চাকরিটা পেলে তার রুগ্না মা নার্সিংহোম এবং পরে কোন স্যানিটোরিয়ামে যেতে পারেন, রুণু ও ঝুনুর পড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, এবং তার চেয়েও বড় কথা, ওরা সবাই খেতে ও পরতে পায়—যা ছাড়া মানুষ বাঁচে না।…

যা দেখেছি, ইরা ওই চাকরির খবর পাওয়া মাত্র মরীয়া হয়ে উঠেছে। বাঘিনীর মত হাই তুলে একহাত জিভ বের করেছে, টপটপ করে লালা ঝরছে, কী ভয়ঙ্কর তার চেহারা।

আর, এখন টের পেলুম, শ্রাবণীও দারুণ মরীয়া হয়ে উঠতে পারে।

দুজনেই সম্ভবত আমার তোয়াক্কা না করে শেষ অবধি দিব্যেন্দুর কাছে হানা দেবে—তাতে কোন ভুল নেই। দিব্যেন্দুটা আমার বন্ধু হলে কী হবে, মেয়েদের ব্যাপারে ওর কোন সীমারেখা নেই। হ্যাঁ, আমি ভালই জানি—দিব্যেন্দু একটা লোচ্চা প্রকৃতির মানুষ। সেজন্যে আজ অবধি বিয়ে করেনি। প্রচুর মদ খায়। নাইটক্লাবে যায়। গাড়িতে মেয়ে নিয়ে ঘোরে।

ছ'শো টাকার অমন উৎকৃষ্ট চাকরিটা পেতে ইরা বা শ্রাবণী কতদূর এগোবে, আমার পক্ষে বলা কঠিন। দুই বাঘিনীই ক্ষুধার্ত।

আবছা দেখলুম, দিব্যেন্দু তার শক্তিশালী রাইফেল তাক করে আড়ালে ওৎ পেতে আছে। আমার গা শিউরে উঠল। আমার স্ত্রী!···

আধঘণ্টার বেশি দেরী করে ফেলেছিলুম—ইচ্ছে করেই। তারপর সেই অজুহাতে ইরাকে নিবৃত্ত করে এবং মোগলাই পরোটা খাইয়ে বাসায় ফিরেছিলুম। ইরা বেচারী খুব মনমরা হয়ে পড়েছিল। তার ইচ্ছে, সকালে আবার দিব্যেন্দুর সঙ্গে যোগাযোগ করি।

করলুম, কিন্তু সকালে নয়। দুপুরে আপিস থেকে। এবং দিব্যেন্দুকে আগে থেকে একটু আভাষ দিতে চাইলুম। প্রথমেই শ্রাবণীর ব্যাপারটা বললুম। তারপর বললুম, 'তোমাদের আপিসের রিসেপসনিস্টের চাকরিটা আমার স্ত্রীর বদলে কাইণ্ডলি যদি তুমি শ্রাবণীকে···'

কথা কেড়ে দিব্যেন্দু বলল, 'ভেরি—ভেরি সরি ভাই প্রবোধ। বম্বের হেড-অফিস থেকে এক অবাঙালী ভদ্রমহিলা অলরেডি জয়েন করতে আসছেন না হয়েছেন। আজই চিঠি পেলুম।···'

'ভীষণ বিচ্ছু ছেলে হলেও নীলুটা দেখতে ছিল ভারি সুন্দর।' এই বলে হিমাংশু লেপ থেকে বেরোয়। ডোরাকাটা পাজামার আলগা দড়ি টানটান করে বাঁধে আয়নার সামনে। তারপর চোখের পিচুটি ছাড়িয়ে দাড়িতে হাত বোলায়। ঝুঁকে পড়ে প্রতিবিম্বের দিকে।…'বুঝলে ঝুম ? নীলাদ্রি—মানে, নীলু ওই একটা জিনিসই পেয়েছিল পৃথিবীতে—এ লাভলি বিউটি। ব্যস, আর কিছু না। নাথিং! না টাকাকড়ি, না বাবা-মা, না কোন ইয়ে। গরীব বিধবা পিসির হাতে মানুষ হচ্ছিল। তো যাই হোক, নীলু…'

পুবের জানলা খুলতেই ঝুমঝুমের শরীরের ওপরদিকটায় সোজা রোদ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখন। সেই রোদ বিস্তীর্ণ জলাধারটায় কুয়াশায় ছেঁকে এবং নিচের তরল সমতল শৈত্য ছুঁয়ে আসায় নিছক খানিকটা হিম-হলুদ রঙ মত। ঝুমঝুম আনুষ্ঠানিকভাবে হাই তুললে কিছু কুয়াশা বেরিয়ে গেল।

হিমাংশু নেমে ঝুমঝুমকে দেখছিল।…'গ্র্যাণ্ড দেখাচ্ছে তো তোমাকে। ঊষসীর মতো।'

ভুরু কুঁচকে বাসিমুখ ফেরায় ঝুমঝুম। বলে, 'কিসের মতো ?'

'ঊষসী।'

'ঊষসী মানে ?'

হিমাংশু খিকখিক করে হাসে।…'কবিকল্পনা। জানো, নীলু এসব শব্দ অনেক জানত! শালা ছিল দারুণ কবি! আজকাল ওসব বাতিক আর আছে কিনা জানি না!' তারপর হিমাংশু ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা ভরা গ্লাস থেকে একটা প্ল্যাস্টিকের খসখসে ছোট্ট মগে জল ঢালে। সেফটিরেজার বের করে দেরাজ থেকে। ব্রাশে কিছু শেভিং ক্রীম নিয়ে মগের জলে ছুঁইয়ে গালের কাছে ধরে। ঠাণ্ডা ব্রাশের কামড় খাবার জন্যে তৈরী হতে থাকে।…'দেখছ ? সাতটা বাজে—এখনও মুন্নীটা আসছে না। অত করে বলা হল, সকাল সকাল আসবে—বাড়িতে গেস্ট আসবে একজন! এলে অন্তত এতক্ষণ একটু জল গরম করে দিতেও পারত।

ঝুমঝুম বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে সূর্য কী জলাধার কী স্থির ভেসে থাকা জলহাঁস দেখছে। পেটঅব্দি লেপে ঢাকা। সে ছোট্ট করে বলে, 'কেন ? এক্ষুনি চান ?'

'ইচ্ছে করছে।' হিমাংশু জোরে গালে ব্রাশ ঘষে। সাদা কঠিন ফেনা ছড়িয়ে পড়ে।…'ফ্রেশ হয়ে যেতুম স্টেশনে। 'মুন্নীকে সঙ্গে দিলে পথে বাজারটা করে

দিতে পারতুম। কী কী করবে ভাবছ, ঝুম?'

'কী করব?'

'রান্নার কথা বলছি। আইটেম ভেবেছ?'

মাথা দোলায় ঝুমঝুম। সে ভাবেনি।

হিমাংশুকে এখন মুখের ফেনায় ভূতের মতো দেখায়। সে ভূতের মতোই হাসে এবং গলার ভিতর থেকে বলে, 'না—নীলু মোটেও পেটুক নয়। অন্তত ছিল না। ওর খাওয়া তো দেখেছি। দেখছ?' বাঁ হাতের আঙুল জড়ো করে সে দেখায়।··· এই এট্টুখানি। অথচ ওর স্বাস্থ্য ছিল এত চমৎকার। হাঁ করে তাকিয়ে দেখার মতো। স্কুল লাইফে—ওঃ, ভাবা যায় না! আমার সঙ্গেই একমাত্র ভাব বলে সবার কী হিংসে কী হিংসে! যেখানে-সেখানে লিখে রাখত হিমমু প্লাস নীলু, হিমু প্লাস নীলু। এর মানে বোঝো, ঝুম?'

ঝুমঝুম অন্যমনস্ক চোখে একবার ঘোরে শুধু।

'ভ্যাট্! তুমি বড্ড বেরসিক!'···হিমাংশু ভূতের মুখ নিয়ে খাটের দিকে ঝুঁকে যায়। অকারণ কণ্ঠস্বর চেপে বলে, 'ওই বয়সে সুন্দর হলে কী বিপদ। অঙ্কের ভোলা স্যার নীলুকে দিয়ে পা টেপাটেপি করাত। পরে একদিন কী হল জানিনে, নীলু আমাকেও বলেনি কোনদিন—ভোলা স্যার একমাসের ছুটি নিয়ে গেলেন। সবাই বলল, হাসপাতালে গেছেন! হিঃ হিঃ হিঃ—মাইরি ঝুম, তোমার দিব্যি!'

ঝুমঝুম একটু চটে যায়।···'সকালে উঠে সবাই ঠাকুরদেবতার নাম করবে, তা নয়! যাও!'

হিমাংশু মৃদুভাবে অপ্রস্তুত হয়। হাসতে হাসতে এসে দাড়ি কাটায় লিপ্ত থাকে, অন্তত দু মিনিট। তারপর বলে, এই তুমি ওঠ। চা-টা খেতে হবে তো—না কী?'

ঝুমঝুম গম্ভীর মুখে বলে, 'তুমি হিটারে জল চাপিয়ে দাও। আমি আসছি।'

সংশয়ী স্বরে হিমাংশু শুধোয়, 'তোমার শরীর খারাপ করে না তো, ঝুম? ট্যাবলেটটা দেব—খাবে?'

'না।' ঝুমঝুম জানলার রডে নাক রাখে। নারাঙটুঙি ব্যারেজ আর ওয়াটার-ডামের ওধারে ছোট পাহাড়গুলো ধূসর পিরামিডের মতো দেখাচ্ছে। আবছা কানে আসে ব্যারেজের দিক থেকে জলের শব্দ। হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশনের বিশাল ফ্রেম থেকে কুয়াশা খসতে লেগেছে স্তবকে-স্তবকে। অসমতল মাঠের ওপর হলুদ কোয়াটারগুলো প্রকৃতির অন্তর্গত মনে হয়। আর কিছু সময় পরে সবাই নিজস্বতায় মুক্তি পাবে, যখন শীতের সূর্য জলাধারের দিকে একটু সরে আসবে। অবশ্য হাঁসগুলো ইতিমধ্যে নিস্পন্দত ভাঙছে। বিশাল ঝাপসা একটা কাঁচ যেমন করে ফাটতে থাকে, জলাধার রেখাসঙ্কুল হচ্ছে। বাকি দিনটা এবং রাতেরও কিছুক্ষণ তুমুল চেঁচামেচি করে জলহাঁসেরা। ঝুমঝুম দেখেছে, এরা সবাই গ্রীষ্মের

শুরুতে চলে যায় সব শব্দ আর আলোড়ন নিয়ে। তখন এই ড্যামটা পুরো ভিখিরি হয়ে চিৎপাত পড়ে থাকে কুষ্ঠরোগীর মতো। এখানে ওখানে ঢিবি জাগে। তার ওপর ক্বচিৎ দু একটা সারস কিংবা বক। তারা নিবীর্য বুড়ো।

'সাত বছরে একজন মানুষ কতটা বদলায় ? ঝুম ?'

'উঁ ?'

'নীলুর কথা বলছি। সাত বছর আগে ওর সঙ্গে শেষ দেখা। তখনও চাল-চুলোহীন বাউণ্ডুলে। একমুখ দাড়ি গোঁফ, গাদাখানেক চুল। অথচ সেই সৌন্দর্য একটুও ফেলে আসেনি। একেবারে গ্রীকদেবতা এপোলো—মাইরি! আমার বরাবর ধারণা, ওর পূর্বপুরুষ বাইরে থেকে এসেছিল। তা না হলে কোথায় পেল লালচে চুল, নীলচে চোখ, অত ফরসা রঙ ? তুমি দেখলেই ওকে ফরেনার ভাববে—বিলিভ মি, ঝুম।...এই, ঝুম!'...হঠাৎ চাপা গলায় দুষ্টু হেসে হিমাংশু বলে, 'তুমি ওর প্রেমে পড়ে যেওনা কিন্তু! আমাকে ডুবিও না ডার্লিং! মরে যাব।'

ঝুমঝুম কড়াস্বরে বলে, 'সাড়ে সাতটা বাজে।'

খুব ব্যস্ত হয়ে গালে রেজার চালাতে থাকে হিমাংশু। কিন্তু কথা বলতে ছাড়ে না।...'চন্দ্রনাথনকে বলে জীপটা ম্যানেজ করেছি। ট্রেন তো নটা দশে ইন করছে। অনেক সময় এখনও। সত্যি ঝুম, তোমাকে বোঝাতে পারব না, কী আনন্দ যে হচ্ছে!' ওঃ, মাই সুইট নীলু ইজ কামিং!' এবং সেই আনন্দ বোঝাতে সে হঠাৎ দুহাত ওপরে তুলে শিশুর মতো—কিছু মাস্তানী ঢঙে পাছা দুলিয়ে একটুখানি টুইস্ট নেচে ফেলে।...'হা হা হুই হুই...হা হা হুই হুই...লা লা ল্লা......

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হচ্ছে তখন। মুন্নী মেয়েটা এল তাহলে। হিমাংশু দৌড়ে দরজা খুলতে বেরিয়ে যায়। এক মিনিট পরে একা ফিরে বলে, মুন্নী। ওর কী হয়েছে মনে হল। ফুলোফুলো গাল, ভারী মুখ, ছলছলে চোখ। জিগ্যেস করলাম, বলল না। ঘোঁত করে কিচেনে ঢুকল।

ঝুমঝুম লেপ থেকে বেরোয়। সায়া-শাড়ি গায়ে গোছগাছ করে এবং মাথার কাছ থেকে ব্লাউসটা টানে। তখন হিমাংশু টের পায়, আশ্চর্য, এতক্ষণ শুধু ব্রেসিয়ার চড়িয়ে খোলা জানলায় বসে ছিল ঝুমঝুম। ঠাণ্ডা লাগছিল না ?

হিমাংশু তোয়ালে কাঁধে রেখে বলে, 'ঝুম, মনে হচ্ছে মুন্নীর ব্যাপারটা ধরেছি।'

ঝুমঝুম এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে কী দেখছিল—বলে, 'কী ?'

হিমাংশু হাসে।...নির্ঘাৎ সেই মামাঘটিত ব্যাপার। অদ্ভুত প্রথা কিন্তু। যদি মেয়েটা নিজের মামাকে বিয়ে করতে না চায়, জোর করেই বিয়ে দেবে। আর সেই মামা হারামজাদাও তো বড় ইয়ে—তুই শালা বুড়ো ধাড়ী, ওই মেয়ের মতো মেয়েটাকে...ড্যাট্, আইন কী করতে পারে আমি জানি না, নিশ্চয় এসব মধ্যযুগীয় ব্যাপার এলাউ করে না। তোমার কী মনে হয় ঝুম ?

ঝুমঝুম বলে, 'জানিনা।'

সেই সময় আঁতকে ওঠে হিমাংশু।…'আরে, আরে! তোমার গাল চিরলো কিসে? কী সর্বনাশ! ইস্।'

ঝুমঝুমের গালের ওপর সূক্ষ্ম দু'ইঞ্চি লম্বা একটা লাল রেখা—সূচের টানে যেমন হতে পারে। ঝুমঝুম আঙুল বোলায়। কিন্তু কিছু বলে না।

হিমাংশু যেন ভয়ার্ত—ছটফট করে বলে, 'নিশ্চয় পোকামাকড়। যে প্রিমিটিভ জায়গা আর পরিবেশ—ছ্যা ছ্যা! এক কাজ করো শিগগির, তুলোয় ডেটল নিয়ে ঘষে দাও। আর, ইয়ে—সেই মলমটা কই? ওই যে সেদিন আনলুম, কী যেন নাম—অ্যান্টি…অ্যান্টি…' একটা ঝড় এনে ফেলে হিমাংশু। দেরাজ খুলে হাতড়ায়। ঘরের একোণ থেকে ওকোণে ছুটোছুটি করতে থাকে। খুঁজে পায় না মলমটা। মুখের এখানে-ওখানে সাবানের পোঁচ নিয়ে এবং কাঁধে তোয়ালে, হিমাংশু একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

ঝুমঝুম অচঞ্চল। চেরা দাগটায় তখনও তার আঙুল। এবার শান্ত ও সরল-মুখে বলে, 'হুলুস্থুলু করো না। আমার অমন হয়।'

'হয় মানে? কক্ষনো তো দেখিনি!'

'হ্যাঁ হয়। বিয়ের পর এ দুবছর অবশ্য হয় নি।'

হিমাংশু পাশে এসে বলে, 'হয় নি কী বলছ—বুঝতে পারছি না।'

একটু হেসে তার দিকে মুখ ঘোরায় ঝুমঝুম।…'প্রথম প্রথম সবাই পোকা-মাকড়ের চেরা ভাবত। পরে বাবা ডাক্তারের কাছে দেখালেন। ডাক্তারও বললেন আরশোলা টারশোলা হবে। একদিন মা ব্যাপারটা ধরে ফেলল।'

উত্তেজিত হিমাংশু বলে, কী কী?

'মায়ের কাছে শুয়ে ছিলুম সেরাতে। সানু তখন ছ'মাসের বাচ্চা। ভীষণ পেচ্ছাপ আর কান্নাকাটি করত। মা জেগে ছিল। হঠাৎ দেখল, আমি ঘুমের ঘোরে নিজের গালটা নখে আঁচড়াচ্ছি।' খিকখিক করে হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে যায় ঝুমঝুম।

হিমাংশু ওর একটা হাত টেনে আঙুলগুলো দেখতে থাকে।…'ভ্যাট! নখটখ নে-ই!'

ঝুমঝুমি তখন আরেকটা অর্থাৎ বাঁহাতের কড়ে আঙুল তুলে বলে, 'ওহাতে নেই—এই যে।'

হিমাংশু দেখে কড়ে আঙুলের নখটা অন্তত কয়েক সেণ্টিমিটার বাড়তে দেওয়া হয়েছে এবং ডগাটা ধারালো। নখের ওপর লাল এক চিলতে পালিশের ছোপ। সে হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলে…হতেও পারে। তোমার এই নখটা আমি লক্ষ্য করিনি কোনদিন। সর্বনাশ! ঝুম, তোমার নখকে বলো যেন ভুল করে গাল বদল করে না।' অবশ্য…প্রেমিকের ঢঙে সে আরও বলে, 'অবশ্য তোমার হাতে রক্তাক্ত হলে কী সুখী না হবো!'…

বন্ধুর জন্যে দুদিন ছুটি নিয়েছে হিমাংশু। ওর প্রত্যেকটি আচরণ খুব খুঁটিনাটি দেখতে পাচ্ছে ঝুমঝুম। ও নিজেকে পুরো পিছনের দিকে লেলিয়ে দিয়েছে এবং মাংসাশী ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো ছিঁড়ে খাচ্ছে বন্ধুত্বময় স্মৃতিকে। হিমাংশু অন্তত এই দুটো দিন আর বর্তমানে ফিরছে না। কিংবা—যদি বা ফেরে, তাঁর সারা শরীরে মুখে ও চোখে সেই রক্তমাংস ছিবড়ে-ছিবড়ে লেগে থাকবে। ঝুমঝুমের এটা ভাবতেই খারাপ লাগছে। কিচেনে গ্যাসের উনোনের সামনে দাঁড়িয়ে অতিথির জন্যে হেভি ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে করতে সে অবিকল দেখতে পায় ট্রেনটা দাঁড়ানোর আগেই হিমাংশু কী প্রচণ্ড ছুটোছুটি করছে। রেলকুলি আর যাত্রীসাধারণের ভিড় ঠেলে, ধাক্কা দিয়ে, গুঁতো মেরে দরজা দেখতে দেখতে হিমাংশু এখন যা করছে, তা একটা উপদ্রব। কারও কোন তেঁতো উক্তি সে শুনতে পাচ্ছে না। তার নীলু আসবে—তার নীল, তার নীলাদ্রি আসবে। আর, ওই তো লাল দরজায় পিঙ্গল চুল, নীলচোখ, সেই গ্রীকদেবতা অ্যাপোলো! বাঁকা ঠোঁটে এবং ভুরু কুঁচকে আলতো হাসে ঝুমঝুম—ব্যঙ্গে, খুন্তিটা একবার চালিয়ে দেয় কড়াইয়ের তলা অব্দি। সে দেখতে পায়, টানা ছ'ফুট শরীর—ফ্যাকাসে রঙ, রুক্ষ বড়োবড়ো চুল গোঁফ-দাড়ি, চিতাবাঘের চামড়ার মতো ঢিলে কার্ডিগান, নেভিব্লু প্যান্ট, সাদা বোতামছাড়া শার্ট, ঘোরালো চকরাবকরা মাফলার, কাঁধে ঝোলানো কালো ব্যাগ এবং হাতের মুঠোয় গগলস। সেই হাতের ফুলেওঠা নীল শিরা-খয়েরি পাতলা ঠোঁটের কোনায় একটা মারাত্মক তিল। তার স্বামী হিমাংশুর নাকি ওই লোকটার শরীর পুরো মুখস্থ আছে। হিমাংশু নাকি বলে দিতে পারে, নীলুর কোনখানে কতগুলো তিল কিংবা জড়ুল, উরুতে ক'পোঁচ পাঁচড়ার দাগ, অথবা কোথায় একলা এক উদ্ভট—নাকি রহস্যময় নীল চুল—ডিমের মতো উরুদেশেই কি? ঝুমঝুম দেখতে পায়, স্টেশনের ভিড়ে হিমাংশু ওকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জড়িয়ে ধরে চেঁচাচ্ছে—নীলু, আমার প্রাণের নীলু! হিমাংশু বাঘের মতো ধরে আনছে এক উজ্জ্বল হরিণ। কীভাবে খাবে ঠিক করতে পারছে না। ছটফট করছে উত্তেজনায়—নীল, ওরে নীল…

ঝুমঝুম টের পেল হিমাংশুর ওই চঞ্চলতা আর চিৎকার তার মধ্যে কখন প্রতিবিম্বিত আর প্রতিধ্বনিত হতে লেগেছে। সে চমকাল। শুনল,—নীল! আমার প্রাণের নীল! সে শিউরে উঠল। থামিয়ে দিতে চাইল দাঁতে দাঁত চেপে এ হঠকারী উপদ্রব। অথচ খেদিয়ে দেওয়া প্রাণীর মতো সেই প্রতিধ্বনিত উচ্চারণ অন্ধকারের দিকে সরে বসে রইল ঘাপটি মেরে—মাঝেমাঝে ঝিলিক দিতে থাকল তার জোরালো চোখ। ঝুমঝুম দেখল, অবাধ্য দামাল ছেলের মতো নিজেরই আরেকটা অংশ প্রচণ্ড দুষ্টুমি করছে—যাকে নিষ্ঠুর বিশুদ্ধ শাসন করা সম্ভব নয়। অগত্যা মায়ের চোখে তাকিয়ে অসহায় হাসে একটু। যেন বলতে চায়—ছিঃ, অমন করে না, শক্তহাতে খুন্তিটা ধরে বেগুনের চাকাগুলো সে ওলটাতে থাকে। তখন দেখে একপিঠ পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

মুন্নী ঘরের মেঝে মুছছে তখন। তার দেহাতী বুলিতে বিড়বিড় করছে। রসিকতা করতে ইচ্ছে হয় ঝুমঝুমের। কিচেন থেকে উঁকি মেরে বলে, 'কী রে, মামা তাহলে সত্যি ছাড়ছে না তোকে ?'

মুন্নী শুধু বলে, 'মারো, ঝাড়ু মারো।'

'এই মুন্নী!'

'ঝাড়ু মারো, দিদি!'

'ভ্যাট! শোন কী বলছি!' চটুল হাসে ঝুমঝুম।

রুক্ষু চুলের গোছা সরিয়ে ফুলো মুখটা তোলে মুন্নী—আদিম মানুষের আবেগ টলটল করে সেখানে। আর ঝুমঝুম ভাবে মুন্নী কত সহজে কথা বলতে পারে, ইচ্ছে অনিচ্ছে খোলাখুলি জানাতে পারে—এবং একটা প্রাণবন্ত স্বাধীনতা ওর মধ্যে বয়ে যেতে পারে খোলা মাঠের ফুটফুটে রোদে।

ঝুমঝুম বলে, 'এই! ভালো—সুন্দর একটা বর পেলে বিয়ে করবি ?'

আদিম মুখ ধীরে নামে এবং ঠোঁট কাঁপে। অস্ফুটে বলে, 'ঝাড়ু মারো!'

ভেংচি কাটে ঝুমঝুম।…'আজ্ঞে না! ঝাড়ু মারতে হবে না। দেখলে ভিরমি খাবি রে মুন্নী, [illegible] খাবি। মুন্নী, আজ আমাদের বাড়ি একটা লোক আসছে। বল, বিয়ে করবি তাকে ? অমন সুন্দর বর তোদের জাতে পাবিনে হতভাগী মেয়ে!'

'ঝাড়ু মারো!' বলে আদিম যুবতী সিমেন্টের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

ঝুমঝুম ভাবে—হ্যাঁ, খুব প্রবল ধরনের একটা শক্তি আছে মুন্নীর ওই শব্দ দুটোয় তুচ্ছ করো, প্রহার করো, ফেলে দাও আবর্জনার মতো। ওইরকম একটা অস্বীকার তার এখন দরকার। এবং সেজন্যেই চাই মুন্নীর তাবৎ সরলতা, স্পষ্টতা আর প্রচুর আদিমতা। কিন্তু আর তা পাওয়া যাবে না।

হিমাংশুর ঘর সেজেগুজে তৈরি হচ্ছে একজন সৌন্দর্যবান মানুষের জন্যে! হিমাংশু কতক নিজে গুছিয়ে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। সোফা টেবিল বিছানা—ছোট-বড় প্রতিটি আসবাবের ঢাকনা বদল হয়েছে। দেয়ালের সব ছবির [illegible] সাফ করা হয়েছে। গোছানো হয়েছে বিশৃঙ্খল আলনা। বাথরুম পরিচ্ছন্ন—নতুন তোয়ালে সাবান বুরুশ মাজন। ফুলদানীতে তাজা ফুলের গোছা। আর হিমাংশু বলে গেছে, প্লীজ ঝুম—মাই ডার্লিং, তুমি একটু ইয়ে থাকবে—অর্থাৎ সেজেগুজে, এবং সেই বেগুনি ছোপের কাশ্মীরী সিল্কটায় সবচেয়ে বেশি মানায় নাকি ঝুমঝুমকে।

তাই মনে পড়লে ঝুমঝুম মাঝে-মাঝে ব্যস্ত হয় অবশ্য। কিন্তু তক্ষুনি-তক্ষুনি ভুলে যাচ্ছে।…হুঁ! তোমার গ্রীকদেবতার সামনে কী এক খেঁদিপেচীর মতন সেজেগুজে দাঁড়ানো—ভ্যাট, ভ্যাট! আমি ওসব পারব না। ঝুমঝুম একথা বলতে ছাড়েনি। কিন্তু হিমাংশু প্রায় স্ত্রীর পা[illegible] ধরতে বাকি রেখেছে।

কিচেনের কাজ আপাতত শেষ করে ঝুমঝুম শোবার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। নিজের চেহারা দেখতে থাকে। যেমন আছে, এভাবে থাকলে কি প্রিয়

অতিথির খুব অমর্যাদা করা হবে ? তাকে কি খারাপ দেখাচ্ছে এবেশে ? গৃহিণীর এই আদলটা গায়ে চড়িয়ে রাখতেই ইচ্ছে করছে ঝুমঝুমের। আর হিমাংশু দুঃখিত-ভাবে বলে গেছে, 'হল—হ'ল তো আজকেই, ধুৎ! কোন মানে হয় না। মানে—তোমার গালের না। দেখ—হ্যাঁ, এতদূর থেকেও স্পষ্ট চোখে পড়ছে। ওটা যেভাবে হয়, ঢাকতে পারবেনা ঝুমু ? (কষ্টে হাসে)…নীলু ভাববে, আমি এখনও এত সেক্সপারভার্ট যে বউয়ের অমন সুন্দর গালটা রক্তাক্ত করে ফেলি!' সেই মৃদু রক্ত-রেখার ওপর আবার আঙুল বোলাতে থাকে ঝুমঝুম। সত্যি কি তাই ভাববে মাননীয় অতিথি ? একটু লজ্জা শিরশিরে হাওয়ার মতো পেরিয়ে গেল তাকে। পরক্ষণে সামলে নিল। বিদ্রূপের বাঁকা রেখা ফুটল নিচের ঠোঁটে।…হুঁ, সম্মানিত সৌন্দর্য আসছেন! তিনি এক্ষুনি যে কোন সময়ে এসে পড়বেন! ইস্, বয়ে গেছে আমার। আসবে তো কী হয়েছে ? আসুক না! এবং এসে দেখুক, মানুষ কতভাবে বেঁচে থাকতে জানে সৌন্দর্য ব্যতিরেকে। বাঁচা যদি একটা সত্য ঘটনা এবং জরুরী ব্যাপার হয়, তাহলে অন্যান্য সবকিছুই বাহ্যিক আর আরোপিত। চব্বিশ বছর বয়সের এই যুবতী মেয়ে না সেজেও অনেকভাবে জানিয়ে দিতে পারে সে একটি মূলগত সত্যে—বাঁচার স্রোতে চমৎকার ভেসে আছে। কোন ক্ষতি হয় না তার। দেখুক, দেখে যাক এসে সেই কিংবদন্তী হয়ে ওঠা সৌন্দর্যমহাশয়।

কিন্তু যত মিনিট কাটে, ঝুমঝুম টের পায় সে আস্তে আস্তে চঞ্চল হচ্ছে। জোয়ার ভাটার সন্ধিকালের সেই থমথমে শান্তি টলমল করতে লেগেছে। অনেকটা দূরে বাঁকের মুখে কি কোথাও জোরালো ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ হল ? কিচেনে ঢুকে অকারণে কিংবা কারণে সে ঢাকনা তুলে মুরগীর অপেক্ষমান গোলাপী মাংস দেখে। তুলে ধরে ফুলকপি কী নধর মূলো, কী শীম পালং। মুঠোয় চেয়ে থাকে কয়েক সেকেণ্ড একটা নিটোল মসৃণ টমাটো। তার মনে হয়, সবখানে শুধু বরফ গলতে থাকার মতো হৃদয়স্রাব। সব কঠিনতা। ভাঙছে ক্রমশ। আবেগ হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি সত্তা। নিবন্ত উনানের গর্ভে নীলাভ গ্যাসও অপেক্ষা করে আছে ফোঁস করে জ্বলার জন্যে। আর চারদিকে ওপরে-নিচে চাপা ফিসফিস উত্তেজিত কিছু বাক্য অনর্গল স্পন্দিত হচ্ছে—সে আসছে, সে আসছে! তিনি আসছেন!

ঝুমঝুম কিচেন থেকে বেরিয়ে আসে আবার। বসার ঘর পেরিয়ে বাইরে যায়। একটুকরো ফুলবাগিচার ওধারে বেড়া এবং গেট। তার ধারে সরু রাস্তা। রাস্তাটা অনেক কোয়াটার পেরিয়ে বেঁকে উঁচুতে বড় রাস্তায় গেছে। সেইদিকে তাকায় সে।

এত ক্ষতচিহ্ন মুখে নিয়ে এমনভাবে দাঁড়ানো উচিত হচ্ছে কি ? ঝুমঝুম বাঁহাতের ধারালো নখটা গালে বোলায়। এই শীতের সকালে দিগন্ত বড় রহস্যময় হয়ে যাচ্ছে। ব্যারেজের প্রপাত থেকে জলের শব্দ দ্বিগুণ বেড়ে যাচ্ছে। ড্যামের নিরাপদ হাঁসগুলো এখন ভীষণ অস্থির। পায়ে পাখনায় জল ভাঙছে। লক্ষ লক্ষ ঠোঁট এবং ডানা শব্দ করে আকাশকে বলে দিচ্ছে—আমরা ভালবাসতে এসেছিলাম!

ওইরকম কারও-কারও আমার জন্যে কেউ-কেউ বুঝি অপেক্ষা করে থাকে—কারণ কেউ এসে বলবে, ভালবাসতে এসেছিলাম।

আর তখন মুন্নীও তার পাশে এসে দাঁড়াল। এখন তার মুখে সেই ফুলো ভাবটা নেই—সে পরিষ্কার। যেন সেও তৈরী। কারণ মৃদু হেসে সে বলে, 'নজর আতা, দিদি?' পরক্ষণে আপন মনে ফের বলে সে, 'গুড্ডিমে আবে। দোচার মিনটকী রাস্তা।' আদিম সন্ধানী দৃষ্টিকে সেও দূরে পাঠিয়ে দেয় শ্রীযুক্ত সৌন্দর্যের সন্ধানে।

ঝুমঝুম ঠোঁট কামড়ায়। তার সেই বাঁহাতের ধারালো আঙুল গালে চেপে বসে।...

জীপটা চলে গেলেও গেটের বাইরে কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে হিমাংশু। এক-হাতে চুল আঁকড়ে ধরে, অন্যহাতে ঘনঘন সিগ্রেট টানে। তারপর সিগ্রেটটা জুতোর তলে মাড়িয়ে গটগট করে ঢোকে। দরজার সামনে একবার দাঁড়ায়। বাড়িটা তার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে কী প্রশ্ন করে। মাথা ঝাঁকি দিয়ে হিমাংশু আস্তে আস্তে দরজা ঠেলতেই খুলে যায়। হু হু করে উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকে সাজানো ঘরে। কোথায় গেল সব মুন্নী আর ঝুমঝুম?

মুন্নী বাথরুমে কাপড় কাচছে। হিমাংশু অস্ফুটস্বরে ডাকে, 'ঝুম, ঝুম!' তারপর শোবার ঘরে যায়। দ্যাখ, ঝুমঝুম একই কাপড়ে চুপচাপ বসে আছে খাটে পা ঝুলিয়ে। হাতের মুঠোয় দোমড়ানো কী কাগজ। হিমাংশু দুঃখিতভাবে একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে বলে, 'এল না তো! সাড়ে দশটার প্যাসেঞ্জার ট্রেনটাও দেখে এলুম। এরপর বিকেলের আগে...'

ঝুমঝুম একটু হেসে কাগজটা এগিয়ে দেয়। নিঃশব্দে।

'টেলিগ্রাম। টেলি...কার?' দ্রুত ভাঁজ খুলে হিমাংশু পড়ে ফেলে।...'হুঁ, কখন এল?'

'একটু আগে।'

'শালা, তুই যে আসবি না—তা অমন করে চিঠি লিখলি কেন?' ...হিমাংশু চেঁচায়। ...'বোম্বে যাচ্ছে! বাবার মাথা যাচ্ছে শালা! আর কখনো তোর কথা ভাবব না—কখনো না! ঝুম, শালা বাঁদর বরাবর এইরকম আনপ্রেডিক্টবল। আমার তখনই বোঝা উচিত ছিল! ভ্যাট্, ভ্যাট্!'

হিমাংশু ওর পাশে ধুপ করে বসে পড়ে। আবার বলে, 'তুই যে আসবি না—তা আগে ঠিক করলেই পারতিস! বেশ তো ছিলুম—তোর কথা না ভেবে দিব্যি কাটাচ্ছিলুম। এখন খুঁচিয়ে ঘা করে শুওরটা কেমন গা ঢাকা দিল দেখ তো! অতসব আয়োজন করলুম—বলো ঝুমু, ওসব কি এখন আমি গিলতে পারব? বলো?'

ঝুমঝুম তাকায়। হিমাংশুর চোখ ছলছল করছে।

'দু-দুটো দিন ছুটি নিলুম বাস্টার্ডটার জন্য। আর কি ছুটি কাটাতে ভালো লাগবে, না ছুটি ক্যানসেল করে অফিস যেতে? মন বসবে কোন কিছুতে অন্তত এই দুটো দিন? কোন মানে হয় না—কোন মানে হয় না। চিরকাল ও জ্বালাচ্ছে! …হিমাংশু কী করবে ঠিক করতে পারে না। হাত কচলায়। হাঁটু দোলায় জোরে।

আর ঝুমঝুম ভাবে সে কী করবে? খুশি হবে একটা নাটকীয় পরিস্থিতি থেকে, একটা অনিবার্য উপদ্রব থেকে বেঁচে গেছে বলে—নাকি প্রাক্তন প্রেমিকাকে দুটোদিন কাছে পাওয়ার নিষিদ্ধ সুখ থেকে বঞ্চিত হল বলে গোপনে ডুকরে কাঁদবে? হিমাংশু তো জানে না, ঝুমঝুমেরও আত্মার অন্ধকার অংশ থেকে সারারাত সারা-সকাল গভীর চিৎকার উঠেছিল—নীল, আমার নীল। হিমাংশু এও জানে না যে তার স্ত্রীরও—তারই মতো সেই রূপবান শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি মুখস্থ—প্রতিটি তিল ও জরুল এবং সেই ডিমডিম উরুর উদ্ভট নীল চুলটাও।

কিন্তু সে স্ত্রীলোক। তার অনেককিছু অন্যরকম। সে জানে, মানুষের অত সৌন্দর্য সয় না—শুধু স্মৃতির মধ্যে তাকে রেখে আমৃত্যু মিথ্যে ফিরে আসার প্রার্থনা জানানো ছাড়া উপায় নেই।

হিমাংশু ফের বলে, 'আমার কিছু ভাল্লাগে না আর।'

তখন ঝুমঝুমও ছোট্ট করে বলে, 'আমারও।' আর তার গালের সেই চেরা দাগটা থেকে ততক্ষণে কয়েকটা টাটকা রক্তের বিন্দু দেখা যায়।

সে আসে। বাতাসের হাতে লোহার ভারি গেটটা খোলে। কোন কুকুর ডেকে ওঠে না এই আততায়ী প্রবেশের মুহূর্তে। কিন্তু আজকাল আমার ঘ্রাণশক্তি কি কুকুরের চেয়ে বেশি ? সে এলে ঠিকই টের পেয়ে যাই। তেতলার জানলায় অনেক কষ্টে মুখটা বাড়াই। দেখতে পাই, হ্যাঁ—সে আসছে। খুব আস্তে, নিঃশব্দে নিচের গেট খুলে সে লন পেরোচ্ছে। এবাড়ির কোন ফ্ল্যাটেরই কারো গাড়ি নেই, কিন্তু একটা গাড়িবারান্দা আছে। তার তলায় সে হারিয়ে যায়। কিন্তু তাকে খুঁজে বের করতে আমার এক সেকেণ্ডও দেরি লাগে না। ওই তো সে, একইভাবে মুখ নিচু করে চারটে চওড়া ধাপ পার হল। কড়িডোরে ঢুকে একবার ওপরের দিকে তাকাল—ওটা তার অভ্যাস। নাকি দোতলার মিসেস ডিসুজার টেরিয়ারটাকে সে ভয় পায় ? ওই ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে চার নম্বরে সে ঢুকবে। চারনম্বরের দরজায় নেমপ্লেট আছে ঃ মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস ডি চৌধুরী। সে নেমপ্লেটের দিকে একবার তাকিয়ে তারপর ঘণ্টার বোতাম টিপল। এইবার একটা মিষ্টি সুন্দর শব্দ পিয়ানোর মতো বেজে ওঠার কথা—এবং এই মুহূর্তেই আমি প্রায় হৃদপিণ্ডে ছুরিবিদ্ধ হই। সুন্দর মিষ্টি শব্দ তার আঙুলের ছোঁয়ার পলকে হয়ে উঠল একটি ভয়ংকরতম বিস্ফোরণ। আমি রক্তাপ্লুত হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ি। কিছুতেই নিজের ফুসফুসের খেঁচুনি থামাতে পারি না। মনে হয়, সব বাতাস ওই বিস্ফোরণে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

কতক্ষণ অসহায়ভাবে চুপচাপ পড়ে থাকি। নিজেকে বলি, সহ্য করতে শেখো, বন্ধু। তুমি এখন যেখানে বাস করছ, তা একটা ধারালো মালভূমিসংকুল পাহাড়। এবং একটা সহ্যাদ্রিবিশেষ। তার চূড়াগুলো একটার পর একটা তোমাকে পার হতে হবে। গত মার্চের আঠারো তারিখে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রেড রোডের মোড়ে যখনই সেই ধূর্ত কালো এ্যামবাসাডারটা তোমাকে অন্যমনস্কতার দরুন পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছিল, তখনই তুমি ছিটকে উত্তীর্ণ হয়েছিলে সহ্যের প্রথম চূড়াটা। ডান-পায়ের নিচেটা ফেটে গেল। হাড় ভাঙলে নিশ্চয় ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তুমি সহ্য করতে পারছিলে। তারপর একটা থেকে আরেকটা সহনশীলতার মধ্যে দিয়ে তোমার যাত্রা হল শুরু। এখন তো বাবা, দিব্যি আরামে রয়েছো, তোমার তেতলার এই ঘর—ছোট্ট, কিন্তু পূর্ব-দক্ষিণ হু হু খোলা। জানলার বাইরে সব বসন্তকালের ঝাড়পোঁচ করা নতুন জামা গায়ে চিকন-চিকন সব গাছ। লাল শিরস্ত্রাণ পরা অদ্ভুত পতঙ্গদের মতো দলে দলে শিমুল ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বসন্ত-সেনারা।

ওই যে ওখানে একটা পুকুরও আছে—যার জলের রং সবুজ। এবং খোপা মেয়েটা দেবরাজ ইন্দ্র আসবেন বলেই কি অজস্র ঐরাবত পাহারা দিচ্ছে? দ্যাখো, ওই খোপা মেয়েটার যৌবন এখন অস্ত্রের মতো ঝিলিক দিচ্ছে বলে তিনজন গলির মস্তান কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে গড়িয়ে পড়ল, অশ্বের মতো। হ্যাঁ, তিন অশ্বের মতো তিনটি যুবকের দেহের ভিতর থেকে প্রার্থনার হাত গজিয়ে উঠতে তুমি দেখলে। ওরা বলল, দয়া করো।...

আর এই বসন্তে মুদিটারও ভুঁড়ি হয়েছে। ছাইচাপা ঘাসের মতো তার শরীর! রাস্তার কলের ধারে সে গায়ে লাইফবয় ঘষছে। সে সুন্দর থেকে সুন্দরতর হবে। একটু পরে তাকে আর মুদি এবং বাটখারার বাটপাড় কিংবা নির্ভেজাল ভেজালকারী বলে একটুও চেনা যাবে না। তুমি নিশ্চিত জেনো, সাড়ে চারশো মানুষকে ভেজাল তেল খাইয়ে পঙ্গু করেছে বলে পুলিশ তাকে—অন্তত এই বসন্তকালে আর রাস্তায় ঘোরাচ্ছে না, গলায় জুতোর মালা তো নয়ই। বরং এখন বসন্তকালে কলকাতার পুলিশও অসম্ভব ভদ্র হয়ে ওঠে। ওই দ্যাখো, খুব আস্তে, প্রায় নিঃশব্দে দুজন সশস্ত্র পুলিশ মাথা নিচু করে হেঁটে গেল। তাদের হাতের রাইফেল দুটো দুটি শিশুর প্রতীক—কারণ ওরা ছেলেপুলের বাপ।....

হ্যাঁ, এবার এইসব ভেবে আমার হাসি পাচ্ছে। কিন্তু হাসতে গিয়েও আটকে যায় সব কৌতুক কিংবা উইট। ঠিক এই ঘরটার নিচেই সেই লোকটা এখন আছে। তার কথা মনে পড়ায় চকিতে আমার দৃষ্টি মোজাইক ফুঁড়ে নিচের ঘর পৌঁছয়। ঘরের দরজা-জানলাঢাকা পুরু পর্দা থাকায় আলো এত কম। ষড়যন্ত্রময় কী অন্ধকার সেখানে। ওপরের খোলামেলা আলোয় অভ্যস্ত দৃষ্টিতে প্রথমে কিছু দেখতে পাওয়া কঠিন। তারপর আবছা একটি পুরুষ ও একটি মহিলাকে আমি দেখতে পাই অথবা অনুমান করি। আরও অনুমান করি, তারা নিশ্চয় সোফায় পাশাপাশি বসে কথা বলছে। তারা কি এত অভদ্র হতে পারে? বিশেষ করে মিসেস চৌধুরী—রুমা চৌধুরীর সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছে। সৌন্দর্যকে পাপের সাধ্য কী যে ছুঁতে পারে। তাদের পাশেই ডবল খাটের বিছানা সুদৃশ্য তাঁতের বেডকভারে মোড়া—সেখানে আমি যথাযথ পবিত্রতা আশা করছি। নিজেকে বলি, তুমি হীনচেতা হয়ো না। মনে শুদ্ধতা রাখো কারণ এখন বসন্তকাল এবং তুমি একজন শয্যাশায়ী প্রায় অক্ষম মানুষ। এখনও তিন মাস পায়ে প্ল্যাস্টার নিয়ে তোমাকে পড়ে থাকতে হবে।

অথচ আমার মনে শুদ্ধতার উজ্জ্বল রোদ ছেয়ে একটা মেঘলা আবহাওয়া নিয়ে আসে একজন ঢেঁকো লোক। ভীতু, বিনীত, ভদ্র তার চালচলন। সেটাই স্বাভাবিক। রোদ খুন করে ফেলে যে আততায়ী মেঘ, সে আকাশে নিচু হয়েই তো আসে। ওই নম্রতাই তার শয়তানি। আর আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, ঢেঁকো শয়তানটা বৃষ্টি দিয়ে মেঘ যেমন পৃথিবীকে ছোঁয়, তেমনি করে ইচ্ছেকামনার ভারে

নিচু হতে-হতে ছুঁয়েছে রমণীটিকে এবং কোথাও বৃষ্টিপাতের মতো তাদের রক্তের ভিতর যে ইচ্ছেকামনার অশ্বগুলো দড়বড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে টের পাই। ওরা কি পরস্পর চুম্বনরত হল? ওরা কি প্রেমজ বিষণ্ণ কুসুমটি ফাটিয়ে কামনার রক্তিম ফলে নিজেদের উত্তীর্ণ করল?

...তুমি চুপ করো, শুভময়। তুমি অশ্লীল কথা ভাবছ। তোমার ভিতরটা টানা অস্বাস্থ্যে পচ ধরে গেছে। তুমি একটা পায়ে আহত—তাই তৈমুরলঙ্গের মতো লুণ্ঠন অগ্নিকাণ্ড রক্তপাতের বীভৎসতায় ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ দাবি করছ।

একটু পরে দেখি, আমার গা ঘেমে ভিজে গেছে। একটা বোবা অসহায় দুঃখ-বোধ কাচের কফিনে রাসায়নিক তরলপদার্থে ভাসিয়ে রাখা আধুনিক যুগের মমির মতো আমাকে শুধুই একটা দেহে পর্যবসিত করে ফেলেছে।

ওই টেকো লোকটা কে, আমি জানি না। তাকে আজ পুরো মার্চ মাস ধরে আসতে দেখছি—ঠিক দুপুরের দিকে, যখন মিঃ চৌধুরী আপিসে থাকেন। আগে তাকে দেখার সুযোগই পাইনি, কারণ তখন আমারও আপিস ছিল। আর বিছানায় এইভাবে শুয়ে দিনরাত্রি কাটে না বলেই মাথার কাছের জানালা দিয়ে, বেশ কষ্ট হয় এবং উচিতও নয়—তবু বাইরে কীসব ঘটছে দেখবার চেষ্টা করি। সময় কাটানোর জন্য এছাড়া আরও কিছু থাকে অবশ্য। বই পড়া, রেকর্ডে গান শোনা, কিংবা কদাচিৎ কারো সঙ্গে কথাবার্তা। কিন্তু সবচেয়ে ভালো সময় কাটে বাইরে তাকিয়ে। খুঁটিনাটি দেখি। মুখস্থ হয়ে যায়। রাস্তা, গাড়ি, লোকজন, গাছগুলো, কাকগুলো এবং অনেক সময় আরো অনেকরকম পাখিও আসে। তার মধ্যে একটি টেকো লোকের আসা আমাকে অস্থির করে।

প্রথমদিকে টেরই পেতাম না যে ও চার নম্বর ফ্ল্যাটে আসে। একদিন রুমা চৌধুরী ওকে গেটঅব্দি এগিয়ে দিলেন। তখনই আমি চমকে উঠেছিলাম। না—খুব সহজভাবে নিইনি। দুজনের পারস্পরিক বিদায় অনুষ্ঠানে (অনুষ্ঠানই! সজ্ঞানে বলছি) একটা কিছু ছিল, যা সহজ নয়। যা প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে থাকার কথা। যার মধ্যে আনন্দ ও দুঃখের যুগপৎ ব্যঞ্জনা আছে। কারণ যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেতে হচ্ছিল টেকো লোকটিকে।

ব্যাপারটা খুব গুরুগম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু আপাতত আমি ভদ্রভাবেই এই বিষয়টি নিয়ে স্বগত আলোচনায় রত হতে চাই। কারণ, আমি নিজেকে ভদ্র সভ্য মানুষ বলে বিশ্বাস করি। অন্যের ফ্ল্যাটে অন্যের সুন্দরী স্ত্রীর কাছে অসময়ে ইন্দ্রলুপ্তিময় মাথা নিয়ে কোন পুরুষ যায়, তাতে আমার মাথা ঘামানো উচিত নয়।

কিন্তু আমার স্বভাবের এই সমস্যা—আমি শোভনতা ও সংগতির পক্ষপাতী। রুমা চৌধুরীর সঙ্গে ওই টেকো লোকটাকে মানায় না—একটুও মানায় না। তার গায়ের রং এত চাপা, নাকটা এত লম্বা, চোখ-দুটো জ্বলজ্বলে নীল, এত রোমশ সে—আর রুমার রং উজ্জ্বল গৌর, ঘন একরাশ চুল—যদিও খানিকটা ছাঁটা, মনে হয়

হঠাৎ থমকে যাওয়া মাঝপথে এক সোনালি প্রপাত, মিসেস চৌধুরীকে ভারতীয় ব্লন্ড বলতে পারি।

একজন নিগ্রোর সঙ্গে সাদা চামড়ার মেয়েকে প্রেম করতে দেখলে, কু-ক্লুক্সক্ল্যানের সদস্য হোক বা না হোক, যেমন ইয়াংকিবাচ্চার মেজাজ খিঁচড়ে যায় এবং অকথ্য খিস্তি করে পিস্তল তোলে—আমার প্রতিক্রিয়াও অবিকল তাই। দুঃখের বিষয় আমার কোন পিস্তল নেই। আঙুল তুলে অসহায় বঙ্গসন্তান পিস্তলের নলচে বানায় এবং কপালের শিরা ফোলায়। কানের লতি লাল ও গরম হয়ে পড়ে। দাঁতে দাঁতে নেমে আসে। আমি যদি সুস্থ শরীরের থাকতাম সোজা গিয়ে বলতাম—কোথায় যাবেন আপনি? খবর্দার এবাড়ির ছায়া মাড়াতে দেখলে আপনার ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

কিংবা পুরো পাড়ার মস্তান হয়ে একটা বাঁকা শিস দিয়ে এগোতাম। আচমকা কাঁধে হাত রেখে বলতাম—কী বে স্লা? ঘেণ্টি প্লুক করে দেব—স্লা ঢুঢুবাজির আর জায়গা পাওনি?

এই সময় আমি দোতলার জানলায় মিসেস চৌধুরীর মুখ দেখতে পেতাম। কী দেখতাম মুখে? ঘৃণাময় ক্রোধে সুন্দর মুখটা লাল? সোনালি চুলে ঝড়? ঠোঁটের রেখায় ব্যঙ্গ?

নাকি শুদ্ধ নিথাদ স্তম্ভিত হবার বিস্ময়! তুমি শুভময়, তুমি! উনি কি বলে উঠতেন—আমি ভাবিনি, এমন ভাবিনি! শুভময়বাবু আপনি!!

…দুঃখিত মিসেস চৌধুরী—ভেরি ভেরি সরি। ক্ষমা করবেন। বুঝতেই পারছেন, যা দিনকাল পড়েছে। আজকাল দুপুরবেলা কতসব ফ্ল্যাটে খুনখারাপি চুরি ডাকাতি হচ্ছে। কখন কে কী বেশে আসে—তাই…হেঁ হেঁ হেঁ মিসেস চৌধুরী, রিয়্যালি—আজকাল—তবে উনি যে আপনার পরিচিত, মানে আপনাদের ফ্ল্যাটে আসেন…হেঁ হেঁ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে…

আমি কাঠ হয়ে পড়ে থাকি। টের পাই, কত অসহায় আমি! পৃথিবীর ওই একটা সামান্য ব্যাপারেও কিছু করতে আমি পারি না। দিন যায়। রাত আসে। একটা করে দুপুর আসে ফের। একজন টেকো লোক গেট খুলে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে এবাড়িতে ঢোকে। কতক্ষণ আমার নিচেই একটা ঘরে কাটিয়ে চলে যায়। গেটের বাইরে গিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানায় মিসেস চৌধুরীকে। এবং এইসবও আমাকে সহ্য করতে হয়। এখন আমি সহ্য করার মালভূমিতে হাঁটছি।…

তারপর যত দিন যায়, আমি আপোসের পথ ধরলাম। মনে মনে ওর সঙ্গে আলাপ করেও ফেললাম। আমাদের মধ্যে দিব্যি কথা বলা শুরু হল—পৃথিবীর অগোচরে। মিসেস চৌধুরীরও আড়ালে।

—এই যে, এলেন দেখছি!

—হ্যাঁ। না এসে পারি নে। আপনি কেমন আছেন আজ ?

—চমৎকার। ভালো। আপনি ?

—মোটামুটি।

—যান, মিসেস চৌধুরী একা আছেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

—তাই বুঝি। হ্যাঁ, রুমা খুব ভালো মেয়ে। ওর মনটা ভালো। এত কাণ্ডের পর এখনও আমাকে ও···

—প্লীজ, একদিন আসুন না আমার এখানে। আপনার সব কথা আমি শুনবো।

—কী হবে কথা শুনে! এ ট্রাজেডি তো সবার বরাতেই ঘটছে আজকাল।

—প্লীজ, আসুন একদিন।

—যাবো। আপনার পায়ের হাড় জোড়া লাগতে আরয় কদ্দিন ?

—ডাক্তার বলছেন, আরও একটা মাস। তারপরেও কিছুদিন ক্রাচ ব্যবহার করতে হবে।

—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, ভাই। কী করবেন ?

—আপনি কি ঈশ্বরবিশ্বাসী ?

—নিশ্চয়। কেন—আপনি নন ?

—ভেবে দেখিনি।

—ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবেন।

—কী পাব, শুনি ?

—উঁ ? কী পাবেন ? সব পাবেন—স্বাস্থ্য, আয়ু···

—আপনি কী পেয়েছেন বলুন তো ?

········(দীর্ঘশ্বাস)

—বলুন, চুপ করে কেন ?

—হয়তো পেয়েছি, হয়তো পাইনি।

—কী ? প্রেম ? রুমা চৌধুরীর ভালোবাসা তো ?

—কী যে বলেন!

—তবে যে প্রতিদিন আসেন ওঁর কাছে ?

—ওটা অভ্যাস।

—কী ? কী বললেন ?

—অভ্যাস।

—অভ্যাস ?

—হ্যাঁ, না এসে পারি না। নিছক অভ্যাস। (একটু চুপ করে থেকে)···হয়তো প্রেম একটা অভ্যাস। তার বেশি কিছু নয়।

—দেখুন, একটা কথা বলব ?

—স্বচ্ছন্দে।

—আপনার এ অভ্যাসের ফলে ও'দের দাম্পত্যজীবনের শান্তি…

—হাঃ হাঃ হাঃ! হাসালেন, ব্রাদার! দাম্পত্যজীবন? রিয়েলি—আমি যেন কতকটা বলতেও আসি রুমাকে—রুমা, তুমি কি সুখে আছ, তাই দেখতে এলাম। হ্যাঁ—আমি আসলে, বুঝলেন? আমি আসলে দেখতে আসি রুমা তার দাম্পত্য-জীবনে কী সুখে আছে!

—মিথ্যে বলবেন না। আমি জানি, আপনি কেন আসেন!

—কেন?

—আপনি ওকে চুমু খান—ওকে…

—আপনি উত্তেজিত। ওতে পায়ের যন্ত্রণা বাড়বে। শরীর দুর্বল হবে।

—আপনি…আপনি একটা মতলববাজ—লম্পট মানুষ! আপনি কামনাবাসনা চরিতার্থ করতে আসেন মাত্র।

—প্লীজ, প্লীজ! কেন আপনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন?

—আমি সব বলে দেব মিঃ চৌধুরীকে। থামুন, আপনাদের গুপ্ত প্রণয়লীলা আমি ফাঁস করে দেব।

—আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছেন না তো?

—গেট আউট, গেট আউট স্কাউন্ড্রেল। আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। চৌধুরী আসুক।…

হাঁফাতে হাঁফাতে আমি জানলার রড আঁকড়ে ধরি। ও মিটিমিটি হাসে দেখতে পাই। বলে, বেশ। কিন্তু ব্রাদার, আপনার কেন এত মাথাব্যথা? আপনি কেন আমার জন্যে ওঁৎ পেতে পড়ে থাকেন? কেন আপনি আমাদের ব্যাপারে এত কষ্ট পান? জবাব দিন। চুপ করে থাকবেন না। একি আপনার নিতান্ত মরালিটির বোধ—সামাজিক বিবেকের তাড়না? প্রিয় সমাজপতি বন্ধু, বলবেন খুলে? উহুঁ—আমি জানি, এ আপনার ঈর্ষা। আপনিও আমার মতো রুমার প্রেমে বিপন্ন।

—না, না!…চিৎকার করে উঠি। গলা শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড কাসতে থাকি। আমার বোন তপতী দৌড়ে আসে পাশের ঘর থেকে।

আমি জানি না, আমি ভাবিনি। কিন্তু রুমা চৌধুরী কোন বিকেলে তপতীর কাছে এসে একবার আমার ঘরে ঘুরে যান। একটুখানি মাত্র দাঁড়িয়ে শুধু বলেন—কেমন আছেন আজ?

আমি মাথা নাড়ি। একটু হাসি। আমার মন ভরে গেল, আমার মন ভরিয়ে দিল! মনে মনে বলি,—লক্ষ্মী মেয়ে কেন আপনি অমন হবেন? আপনি একটি সৌন্দর্য—আপনার রক্তমাংসে সত্যি নেই, তা আপনি জানেন না—এবং তাই অনর্থ একটি 'অভ্যাসের' দাসত্ব করছেন। ছিঃ, আপনার কি ওই দেহজ সুখদুঃখ শোভা পায়? হ্যাঁ—পুরোপুরি আপনি একটি সুচারু সৌন্দর্য। ফুলের ভাঁজগুলো

খুলে কিছু নগ্ন নরম পরাগ বিপন্ন হতে দেওয়া মানে একটি সুগন্ধের মৃত্যু। আপনার কি হাত কাঁপে না আপন যমজ সন্তান ওই বর্ণ ও গন্ধকে খুন করতে ?

উনি চলে যান। আমার ঘরে রেখে যান সেই সুন্দর অল্প হাসিটি, এবং কিছু সুঘ্রাণ, এবং কিছু বিমূর্ত রূপ। ঘর জুড়ে তারা ছড়িয়ে থাকে। ঘর ভরে ওঠে। একসময় আস্তে আস্তে সেই ঘরভরা বিমূর্ত রূপ ও গন্ধের মধ্যে আমি আরামে রাত্রিটা কাটিয়ে দিই। ক্ষমা করি রুমা চৌধুরীকে। ঈশ্বরকে খুঁজতে খুঁজতে বলি, যদি উনি পাপী হন, ওঁর সব পাপ আমার যদি কিছু পুণ্য থাকে তার বদলে ক্ষমা করে দিও, কেমন ? আর দ্যাখো, ঈশ্বর—তুমি বুড়ো হয়ে গেছ বড্ড, তোমার আলখেল্লাটাও ভারি জীর্ণ, ওটা বদলে নিও—কারণ, সম্ভবত এখন থেকে প্রেম সৌন্দর্য বিবেক এইসব চমৎকার গুণগুলোর দিকে তোমার অন্যচোখে তাকানো দরকার। তোমার পৃথিবী এবং মানুষও তো অন্যরকম হয়ে গেছে। ওহে বুড়ো বন্ধু, তুমি জানো না—তুমিও সময়ের এক ক্রীতদাস।...

তারপর দিনগুলো যায়, রাতগুলো যায়। হঠাৎ একদিন দেখি, সেই টেকো লোকটা আর আসে না। আর আসেই না। আমি বিছানা ছেড়ে ক্রাচে হাঁটতে শুরু করি। অথচ আর পাত্তা নেই সেই নির্জন দুপুরের প্রেমিকের। কী ঘটল ? ব্যস্ত হয়ে উঠি। ক্রাচে ভর দিয়ে সোজা নেমে যাই দোতলার চার নম্বর ফ্ল্যাটে। দুরু দুরু বুকে ঘণ্টার চাবি টিপি। রুমা চৌধুরী দরজা খুলে বলেন, আপনি! আসুন—আসুন। হাঁটতে পেরেছেন তাহলে !

কোন পরিবর্তন দেখি না ওঁর মধ্যে। ভয় পেয়ে যাই। একথা ওকথার পর দুম করে বলে ফেলি—আচ্ছা মিসেস চৌধুরী, আগে বরাবর দুপুরবেলা দেখতাম—এক ভদ্রলোক মাথায় টাক···

কথা কেড়ে নেন রুমা। কিন্তু নির্বিকার বলেন—দেখতেন বুঝি ? হ্যাঁ—ও একজন ইয়ে—মানে, চেনা আর কী। আত্মীয়মতো—বলতে পারেন। কেন ?

—না, মানে এমনি। প্রায়ই দেখতে পেতাম—তাই বলছি।

—বসুন। যা গরম পড়েছে! কোল্ড খান কিছু। বলে উনি ফ্রিজের দিকে হেঁটে যান।

—মিসেস চৌধুরী !

—উঁ ? ফ্রিজের হাত ধরে উনি সাড়া দেন।

—সে ভদ্রলোক আর আসবেন না ?

—হয়তো না। কেন ?

—খুব চেনা মনে হত। কোথায় যেন দেখেছি। তাই ভাবতাম, আলাপ করে জেনে নেব।

আরে, সে এক কান্ড! ভবঘুরে টাইপ—চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাল। মাস তিনেক হল কলকাতায় ফিরেছে। একদিন এসে বলল, তুমি তো ফ্রেঞ্চ শিখতে উঠে-

পড়ে লেগেছ। আমি তোমাকে শেখাব। আসতে লাগল। মাই গুডনেস! কিছু-দিনের মধ্যেই টের পেলাম—চালিয়াতি! আমি যট্টুকুন জানি, তা ও জানে না! মাঝখান থেকে এক কাঁড়ি টাকা মেরে দিল। আমার কর্তা তো রেগে আগুন। বিলেটাকে তুমি পাত্তা দি-লে কেন? কী মুসকিল! আমি কী করব বলুন তো! সম্পর্কে ওর আত্মীয় তার ওপর…এই নিন।

হাসতে হাসতে ভীষণ ঠাণ্ডা এক বাটি আইসক্রিম আমার হাতে তুলে দেন রুমা। উনি কি মিথ্যে বললেন? উনি কি সবটাই সত্যি বললেন? আমার সব সংশয় ঈর্ষা ঘৃণা কৌতূহল—আমার অনুভূতি পলকে পলকে রুমা চৌধুরীর ঠাণ্ডা মারাত্মক বস্তুটি গ্রাস করে ফেলছে টের পাই। আমি নিঃসাড় হয়ে পড়ি। আঃ, সৌন্দর্য, আপনি এমন শীতল! আপমি কি এমনি বোধশূন্যতার দিকে ঠেলে দিতে অভ্যস্ত মানুষকে?

সেই সোনালি হাতের দেওয়া রক্তিম জমাট বোধশূন্যতায় তবু পিপাসী ঠোঁট রাখি—আনত।

কোন কথায় কী ঘটে যায়, কেউ বলতে পারে না। কুমকুম যখন বলল, 'আর একটু বসুন না বাবা, এত তাড়া কিসের'—মুহূর্তে ধরা পড়ল ওকে আমার ভালো লেগে গেছে।

অবশ্য এই ভালো লাগা ঠিক ভালোবাসা নয়—একটা ক্ষীণ সূত্রপাত হতেও পারে। পর-পর অনেকগুলো গান কুমকুম গেয়েছে। খুব আবেগ ছিল গলায়। এ সময় সন্ধ্যার খাবলা-খাবলা ছায়া জমছিল পাহাড়ের খাঁজে, আবহাওয়াটাও ভারি চমৎকার, গাছপালায় পুষ্পিত অর্কিডের ঘাগরা। এ সময় যে-গলায় গান গাওয়া হোক না, ভালো লাগবে সবার।

কিন্তু গানকে রেহাই দিয়ে তখন কুমকুমকে ভালো লেগে উঠল প্রচণ্ডভাবে। মনে হল, এখন যদি খেলনার মতো ওর একটা হাত হাতে তুলে নিই, ও বাধা দেবে না। ওর চেহারায় মৃদু আত্মসমর্পণের চঞ্চলতা টলটল করছিল যেন। আজ তিনদিন তিনটি রাত এই অবকাশভোগী ছোট্ট পরিবারে এসে উঠেছি ওর অন্ধ স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্বতার সূত্রে। এর মধ্যে কতবার কত মুহূর্ত গেছে ঘনিষ্ঠ হবার মতো, সাহস পাইনি। এখন কিন্তু আমার মধ্যে ভীতু লাম্পট্য গুটিসুটি ঘুরঘুর করতে থাকল। অমরেশটার কোন মানে হয় না। স্রেফ নিজের সঙ্গীতপ্রতিভার দামে এখন একটি সুরম্য যৌবন কিনে ফেলেছে, ঈর্ষায় বন্ধুত্ব ও যাবতীয় বন্ধুত্বমূলক স্মৃতি দাউদাউ জ্বলে ছাই হয়ে গেল।

অনেক বর্ণাঢ্য মূল্যের গায়ে প্রজাপতিদের ওড়াওড়ি করতে দেখেছি, কষ্ট হয়নি কিংবা চোখ টাটায়নি। কবি তো বলেই গেছেন যত্তো সব 'সোনার পিত্তলমূর্তি'!' কিন্তু মোটামুটি মধ্যবিত্ত, কিছুটা খ্যাত এবং পুরোপুরি জন্মান্ধ একটি লোকের পাশে কোন মোটামুটি সুন্দরী মেয়ে অকাতরে ঘুমোতে পারে, এটা ভারি অসহ্য লাগে। টাকা দিয়ে খাসা বউ কিনেছ এ এক কথা, আর গানটান গেয়ে বউ কিনেছ আরেক কথা। টাকা তো বেশ ধান্দাবাজী আর কুবুদ্ধি খরচ করে যোগাড় করা যায়—কিন্তু গানটানের ব্যাপারটা অনেকখানিই প্রকৃতির দান নয় কি? আসলে গলা যার নেই, হাজার সাধনাতেও সেখানে কী গানের ফুল ফোটাতে চাও? আর, অন্ধদের নাকি প্রকৃতি এই গুণটা পুষিয়ে দেয় বেশ। অমরেশ তাই ভাল গাইয়ে হয়েছে। এটা ওর জন্যেই স্বাভাবিক।

এই মুহূর্তে আমার আরেকটা ভাবনা মাথায় এল। অমরেশ তো জানেই না, ওর বউ দেখতে কেমন। পৃথিবী কিংবা বস্তু কিংবা শূন্যতার ধারণা ওর কাছে কোন-কোন বা কী ধরনের প্রতীকে ধরা পড়ে কে জানে। অন্ধরা বস্তুকে বোঝে,

স্তুর রূপ বোঝে না। অতএব ধরেই নিলুম, অমরেশ কুমকুমের শরীর যতটা বোঝে, কিংবা শ্রুতি-ক্ষমতার দরুন কণ্ঠস্বর—মন তো বোঝেই না, কারণ মনের প্রায় সব মাভাষই রূপে ফুটে ওঠে না। আর, চোখ বন্ধ করে কথা শুনলে শুধু কথাই শোনা যায়—কথার মানে কি বোঝা যায়?

কুমকুমের কথায় আমি বসে পড়েছিলুম। দু টুকরো কালো পাথরের ওপর পাশাপাশি দুজন মানুষ—মধ্যে ছ'ইঞ্চিটাক ফাঁক কিছু শুকনো ঘাসে ভরা।

বললুম, 'আপত্তির কিছু নেই—বলছি। একটু পরে চাঁদ ওঠার কথা আছে। বেশ রোমাণ্টিক সময় এটা। তবে ও একা রয়েছে, ভাবনা করবে নাকি…'

কুমকুম বলল, 'কিছু করবে না। ও এতক্ষণ তানপুরা নিয়ে বসেছে। আপনার ক্লাসিক ভালো লাগে না?'

'নিশ্চয় লাগে। আপনি ক্লাসিক গান না?'

'একটু-একটু।'

'শুরু করুন। পুরবীর সময় এখন।'

অভ্যাসমতো একটু কেসে কুমকুম পুরবীর তান ধরল। কিন্তু তক্ষুনি বন্ধ রে কিছুটা দূরে নিচের রাস্তার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'দেখুন দেখুন—কতসব নাচ যাচ্ছে।'

'হুঁ। আদিবাসীরা হাট থেকে ফিরছে।'

'কিন্তু নাচতে নাচতে যাচ্ছে কেন?'

'মাতাল হয়েছে, তাই। পুরবীর কী হল?'

'পালিয়েছে!' বলে হেসে কুমকুম আঙুল দোমড়াতে থাকল।…'ভ্যাট্! সব ময় শুধু গান নিয়ে থাকতে ভাল লাগে?'

'আমি তো জানি, গাইয়ে যাঁরা—তাঁরা সারাক্ষণ গান নিয়ে থাকতেই পছন্দ রেন। যেমন লেখকরা সব সময় মনে মনে হাজার গোলমালের মধ্যেও লেখা চালিয়ে ন—ওটাই অভ্যেস।'

কুমকুম দ্রুত বলল, 'আমি কি গাইয়ে নাকি? একটা স্পেশাল টেস্ট মাত্র।'

দুম করে বলে বসলুম, অমরেশকে বিয়ে করেছেন কিন্তু গান শিখতে গিয়ে—পশাল টেস্ট?'

কুমকুম খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর গম্ভীর হতে চেষ্টা করে বলল, সব থাক। আপনি সেই অদ্ভুত ইঁদুরগুলোর গল্প আবার বলুন। সত্যি কি রা দল বেঁধে সমুদ্রে গিয়ে আত্মহত্যা করে? একজনও কি যেতে যেতে দিক বদলায় ? ভ্যাট্, সে অসম্ভব।' আপনি আর একটা গল্প বলুন।'

আমি টের পেলুম দুঘণ্টা ধরে সবকিছু স্বাভাবিক চলছিল দিব্যি, হঠাৎ কেন ন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। কুমকুমের মধ্যে অন্যমনস্কতা এবং চঞ্চলতা থমথম রছে। এবং আমিও মনে মনে খানিকটা উপদ্রুত। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললুম,

আপনি যতগুলো গান জানেন, তার এক সহস্রাংশ গল্পও আমার জানা নেই।'

'যা হয়, একটা কিছু বলুন। চুপচাপ থাকতে ইচ্ছে করেনা।'

কুমকুমকে উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। দূরের কালো একটা স্তূপের দিকে আঙুল তুলে বললুম, 'ওখানটায় গেছেন কখনও?'

'না তো। কী আছে ওখানে?'

'ওটা একসময় ছিল দুর্গ। অনেক ভূতের গল্প চালু আছে। একবার…'

কুমকুম একটু সরে এল।…'বলুন, বলুন—শুনি।'

'একবার আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ওখানে রাত কাটাচ্ছিলুম। পরিষ্কার জ্যোৎস্না ছিল। আর, বুঝতেই পারছেন আমরা বেশ খানিকটা মাতাল হয়ে পড়েছিলুম। রাত তখন বারোটার বেশি। হঠাৎ দেখি সাদামতো কী একটা বসে আছে কিছু তফাতে—ভাঙা পাঁচিলের ওপর, তার নিচে একটা গভীর মজা কুয়ো রয়েছে। আমি কাকেও কিছু না বলে দৌড়ে চলে গেলুম—আর অমনি মনে হল সাদা কাপড়পরা একটা মূর্তি উঠে দাঁড়াল। তারপর কাছে যেতে-না-যেতেই ভীষণ নিঃশব্দে কুয়োয় ঝাঁপ দিল—যেমন করে খানিকটা তুলো পড়ে যায়।'…

কুমকুম আরো সরে বলল, 'তারপর, তারপর?'

'প্রথমে ভাবলুম সবটাই হ্যালুসিনেসান—মত্তাবস্থায় কী দেখতে কী দেখেছি। কিংবা পুরো কল্পিত দৃশ্য। পরে ভাবলুম' তা কেন হবে? দিব্যি সব ইন্দ্রিয় টনটনে আছে—এতটুকু বুদ্ধি গুলিয়ে যায় নি। যা দেখেছি, তা একটুও মিথ্যে নয়। তখন বুক কেঁপে উঠল। ওদের ডাকলুম। টর্চ ছিল সঙ্গে। ব্যাপারটা বলতেই টর্চের আলো ফেলা হল কুয়োর মধ্যে। তখন দেখি কী জানেন?'

কুমকুম রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কী দেখলেন, কী দেখলেন?'

'একপাশের দেয়ালে ফাটল থেকে গাছ গজিয়েছে—তার ওপর একটা সাদা কাপড় পড়ে রয়েছে। কাপড়টা ধুতি নয়—যেন সাদা শাড়িরই অংশ—খানিকটা ছেঁড়া। আমাদের কাছে এমন কিছু নেই, যাতে ওটা টেনে তুলে পরীক্ষা করি। কতক্ষণ পরে আমরা চলে এলুম। গাড়ি ছিল সঙ্গে। গাড়িতে ফেরার পথে আর কোন গণ্ডগোল হয় নি।'

কুমকুম একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দিনে গিয়ে আর পরীক্ষা করেন নি?'

'করেছিলুম। তবে মজার কথা, কাপড়ের টুকরো একটা ওইভাবেই আটকানো ছিল—কিন্তু রাতে যত সাদা মনে হয়েছিল, তত নয়। ময়লা ছেঁড়া খানিকটা ন্যাকড়া মাত্র।'

ঘাড় ঘুরিয়ে চাঁদ ওঠা দেখে কুমকুম বলল, 'কতদূরে জায়গাটা?

'যেতে ইচ্ছে করছে নাকি?'

"হুঁ-উ!'

'কিন্তু ভূতকে ভীষণ ভয় পান মনে হচ্ছিল যে?'

'সঙ্গে কেউ থাকলে ভয় কিসের ? চলুন না একবার—কতদূরে ?'

'সে কী ! অনেকখানি হাঁটতে হবে—আধঘণ্টা লেগে যাবে। তাছাড়া এদিকটা খুব ভালো এলাকাও নয়। প্রায়ই ছিনতাই হয়।'

কুমকুম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার কী নেবে ? এই কাচের বালাদুটো ? কানের পাথরটাও তো ঝুটা পাথর থাকে বলে ! আপনার অবশ্য ঘড়ি আছে। লুকিয়ে ফেলুন।'

কুমকুম গয়না পরে না—সেটা দেখছি, প্রসাধনেও খুব আসক্তি নেই—কেমন নিরামিষ টাইপ মেয়ে। ওর শরীরে বা চেহারায় প্রকৃতি যা দিয়েছে, হেসেখেলে তাই দিয়ে অনেক দীর্ঘ যৌবন কাটানো যায়। এবং সেজন্যেই হঠাৎ পুরুষের চোখে চমক আনার মতো মেয়ে না হলেও পরে—ক্রমশ গভীরতর চমকগুলো একে একে বেরিয়ে যেকোন পুরুষকে অসহায় পোষ্য ও নির্বোধ করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল। প্রথমদিকে ওর সম্পর্কে অসামাজিক কিছু ভাবিই নি—পরে ক্রমশ দেখছি ওর অস্তিত্ব থেকে একটা করে পাপড়ি খুলছে। এবং চোখ ট্যারা করে দিতে এ সবের জুড়ি নেই। এখন তো বলতে ইচ্ছে করে, অমরেশ, তুই পাচ্ছিস কী ? শুধু তো একরাশ নরম মেদ—কসাইরা যা পায়।

ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'সত্যি সত্যি যাবেন বলছেন ?'

কুমকুম ঝট্ করে আমার হাত ধরে টানল।…'ভ্যাট ! বেড়াতে এসে চুপচাপ বসে থাকার মানে হয় না ! দেখব-শুনব-ঘুরব—ছটফট করব, তবে না আনন্দ !' আমরা যখন ঢালু বেয়ে সাবধানে নামতে শুরু করেছি, তখন ও ফের বলল, 'সত্যি, আপনি না এলে কী যে করতুম ! ওতো বেশিদূর হাঁটতেও পারে না—তাছাড়া বাইরে থাকতেও চায় না বেশীক্ষণ। রেওয়াজ নষ্ট হবে যে ! দুপুরে সেঁই নিয়ে লেগেছিল—'

'আপনাদের তাহলে লাগে ?' হাসতে হাসতে বললুম কথাটা।

'আপনি বিয়ে করেন নি তো—তাই জানেন না। তবে দাম্পত্যজীবনের এই একটা আনন্দ। একটু-আধটু না লাগলে চলে ? প্রেমভালবাসা একঘেয়ে হয়ে উঠবেই।'

'বাঃ ! বলুন—শুনে অভিজ্ঞতা হচ্ছে।'

'আমার পরামর্শ' নিতে চান তো শুনুন—যখন বিয়ে করবেন, খোঁজ নেবেন ঝগড়া করার ক্ষমতা আছে কিনা।'

'বলেন কী ! ঝগড়া করতে ক্ষমতার দরকার হয় ?'

'নিশ্চয় হয়।' কুমকুম একটা ছোট্ট পাথর ডিঙোবার সময় পাথরটায় উঠে আমার দিকে হাত বাড়াল—পড়ে যাবার আশঙ্কায় নিশ্চয়, এবং আমি হাতটা নিলুম এবং নেমে গেলে ছেড়ে দিতে গেলুম, ও ছাড়ল না। অজস্র পাথর পড়ে আছে এখানটায়। অল্প জ্যোৎস্নায় সাবধানে চলতে হচ্ছে। একবারের জন্যে হঠাৎ মনে হল, প্রকৃতির রাজ্যে গিয়ে পড়লে যেন অনেক ঘোরালো সমস্যার সমাধান খুব সহজেই

হয়ে যায়। কুমকুম ফের বলল, 'সবার এ ক্ষমতা তো থাকে না। আমার ছিল না। এখন একটু একটু আসছে। এরপর কবে দেখবেন হয়তো দিনরাত আপনার বন্ধুর সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছি!'

সকৌতুকে বললুম, 'অমরেশটা নির্ঘাৎ হেরে যাবে!'

'উঁহুঁ। মোটেও না।'

'সে কী! ও তো ভীষণ গোবেচারা ছেলে ছিল বরাবর।'

'সেজন্যে নয়—ওর আত্মরক্ষা কিংবা আক্রমণের বড় অস্ত্র আছে।'…কুমকুম খুব শান্তগলায় বলে উঠল।…'সেটা কী জানেন তো?'

'না।'

'সঙ্গীতসাধনা।'

আমরা রাস্তায় নেমে এসেছি এতক্ষণে। ভ্রমণবিলাসীদের দু'একটা গাড়ি সুতীব্র আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে—দুজনে একপাশে সরে দাঁড়াচ্ছি—ধুলো এবং রাস্তাটাও সংকীর্ণ। যেদিকে আমাদের কটেজ, তার উল্টোদিকে একটু হেঁটে বললুম, 'তাহলে সত্যি যাবেন ওখানে?'

'হুঁ। তবে কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'সাপটাপ থাকতে পারে। আলো নেই সঙ্গে।' …চিন্তিতভাবে বললুম। এবং সত্যিসত্যি সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখন আমার মনের ভিতর বিশালতর আর দুর্গম আর রহস্যময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অজস্র রক্তঠাণ্ডাকরা ভুতুড়ে ব্যাপার যেন সেখানে ওঁৎ পেতে রয়েছে। সেইসঙ্গে অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চকচক করছে অসংখ্য পিছল জিভ, ভীষণ পাশব এবং হিংস্র, অচরিতার্থ এবং ক্ষুধিত। সহস্রকোষী অতিকায় প্রাণীর মতো সেই ভাঙা দুর্গ হাঁটু চাটতে চাটতে চারদিকে নিঃশব্দে কোষবিভাজন করছে—সেই থলথলে আঠালো জ্যান্ত কোষগুলো ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। গাছগুল্ম লতাপাতা ঘাসে লালায় ভিজে যাচ্ছে। অথচ কী প্রচণ্ড নিবিড় আকর্ষণ তার! আমার প্রাণীজ সত্তাকে সে ক্রমাগত প্ররোচিত করে চলেছে।

কুমকুম বলল, 'আরে! এই আপনার ভূত দেখার পরিণতি? যার ভূত একবার দেখা হয়ে গেছে, সে কেন ভূতের ভয় করবে? আসুন!'

প্ররোচনার মতো লাগল। পা বাড়ালুম।

'চলুন—মন্দ লাগবে না। তবে ভূতের কোন গ্যারান্টি থাকে না কিন্তু।'

দুজনে একই সঙ্গে হেসে উঠলুম। তারপর কুমকুম গুনগুন করে উঠল।…

নারী ও জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল ছিল, আছে, ওই পোড়ো দুর্গে না গেলে জানতে পারতুম না সে রাতে।

এদিকে আত্মসমর্পণের মৃদু গন্ধে চৈত্রের অস্থির বাতাস যাচ্ছিল ভরে। শব্দময়

উচ্চারণে স্পন্দিত হতে এবং ফেটে ছড়িয়ে যেতে চাচ্ছিল একটা গভীর বোধ। অথচ কোথাও চুপিচুপি পাহারা দিচ্ছিল একটা বাধা—দেখতে পাচ্ছিলুম ক্ষণেকের জন্যে সেই ভয়ঙ্কর হাবসী প্রতিহারীর শিরস্ত্রাণ। সে কি নীতিবোধ? বিবেকবুদ্ধি? বারবার সে মনে পড়িয়ে দিল, অমরেশ অন্ধ—অমরেশ অন্ধ মানুষ। দূরে শৈশবের দেখা একটা বিবর্ণ পড়ার বইয়ের পাতা ভেসে এল—অন্ধকে দয়া করো।

প্রকৃতির সৌন্দর্য বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। কে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় অনন্তকাল নির্জন জ্যোৎস্নায়? বর্ণাঢ্য পুষ্পবিলাস একসময় চক্ষুশূল হয়। ঐতিহাসিক দুর্গের রহস্যময়তা, বসন্তকালের অল্পভাষী জ্যোৎস্না, প্রকৃতির করতলগত এই ভূমি—আস্তে আস্তে অপ্রয়োজনীয় হয়ে এল। অন্তিম আশ্রয়ের মতো সামনে রইল শুধু কুমকুম নামে এক নারী। তাকেই ভাল লাগল যে ভালোলাগার শেষসীমা কোথায় আপাতত দেখা যাচ্ছিল না। আমি শুধু ওর দিকেই তাকিয়ে রইলুম। ও অনর্গল কথা বলছিল এবার। ওর ছেলেবেলার গল্প, ওর পারিবারিক কিছু ঘটনা, এমনকি নিজের বিয়ের গল্প। বাবা-মায়ের সম্মতি না নিয়েই ও অমরেশকে বিয়ে করেছে—রাতারাতি রেজিস্ট্রি করে অমরেশের কাছে উঠেছে। খুব হঠাৎ ঘটেছিল ব্যাপারটা। একটা উগ্র ধরনের ঝোঁক চেপেছিল মাথায়। হ্যাঁ, ভাবা যায় না যে নিতান্ত গানের ছাত্রী হতে গিয়ে এরকম একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যাবে। অ্যাকসিডেন্ট? এখন তো তাই মনে হয় ওর। তবে কি ও অসুখী হয়েছে এ বিয়েতে? সেটা বলা খুবই কঠিন ওর পক্ষে। তবে মাঝে মাঝে কোন-কোন সময় হঠাৎ একটু বিরক্তি আসে নিজের ওপর। এটুকুই বলা সহজ। তা, গান নিয়ে ডুবে থাকলেই পারে! উঁহু, পারে না। কারণ, এতদিনে আবিষ্কার করেছে গানে ওর সহজাত ক্ষমতা কিছু নেই—নেহাৎ সখ। অমরেশ কিছুকাল ক্লাসিক শেখাচ্ছিল, দম নেই—ছেড়ে দিয়েছে। আসলে আস্তে আস্তে গান ব্যপারটা যেন ওকে ছেড়ে যাচ্ছে। ও স্পষ্ট টের পায়। এবং ভালোই লাগে। স্বস্তি আসে। কিন্তু অন্য কিছু তো দরকার—যা নিয়ে থাকবে! পড়াশুনো? এম-এটা দিতে ইচ্ছে করে—এখনও মাথায় আছে। তবে, এক ছটফটানি নিয়ে পাশ করা কোনদিনও হয়তো সম্ভব হবে না। একটা গুরুতর ঝড় উঠছে মনে হয় খালি। ব্যারোমিটারের পারা চঞ্চল হয়ে উঠছে ক্রমশ। '...আমি, আমি ভীষণ—ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। জানিনা, শেষঅব্দি কী ঘটবে!'

কুমকুম চুপ করে সামনে পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে রইল।

এতসব আমাকে জানাবার কী দরকার ছিল ওর? আমি তো ওর স্বামীর বন্ধু! আমাকে এসব জানানো শোভন যেমন নয়, তেমনি সঙ্গতও নয়। আমাকে কেন বেছে নিল কুমকুম? নিছক বলে ফেলে হাঁফ ছেড়ে হাল্কা হওয়া? কেন—ওর বান্ধবী নিশ্চয় আছে কেউ-না-কেউ, তাদের বললেই সঙ্গত হত। একজন পুরুষকে যেচে পড়ে এসব শোনানো উচিত হল কুমকুমের—যে পুরুষ কিনা স্বামীর বন্ধু?

ওর স্বামীর এই বন্ধুর মধ্যে একটা ভীতু বোকা লাম্পট্য প্রায়ই চনচন করে ওঠে, ও জানে না। বস্তুত এমন একেকটা সময় এসে যায়, যখন চরিত্রহননের কাড়ানাকাড়া বেজে ওঠে শরীরে।

অথচ কুমকুম অতসব কথা বলার পর লক্ষ্য করলুম, আমার মধ্যে একটা ঠাণ্ডা নিঃসাড়তা জেগেছে। ওর গভীর কণ্ঠটা খুব স্পষ্ট হয়ে আমার অনেকখানি মমত্ব প্রার্থনা করছে। আমি আস্তে আস্তে বললুম, 'কেন অতসব ভাবেন? সকলেরই জীবনে কোন না কোন সমস্যা থাকে। না থাকাটাই সন্দেহজনক। তাই বলে আমরা তো সেই ইঁদুরজাতীয় অদ্ভুত প্রাণীগুলোর মতো দলবেঁধে সমুদ্রে মরতে যাইনে! দিব্যি আমরা বেঁচে থাকি।' হাসতে হাসতে আরও বললুম, 'একবছর পরে ফের যদি কোথাও দেখা হয়, হয়তো দেখব—চমৎকার সংসারী হয়ে ঘরকন্না করছেন। শুনেছি, প্রেমে ব্যর্থ মেয়েরা দারুণ হাউসওয়াইফ হয়ে ওঠে।'

কুমকুম হাসল না। ক্ষুব্ধভাবে বলল, 'আমি তো ব্যর্থ মেয়ে নই!'

মেয়েদের সঙ্গে জটিল আলোচনা করতে আমার ভালো লাগে না। বললুম, 'বেশ তো, তাহলে তো ভালই আছেন বলব।'

কুমকুম বলল, 'একদিক থেকে খুব ভালো নিশ্চয়।' তারপর একটু হাসল। ...'স্বামীভাগ্যে আমি ভাগ্যবতী বলতে পারেন। যখন বিয়ের জন্যে তৈরী হচ্ছি, অনেকে বলেছিল অন্ধরা ভীষণ কুচুটে হয়, ঝগড়াপ্রবণ হয়! চোখে দেখতে পায় না বলেই তো...'

হঠাৎ থেমে সে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, 'ওটা কী?'

আমরা বসেছিলাম একটা বড়ো পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে—মধ্যে আগের মতো ছ' ইঞ্চি ফাঁক, জ্যোৎস্না পড়েছিল উঁচু পিছনের দেয়াল টপকে। কুমকুম একেবারে গা ঘেঁষে চলে এল সঙ্গে সঙ্গে। আমি ওকে না ধরলে পড়ে যেত নিচে। বললুম, 'কই কী?'

কুয়োর দিকটা দেখিয়ে কুমকুম বলল, 'আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনে; কিন্তু হঠাৎ মনে হল, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।'

'আপনার চোখের ভুল নির্ঘাৎ। ওই গল্পটা বলেছিলুম কিনা!'

কুমকুম একটু হাসল। ...'কিন্তু বুক ঢিপঢিপ করছে। বিশ্বাস করুন, ভীষণ ভয় পেয়েছি।'

আমি একলাফে নিচে নামলে কুমকুমও নেমে এল তক্ষুণি।...'দেখে আসি না—যদি এবারও আগের মতো কিছু মিরাকলের নমুনা পাই।'...বলে আমি প্রাঙ্গণে হাঁটতে থাকলুম। কুমকুম পাশে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করল।

কুয়োঅব্দি এসে আমরা দাঁড়ালুম। চারপাশে মোটামুটি ফাঁকা হলেও অজস্র উঁচুনিচু পাথরের টুকরো বা ভাঙা পাঁচিল রয়েছে। কিছু ঝোপঝাড় আর একটা করে গাছও আছে। আমার মনে একটুও ভয়—অর্থাৎ ভূতের ভয় নেই। কিন্তু

কুমকুমকে কিছুটা আড়ষ্ট মনে হল। সে সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ওকে আশ্বাস দিয়ে বললুম, 'কোথায় কিছু নেই। আর বসবেন, নাকি ফিরে যাবেন?'

সেই সময় একটা বাতাস এল। কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের গায়ের ওপর লাফালাফি করে চলে গেল। কুমকুম আবার ভয় পেয়ে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী মুশকিল! এত ভয় পাচ্ছেন মিছিমিছি, অথচ···'

কুমকুম আমাকে ছেড়ে মুখোমুখি ফিসফিস করে বলল, 'ভয় পেতে কিন্তু ভালো লাগছে!

'তাই বুঝি!'

হুঁ! এক্ষুণি আবার যদি কেউ কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে—ভীষণ ভয় পাব আর ভীষণ ভালো লাগবে!'

এই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত দৃশ্য কেন জানিনা আমাব মনে ভেসে উঠল। একটি মেয়ে—অবিকল কুমকুমের মতো, জ্যোৎস্নাময় এই উঠোনটায় শুয়ে দুহাতে প্রতিরোধ করছে, ঠেলে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে একটা পুরুষকে; সেই পুরুষের মুখমণ্ডলে চোখের বদলে দুটো কালো গর্ত—হয়তো দুটো ঠুলি, এবং মেয়েটি যেন হেসেও উঠছে—ঝড়ের মধ্যে ফুলেব ছটফটানির মতো। যত ভাবলুম, এটা ভাবব না—তত বেশি দৃশ্যটা ভেসে উঠতে থাকল।

কী বলব, ভেবে পাচ্ছিলুম না। আমার মধ্যেকার ঠাণ্ডা ভাবটা বেড়ে যাচ্ছিল। খুব চেষ্টা করলুম, আবার গরম হয়ে উঠতে—পারলুম না। আমার ইচ্ছে করল, কুমকুমকে বলি—অমরেশকে ছেড়ে আমার পাশে চলে এসো, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট। তোমাকে ভালবাসতে পারব মনে হচ্ছে; এবং কুমকুম, অন্ধদের কোথাও যেন একটা দারুণ হিংস্রতার ব্যাপার থাকে, ক্ষমাহীন বিবেকহীন নিষ্ঠুরতার ছুরি তারা আড়ালে রেখে জীবনযাপন করে—সেই অনিবার্য দুর্ঘটনা তোমার এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু ঠাণ্ডায় জমে গেলুম যেন। দেখলুম, আমি ভারি ক্লান্ত। এই রহস্যময় দুর্গের সকল রহস্যের অবসান হয়েছে। পড়ে আছে কিছু পাথরের টুকরো আর বানানো ভয়। এখানে সব অলৌকিকই এখন বানিয়ে নিতে হচ্ছে।

'চলুন—ফেরা যাক্। অমরেশ ভাববে।'

কুমকুম অনিচ্ছুক ভঙ্গীতে বলল, 'ফিরবেন? আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু ও ভাববে।'

'ও ভাববে না।'

'বারে! অচেনা জায়গা—'

কুমকুম আমার একটা হাত হাতে তুলে নিল নিঃসংকোচে।…'আপনার সঙ্গে বেরিয়েছি, ওতো জানে?'

একটু ইতস্তত করে বললুম, 'তাহলে—এখানেই বসা যাক্।' বলে প্রাঙ্গণের শক্ত চত্বরে বসে পড়লুম। তারপর ফের বললুম, 'একটা শর্ত। ভূতটুত নয় আর। গান শোনান!'

কুমকুম সুন্দর হেসে বলল, 'ভাগ্যিস এতদিনে একজন শ্রোতা পেয়েছি। ওর কাছে যারা আসে, তাদের তো আমার গান ভালো লাগবার কথা নয়—উচিতও নয়।'

'অমরেশ তো শোনে!'

'হ্যাঁ—শোনে, এবং পিঠ চাপড়ে বলে—তোমার হবে, চালিয়ে যাও।'

'হবে টবে আমি অবশ্য বুঝি না। আপনার গান তো ভালই লাগল।'

কুমকুম গাইতে লাগল। আমি অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ছিলুম অন্যদিকে। হঠাৎ মনে হল, বেশ খানিকটা দূরে পাথর আর ঝোপের মধ্যে কী একটা চলন্ত জিনিস। অমনি লাফিয়ে উঠলুম। চেঁচিয়ে বললুম, 'কে, কে?'

কুমকুম গান থামিয়ে হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল!'

কোন সাড়া এল না। কিন্তু এতক্ষণে টের পেয়ে গেছি, আমাদের সত্যি ফেরা উচিত। বারবার নিজেদের বানানো ভয়ে আমাদের তাল এরপর ক্রমাগত কাটতেই থাকবে।…

কটেজে ঢুকে অমরেশের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে আমরা অবাক হলুম। রাঁধুনি বা চাকর একজন স্থানীয় লোক। সে ঘরের ভেতর উঁকি মেরে বলল, 'ছিলেন তো! কখন বেরিয়েছেন, বলে যাননি দেখছি! এখানটায় বড় চোরের উপদ্রব—সর্বনাশ, কিছু হারায়নি তো, মা?'

কঠিনমুখে কুমকুম দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে ছিটকে বেরিয়ে গেল। আমি বেরিয়ে এসে বললুম, 'কোথায় যাচ্ছেন এমন করে? নিশ্চয় সামনের রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়েছে। এক্ষুনি ফিরবে। বেশিদূরে যেতে পারবে না তো!'

কুমকুম দাঁড়াল না। তখন আমি ব্যস্তভাবে আমার ঘর থেকে টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। একদৌড়ে কুমকুমকে ধরে ফেললুম। কুমকুম সেই দুর্গের দিকেই যাচ্ছিল। তাহলে কি দুজনেই যা দেখেছি, তা ভুল নয়—এবং…

কেউ কোন কথা না বলে হনহন করে এগোচ্ছি। কিছুদূরে গিয়ে আমার মনে হল, এভাবে বোকার মতো না খুঁজে ওর নাম ধরে ডাকি। কিন্তু যা ভাবছি, তা যদি হয় ও কি সাড়া দেবে?

তবু ডাকতে লাগলুম বারবার—'অমরেশ! অমরেশ! অমরেশ।'

কোন সাড়া এল না। ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে গেল।

পোড়ো দুর্গটার কাছে আবার জোরে চেঁচিয়ে ডাকলুম। অশান্ত বাতাসে

ডাকটা এলোমেলো হয়ে কোথায় ভেসে গেল। কুমকুম হঠাৎ আমার হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নিল। তারপর সামনের পাথরছড়ানো ঝোপঝাড়ে ভরা মাঠটার দিকে এগোল। যেভাবে ও হাঁটছিল, যেকোন মুহূর্তে আছাড় খেয়ে হাড় ভাঙার সম্ভাবনা। ঝোপের কাঁটায় ওর কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছিল ফরফর করে, তাও লক্ষ্য করলুম। এদিক-ওদিক টর্চের আলো ফেলছিল কুমকুম।

কিছুদূর যাবার পর সামনে পাকা রাস্তাটা ঘুরে গেছে মনে হল। ডাইনে পাথরভরা শক্ত জমি, বাঁয়ে একটা বিশাল পাথর পড়ে আছে। হঠাৎ এতক্ষণে টর্চের আলোয় আবছা একটা মূর্তি ভেসে উঠল পাথরটার কাছে—সম্পূর্ণ সাদা পোষাক। টলতে টলতে সে পাথরের দেয়ালে একটা হাত রেখে এগোচ্ছে—আছাড় খাবার মতো ঝুঁকে পড়ে আবার সামলে নিচ্ছে—অন্য হাতটা ওপরদিকে শূন্যে কিছু হাতড়াচ্ছে। কুমকুম দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল।

একটু ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে আমি ওদের কাছে গেলুম। কুমকুম ভেঙে পড়েছে অমরেশের গায়ে। অমরেশের চোখে কালো গগলস যথারীতি—সে একহাতে ওকে সামলে ধরেছে। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। বিড়বিড় করে কী বলছে, বাতাসের শব্দে শুনতে পাচ্ছিলুম না।

রাস্তায় ওঠা অব্দি আমি কোন কথা বলিনি। অপরাধীর মতো পিছনে আসছিলুম। অমরেশের সাদা পাঞ্জাবি ছিঁড়ে গেছে। এখানে-ওখানে রক্তও লক্ষ্য করলুম। আমি আস্তে ডাকলুম, অমলেশ !!

অমরেশকে ধরে নিয়ে হাঁটছিল কুমকুম—ডাক শুনে একবার আমার দিকে তাকাল। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা গেল না। এবং অমরেশ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'পথ হারিয়ে ফেলেছিলুম রে !"

বৃষ্টিরাতের আগন্তুক

রাত দুপুরে ঝিরঝিরিয়ে একটা বৃষ্টি এল।

টেবিলবাতির আলোয় বারীন একটা ইংরেজি গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ছিল। রহস্য যতই জমজমাট হোক, এই আকস্মিক বৃষ্টির শব্দ তার মতো মানুষের কাছে বেশি উদ্দীপক। এ বছর শরতকালের অনেকটাই নির্জলা গেছে। ধানক্ষেতে বুকে কচি থোড় নিয়ে তার দশবিঘে জমির ধান দাঁড়িয়ে থেকে খড় হয়ে যাচ্ছিল। আজকাল সব শ্যালো টিউবেলে জল ওঠে না। মাটির তলায় সব জলই শুকিয়ে গেছে। বই বন্ধ করে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে বারীনের মাথায় এইসব সুখের চিন্তা।

পাশে অনিমা বেঘোরে কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে। চোখে আলো লাগবে বলে উল্টো দিকে তার মুখ। এক মুহূর্তের জন্যে বারীনের মনে হল, স্ত্রীলোকের নাক ডাকা যত মৃদু হোক, বড় বিরক্তিকর। অবশ্য তার নিজেরও নাক ডাকে।

কিন্তু এতদিন পরে আসা এই বৃষ্টিটা জীবনের ছোট-বড় সব রকমের তিক্ততা ভুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

বই রেখে সে টেবিলবাতি নিভিয়ে দিল। বাড়ির পেছন দিকের এই ঘরের বাইরে আগাছার জঙ্গল। তারপর একটা খোয়াঢাকা সংকীর্ণ পথ দুধারে ঘন গাছপালা নিয়ে একটু দূরে পিচের সড়কে মিশেছে। গাঢ় অন্ধকারে বৃষ্টির শব্দ। রুক্ষ ধানগাছগুলির ভিজতে ভিজতে কোমল হয়ে যাওয়া স্পষ্ট অনুভব করছিল বারীন। পুবের জানালাটা বন্ধ। অনিমার ভূতের বড় ভয়। উত্তরের জানলা দুটো খোলা। হঠাৎ একটা জানালার বাইরে কালো কী একটা জিনিস বারীনকে চমকে দিল। সে কিছু বলা বা করার আগেই কেউ ফিসফিসিয়ে ডাকল, বারীন! বারীন!

বারীন ধুড়মুড়িয়ে উঠে বলল, কে? তারপর টেবিলবাতি জেলে দিয়ে বালিশের পাশ থেকে টর্চ নিল। টর্চের আলোয় একটা মুখ। মুখে একরাশ গোঁফদাড়ি, ঝাকড়-মাকড় চুল।

—আহ্! টর্চ নেবাও!

বারীন টর্চ নিভিয়ে শ্বাস ছাড়ল। প্রতুল! কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার মনে আতঙ্ক, ঘৃণা, বিস্ময় তালগোল পাকিয়ে তাকে বিব্রত করছিল। এভাবে রাত দুপুরে প্রতুল এসে তার ঘরের জানালায় হানা দেবে সে কল্পনাও করেনি। গোয়েন্দা

উপন্যাসের নিরাপদ রহস্যের চেয়ে এই বাস্তব রহস্য সাংঘাতিক আর বিপজ্জনক।

—আমি ভিজে যাচ্ছি, বারীন!

প্রতুলের এই কথার সুরে হুমকি না থাকলেও বারীনের কাছে আসলে এ একটা চ্যালেঞ্জ। একটু দ্বিধার সঙ্গে সে চ্যালেঞ্জটা নিল। টর্চ আর ছাতাটা নিয়ে দরজা খুলে সে বেরুল। উঠোন আলো করে সারারাত বারান্দার মাথায় একটা বাল্ব জ্বলত। ক'দিন থেকে সেটা ফিউজ। মনে অশান্তি থাকলে সংসারের অনেক খুচরো কিন্তু জরুরি কাজেও ঔদাসীন্য এসে যায়।

খিড়কির দিকের দরজাটা খুলতেই প্রতুল তার পাশ কাটিয়ে বাড়ি ঢুকল। সটান বারান্দায় গিয়ে উঠল সে। বারীন দরজা বন্ধ করে এসে আবার কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিব্রত আর হতবাক হয়ে রইল। প্রতুল চাপা স্বরে বলল—ভিজে একসা হয়ে গেছি। শিগগির শুকনো কাপড়-টাপড় দাও। আর একটা তোয়ালে বা গামছা—নাহ্! আলো-টালো জেলো না।

বারীন চুপচাপ ঘরে ঢুকে একটা লুঙি আর তোয়ালে এনে দিল। প্রতুল ভিজে প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে বারান্দার তারে মেলে দিল। এ বাড়ির নাড়ি-নক্ষত্র তার চেনা। সে চাইবার আগে বারীন তার একটা পাঞ্জাবিও এনে দিল। পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে প্রতুল বারান্দায় রাখা নড়বড়ে চেয়ারটাতে বসে বলল, সারাদিন খাওয়া হয়নি। বউঠানকে ওঠাও। মুড়িটুড়ি যা হোক কিছু—আগে একটা সিগারেট দাও।

অনিমা তখনই জেগে গিয়েছিল। কিন্তু কী বলবে বা করবে সে-ও ভেবে পাচ্ছিল না। বারীন তাকে ওঠাতে গিয়ে দেখল, সে উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ি গোছাচ্ছে। আবছা আলোয় তার মুখটা গম্ভীর। চোখে চোখ পড়লে বারীন আস্তে বলল, প্রতুল এসেছে।

—জানি।

স্বামী-স্ত্রীর চোখে-চোখে বিপদ সংকেত খেলছিল। এ এক সাংঘাতিক আর অকল্পনীয় পরিস্থিতি। ক'দিন আগে খবরের কাগজে খবরটা বেরিয়েছে। মফঃস্বল শহরের সাব-জেল থেকে বিচারাধীন দুই খুনের আসামী গিয়াসুদ্দিন আর প্রতুল চৌধুরী পালিয়ে গেছে। গতকালই পুলিশ এসেছিল প্রতুল চৌধুরীর ভগ্নীপতি বারীন রায়ের বাড়ি তল্লাসে।

কিন্তু তার চেয়ে সাংঘাতিক সমস্যা দীপিতার সঙ্গে প্রতুলের সম্পর্ক। মাস ছয়েক আগেই দীপিতা প্রায় এক কাপড়ে স্বামীকে ছেড়ে এসে ভাইয়ের কাছে উঠেছে। সঙ্গে আট-ন' মাসের শিশু টুকুন। অনিমার কাচ্চাবাচ্চা নেই। তাই টুকুনকে নিয়ে তার জননীর আহ্লাদেপনা। কোনও কোনও রাতে অনিমা টুকুনকে কাছে নিয়ে শুতে চায়। কিন্তু বেয়াড়া বাচ্চাটিকে শান্ত করা কঠিন। অগত্যা মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে হয়। বারীন মনে মনে বিরক্ত হলেও চেপে যায়। সে এমন এক মানুষ, যে মনেপ্রাণে ঘোর সংসারী আর ভোগী—অথচ বাইরে-বাইরে

উদাসীন প্রকৃতির। বিচক্ষণ, সাহসী আর স্পষ্টভাষী বলে তার সুনাম আছে। দলাদলির বাইরে চমৎকার দূরত্ব বজায় রেখে সে বাস করে। খেলার ক্লাব, লাইব্রেরী, আর সরকারী প্রকল্পে হঠাৎ-হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বিবিধ সংগঠনের সঙ্গে সে যুক্ত। সব পক্ষই তাকে শ্রদ্ধা করে। এসবের চেয়ে তার বড় পরিচয় আদর্শবাদী স্কুলশিক্ষক।

প্রতুল ছিল স্কুল-কলেজে তার সিনিয়ার। কিন্তু সম্পর্ক ছিল গাঢ় বন্ধুতার। বারীন জানত প্রতুলের মধ্যে অনেক খারাপ জিনিস আছে। বহু ব্যাপারে প্রতুল হঠকারী আর দুর্দান্তও। অথচ বয়সে দুবছরের বড় নিজের দিদির সঙ্গে যেচে পড়েই ছন্নছাড়া প্রতুলের বিয়ে দিয়েছিল সে। বিয়ের প্রথম বছরটা মোটামুটি ভালই কেটেছিল ওদের। তারপর কী সব ঘটেছিল, বারীনের কাছে এখনও তা অস্পষ্ট—যদিও অনিমা বলেছিল, 'ননদাই ব্যাডক্যারেক্টার লোক।' তবে বারীন তার দিদিকে জানে। দীপিতা বড় জেদি আর খামখেয়ালি মেয়ে। বারীনের ধারণা ছিল, দ্বন্দ্বটা ব্যক্তিত্বের। তারপর প্রতুল খুনের মামলায় আসামী হলে বারীনের মনে হয়েছিল অনিমার কথায় হয়তো সত্য আছে। কারণ যে খুন হয়েছিল, সে প্রতুলদের ওখানের হাসপাতালের একজন নার্স। নাকি অবিবাহিতা এবং সুন্দরীও।...

পাশের ঘরে দীপিতা শোয়। টুকুন প্রায় সারারাত যখন-তখন কান্নাকাটি করে। এ রাতে সে চুপ। বৃষ্টিটা সমানে ঝিরঝিরিয়ে ঝরছে। অনিমা এই বিপজ্জনক সময়ে স্বামীর মতোই মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানে। বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে সে শুধু একটি কথাই বলল—বাইরে কেন? ওঁকে ঘরে নিয়ে যাও। তারপর বারান্দা ঘুরে রান্নাঘরে চলে গেল। আবছা আঁধারে তালা খোলার খুটখাট শব্দ হল এবং রান্নাঘরে আলো জ্বলে উঠল। আর কদিন পরেই পুজো। তাই লোডশেডিংয়ের উপদ্রব নেই।

বারীন ডাকল—এস।

প্রতুল উঠল। এতক্ষণে বারীন লক্ষ্য করল তার পায়ে জুতো নেই। অবশ্য থাকার কথাও নয়। খবরে পড়েছিল, জানালার গরাদ উপড়ে বা ভেঙে দুই আসামী পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে গেছে। দুজন সেণ্ট্রি আর স্বয়ং সাবজেলারকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। এখনও তদন্ত চলছে, কেন খুনের আসামীদের ডিস্ট্রিক্ট জেলে না পাঠিয়ে সাবজেলে রাখা হয়েছিল এবং কী করেই বা সেণ্ট্রিদের চোখ এড়িয়ে এমন অঘটন ঘটল।

ঘরে ঢুকে বারীন উত্তরের জানলাদুটো বন্ধ করে দিল। প্রতুল টেবিলের পাশে সাবধানে চেয়ারটা টেনে বসে বলল, বেশিক্ষণ থাকব না। তোমাকে বিপদে ফেলার জন্য আমি আসিনি। শুধু—

বারীন তার কথার ওপর বলল—এত সব কাণ্ড হয়েছে আমরা কিছু জানতাম না। হঠাৎ কদিন আগে কাগজে পড়লাম। এরপর তো আর কিছু করার ছিল না। কিন্তু তোমার একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল। আমার জানাশোনা ভাল ল-ইয়ার আছে। কেন তুমি এসব করতে গেলে ?

প্রতুল চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকল। কোনও কথা বলল না।

বারীন আবার বলল—ঘটনাটা কী, খুলে বলবে ?

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর প্রতুল শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—আমি শুধু দীপুর কাছে একটা কথা জানতে এসেছি।

—সে হচ্ছে। আগে তুমি ব্যাপারটা খুলে বলো।

—কী বলব ? আমি বা গিয়াস কেউই ছন্দাকে মারিনি। প্রতুল ভারি শ্বাস ছেড়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলল।—এটা লজিক্যাল ব্যাপার। আমরা যে-দোষ করিনি, তার জন্য আমাদের বিচার হবে কেন ? সাজানো কেস। তো গিয়াসের মামাতো ভাই সেণ্ট্রি। কাজেই সুযোগটা আমরা নিয়েছি। ডিস্ট্রিক্ট জেলে আমাদের পাঠানো হত। তার আগের দিনই সেন্ট্রি মাহমুদ বলল, পাঁচিলের দিকের জানালার গরাদের ওপরে নীচে মরচেধরা। ব্রিটিশ আমলের জানালা। মেরামত করা আর হয়নি। রিসেন্টলি টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। লাল ফিতের ভজকট তো জানো। কাজেই সুযোগটা পেয়ে গেলাম। গিয়াসের কাঁধে চড়ে আমি পাঁচিলে উঠলাম।

প্রতুল হাসবার চেষ্টা করল। বারীন বলল—ছন্দা মানে সেই নার্স ভদ্রমহিলা ?

—হুঁ।

—কাগজে লিখেছে মাথার পেছনে কয়লাভাঙা হাতুড়ির ঘা মারা হয়েছিল।

—হুঁ।

—গিয়াস কে ?

—হসপিট্যাল স্টাফ। আমার সঙ্গে বন্ধুতা ছিল। গিয়াসের কোয়ার্টারটা কাছাকাছি। সেদিন ছিল রোববার। সন্ধ্যা ছটা-সাড়ে ছটা হবে। ছন্দার কোয়ার্টারের পেছন দিকে গঙ্গার ধারে। কী খেয়াল হল, ওর কোয়ার্টারে চলে গেলাম। দরজা ভেজানো ছিল। ভেতরে ঢুকে ওকে দেখতে পেলাম না। কয়েকবার ডেকে কিচেনের দিকে তাকাতেই দেখি, ছন্দা মাথায় রক্ত মেখে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তক্ষুনি গিয়ে গিয়াসকে ডেকে আনলাম। গিয়াস এসে ব্যাপারটা দেখে মাথা খারাপ করে ফেলল। প্রতুল পোড়া সিগারেটটা দরজা দিয়ে বাইরে বৃষ্টির মধ্যে ছুড়ে শ্বাস ছেড়ে বলল—কিন্তু আমরা হয়তো এই সময়টাকে ঠিক চিনতে পারিনি। এটাই ভুল। উল্টে আমাদের দুজনকেই—শালা! ভালমানুষীর আর কাল নেই।

বারীন চুপচাপ শুনছিল। এতক্ষণে সে সিগারেট ধরিয়ে বলল—ছন্দার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিল ?

—লোকেরা আমাকে ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখেছে।

বারীন মনে মনে একটু চটে গিয়ে বলল—আমি তোমার কাছে জানতে চাইছি।

প্রতুলের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিন্তু তখনই সে কিছু বলল না। একটু চুপ করে থেকে বলল—দীপু ছন্দাকে চেনে। মাতৃসদনে টুকুনের জন্মের সময় ছন্দা—

—তুমি আমার কথার জবাব দিচ্ছ না প্রতুল!

—সম্পর্কটা আমার নিজের কাছেও স্পষ্ট ছিল না। মেলামেশা করতাম। এই পর্যন্তই। আসলে ছন্দা অনাথ আশ্রমের মেয়ে। সেদিক থেকেও একটা সিম্প্যাথি থাকা স্বাভাবিক।

বারীন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যঙ্গের সুরে বলল, কাগজে পড়েছি, সে সুন্দরী ছিল!

—ছিল বলেই ঈর্ষাকাতর শুওরের বাচ্চারা আমাদের দুজনকে ফাঁসাল। আমার তবু তো বউ পালিয়ে এসেছে। গিয়াসবেচারীর কথা ভাবো। সবে বিয়ে করেছে।

বারীন একটু চুপ করে থাকার পর বলল, জেল পালানোর দুর্বুদ্ধি কেন তোমার মাথায় ঢুকল!

—আমি না পালালেও গিয়াস পালাত। ওর একটা সুবিধে আছে। বর্ডারের ওপারে আত্মীয়স্বজন আছে। সম্ভবত এখন সে সেখানেই চলে গেছে। হয়তো ওর কাছে ওর বউকেও পাচার করে দিয়েছে এতদিনে। তবে আমি এতে এতটুকু অন্যায় দেখি না।

—বেশ। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ তুমি ভাবলে না প্রতুল? এখনও সেইরকম থেকে গেলে? বারীন দুঃখিত ভাবে বলল। তোমার সঙ্গে দিদির বিয়ে দিয়েছিলাম এই ভেবে, যদি তুমি বদলাও। আমারই ভুল। তুমি বদলানোর মতো ধাতুতে গড়া নও। তা ছাড়া তুমি বাবা হয়েছ, প্রতুল! দিদির ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে দিচ্ছি! কিন্তু টুকুন—

অনিমা ঘরে ঢোকায় কথায় বাধা পড়ল। একটা প্লেটে হাতে সেঁকা রুটি আর তরকারি, গেলাসে জলও এনেছে। টেবিলে রাখল সে। তারপর আঁচলে ঘাম মুছে একটু সরে ফ্যানের তলায় দাঁড়াল। প্রতুল খাদ্যের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। বারীন একটু অবাক হয়েছিল। অনিমা তার 'ব্যাডক্যারেক্টার' ননদাইয়ের জন্য এতক্ষণ রুটি তৈরি করছিল!

খাটের লাগোয়া ড্রেসিং টেবিলে রাখা টেবিল ল্যাম্পের শেড ঘিরে এক ঝাঁক পোকা উড়ছে। শেষ দিকটায় মাঠের কাছে বাড়ি বলে বর্ষা থেকে শরৎ পোকার বড় উপদ্রব। সেই কালীপুজোর পর তবে উপদ্রবটা কমবে। তবু আবছা আলোয় একজন ক্ষুধার্ত মানুষের খাওয়া দেখে অনিমা বলল, দরজা বন্ধ করে বরং বড় আলোটা জেলে দিই।

বারীন দ্রুত বলল—থাক।

প্রতুলও বলল—থাক। আসলে বারীন স্পষ্ট আলোয় 'ক্রিমিন্যাল' ভগ্নীপতিকে স্পষ্ট করে দেখতে চাইছিল না। দীপিতার বুকভাঙা কান্নাটা তার মনে পড়ছিল—তুইই আমার এত সর্বনাশ করলি বারু! তুই জেনেশুনে আমাকে এক ক্রিমিন্যালের গলায় ঝুলিয়ে দিলি! তখন অবশ্য সত্যি সত্যি ক্রিমিন্যাল ছিল না প্রতুল। কিন্তু এখন সে একজন সত্যিকার ক্রিমিন্যাল। শুধু জেল থেকে পালিয়েছে বলেও নয়, সে যে ঘটনা বলল, তা কি বিশ্বাসযোগ্য? পুলিশকে এত বোকা বারীন ভাবে না। নিশ্চয় কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পেয়েই দুজনকে অ্যারেস্ট করেছিল পুলিশ।

কিন্তু তার চেয়ে ভীষণ নির্লজ্জ লাগে প্রতুলের এমন জন্তুর মতো খাদ্য গেলা। অশালীন মনে হয় মধ্যরাতে এমন করে চুপিচুপি তার বাড়িতে চলে আসা। তাছাড়া গিয়াসুদ্দিন তো সীমান্ত ডিঙিয়ে গিয়ে বাকি জীবনের জন্য নিরাপদে কাটাতে পারে। কিতু প্রতুল কোথায় যাবে? ধরা তাকে পড়তেই হবে একদিন-না-একদিন। তার চেয়ে সাংঘাতিক কথা, যদি দৈবাৎ কোনও সূত্রে তাকে অনুসরণ করে এসে পুলিশ এখনই হানা দেয় এই বাড়িতে?

বারীনের বুকটা ধড়াস করে উঠল।...

প্রতুল যতক্ষণ খেল, স্বামী-স্ত্রী চুপ করে রইল। জল খেয়ে সে বাইরে বারান্দায় গেলে অনিমা বলল, থামের পাশে বালতিতে মগ আছে।

তারপর স্বামীর দিকে ঘুরে সে ফিসফিস করে বলল, কী করবে ভাবছ?

বারীনও তেমনি আস্তে বলল, এখনই চলে যাবে।

সেই সময় প্রতুল ঘরে ঢুকল। চেয়ারটাতে বসে বলল, কৈ আরেকটা দাও। আরও একটা জিনিস চাইব। তার আগে বৌঠান, দীপুকে একটু কষ্ট করে ঘুম থেকে ওঠাও। ওকে একটা কথা বলেই চলে যাব।

অনিমা এঁটো প্লেট-গেলাস নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। বারীন সিগারেট-দেশলাই টেবিলে রাখল। প্রতুল সিগারেট ধরিয়ে বলল, হীরুকে তোমার মনে আছে? প্রতাপপুর রাজফ্যামিলির ছেলে হীরক—

—হুঁ।

—হীরু গোয়ায় আছে। টাউনপ্ল্যানিংয়ের বড় অফিসার। ওকে বাই পোস্ট একটা চিঠি লিখেছি। প্রায়ই বেড়াতে যেতে বলত। এবার যাচ্ছি। প্রতুল একটু হাসল। ওখান থেকে ভায়া বোম্বে কুয়েত বা আবুধাবি যাওয়ার একটা চান্স নেব। গিয়াসের এক আত্মীয় বোম্বেতে মক্কা পিলগ্রিমেজের ট্রাভেল এজেন্ট। আমার চেনা লোক। বে-মরশুমে ওয়ার্কার সাপ্লাই করে আরবমুলুকে। জাল ইন্টারন্যাশন্যাল পাসপোর্টের একটা র‍্যাকেট আছে। ঘাঁত-ঘোঁত সব জানে।

গিয়াসই বলছিল, অসুবিধে হবে না।

বারীন অন্যমনস্কভাবে গোঁফে হাত বুলোচ্ছিল। ফের বলল—হুঁ।

প্রতুল নরম গলায় বলল—মাই রিকোয়েস্ট বারু!

তা ছাড়া দেখ, আমি বিয়েতে পাই-পয়সা নিইনি—তুমি দিতে চেয়েছিলে! ছোটখাটো বিজনেস করতেও বলেছিলে। মনে পড়ে?

বারীন তাকাল। কিছু বলল না।

—মাত্র আড়াইশো টাকা তুমি আমাকে দাও। গোয়ায় গিয়ে হীরুর কাছে আরও কিছু ধার নেব। প্রতুল একটু ঝুঁকে এল বারীনের দিকে। আমি যথা-সময়ে ফেরত পাঠাব তোমাকে। আই প্রমিজ।

পাশের ঘরের দরজায় মৃদু ধাক্কা আর চুপিচুপি ডাকাডাকি শোনা যাচ্ছিল। বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছে। চারদিকে অদ্ভুত সব চাপা আর অস্বস্তিকর শব্দ। শিলিং ফ্যানটা নতুন। নীলাভ মশারি ফুলে উঠছে, কাঁপছে। বারীন বলল—বরং তুমি ধরা দাও। সদরে সেশান জাজের কোর্টের ল-ইয়ার শশাঙ্কদাকে তুমি চেনো। আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তুমি যদি সত্যি দোষী না হও, অ্যাট এনি কস্ট্ তোমাকে বাঁচাব। দরকার হলে আমি জমি বেচে সুপ্রিম কোর্ট অব্দি লড়ব, প্রতুল!

প্রতুল বাঁকা মুখে বলল—আইনফাইনে আমার বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া সারকামস্ট্যান্সিয়্যাল এভিডেন্স আমার বিপক্ষে। তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

—তুমি তাহলে দোষী। কারণ তোমার মনের জোর নেই।

—বারীন! ঈষৎ উত্তেজনায় শব্দটা উচ্চারণ করেই সংযত হল প্রতুল।

বারীন বলল—তুমি বুঝতে পারছ না আবার কী করতে যাচ্ছ। ক্রাইমের নিয়মই এই প্রতুল! একবার ক্রাইমের ফাঁদে পা দিলে ক্রমাগত—

তার কথার ওপর প্রতুল বলল—মাত্র আড়াইশো টাকার জন্য প্লিজ আমাকে ফিলসফি শুনিও না। আসলে আমি অনেক—অনেক দূরে পালিয়ে যেতে চাইছি, তুমি বুঝতে পারছ না?

—কেন?

এই সময় অনিমা ফিরে এসে বলল—দীপুদি এল না।

বারীন বলল—তাকে বলেছ?

—হ্যাঁ।

—কী বলল?

—বলল, 'বিরক্ত কোরো না। আমি যাব না।' তুমি গিয়ে দেখ বরং!

বারীন উঠতে যাচ্ছিল, প্রতুল বলল—থাক। ওকে ডিসটার্ব করে লাভ নেই। উল্টে চ্যাঁচামেচি করে হইচই বাধাবে। তুমি তো জানো, দীপু বরাবর হিস্টেরিক

টাইপের মেয়ে। তুমিই বিপদে পড়ে যাবে আমার জন্য।

বারীন বলল—প্রতুল! আমার কথা শোনো। যা করার করে ফেলেছো, আর রিস্ক নিও না। ফেস দা ট্রুথ, প্রতুল।

প্রতুল কেমন হাসল।—ট্রুথ ফেস করতেই তো এসেছিলাম। কিন্তু আমার সে-সাহস থাকলেও তোমার দিদির নেই।

বারীন একটু চমকে উঠল।—তার মানে?

—তুমি কি প্লিজ আমাকে টাকা দেবে?

অনিমা স্বামীর দিকে তাকাল। বারীনকে রুষ্ট দেখাচ্ছিল। অনিমা বলল—কিসের টাকা?

বারীন বলল—প্রতুল পণ নেয়নি। সেই পণের টাকা ক্লেইম করতে এসেছে!

প্রতুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ছিঃ বারু! আমি তোমাকে মহৎ মানুষ বলেই জানতাম। ঠিক আছে। আমি—

অনিমা দ্রুত বলল—কী হচ্ছে সব? দাদা, আপনি বসুন তো! আমাকে খুলে বলুন তো কী ব্যাপার!

প্রতুল বসল না। বলল—মাত্র আড়াইশো টাকা ধার চাইছি, বৌঠান। আমার বাড়ি ফেরা রিস্কি। তা নাহলে তা-ও চাইতাম না।

অনিমা বলল—আপনি একটু বসুন! বলে সে স্বামীর দিকে ঘুরল।—না হয় ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করেই ফেলেছেন। তাই বলে সামান্য কটা টাকার জন্য—

বারীন বলল—টাকাটা ব্যাপার নয়। প্রতুল, তুমি দিদির ট্রুথ ফেস করার সাহস নেই বললে কেন, খুলে বলবে?

—বললেও কি তুমি মেনে নেবে? তবে টাকাটা আমার খুবই দরকার। সেতো বলেইছি। যদি দাও, তাহলে অন্তত আভাসে বলে যাব।

বারীন স্ত্রীকে বলল—তোমাকে যে টাকাটা রাখতে দিয়েছি, তা-ই থেকে দাও।

অনিমা মশারি তুলে বালিশের তলা থেকে চাবির গোছা বের করল। তারপর সাবধানে স্টিলের আলমারি খুলে ভাঁজকরা শাড়ির ভেতর থেকে টাকা বের করল। বলল—সবই তো একশো!

বারীন বলল—তিনশোই দাও।

টাকা নিয়ে প্রতুল বলল—তোমার এই লুঙি-পাঞ্জাবিও ধার নিচ্ছি! আমার ভিজে প্যান্ট-শার্ট-গেঞ্জির জন্য একটা যেমন-তেমন ব্যাগ পেলে ভাল হত। আছে নাকি বৌঠান?

অনিমা ব্যস্তভাবে আলনা খোঁজাখুঁজি করে স্বামীর একটা ময়লা ছেঁড়াখোঁড়া ব্যাগ বের করল। বারীন বোবায়ধরা স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের চোখে স্ত্রীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিল। এটা কি মেয়েদের হিরোওয়ারশিপ? এই শহুরে ননদাইটির প্রতি

অনিমার আচরণ অবশ্য বরাবরই এ ধরনের। প্রতুল এ বাড়ি এলে অনিমার তাকে খাতিরের ঘটা দেখে দীপিতাও আড়ালে ফুট কাটত।

অনিমা ব্যাগের ভেতর ভাঁজ করে প্রতুলের কাপড়গুলো গুছিয়ে ভরছিল। তারপর ব্যাগটা তার হাতে দিয়ে ব্যাকুলভাবে বলল—আপনি এখন কোথায় যাবেন দাদা?

সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রতুল বলল—বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আপনার ননদ প্রতাপপুর গিয়েছিল। তাই না বৌঠান?

অনিমা একটু অবাক হয়ে বলল—হ্যাঁ। কেন?

—টুকুনকে রেখে গিয়েছিল আপনার কাছে?

—হ্যাঁ। বলল, ডাক্তারের কাছে—

বাধা দিয়ে প্রতুল বলল—রাতের বাসে ফিরেছিল দীপু?

—হ্যাঁ! দেরি দেখে ওকে বাসস্টপে পাঠালাম। আমরা খুব ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম। তার ওপর টুকুনকে সামলানো যাচ্ছিল না। খুব কান্নাকাটি করছিল।

বারীন স্ত্রীর কথার ওপর চাপাস্বরে প্রায় গর্জন করল—কী বলতে চাও তুমি?

প্রতুল বাঁকা হাসল।—তুমি বলছিলে ফেস দা ট্রুথ! কথাটা বলেই সে বেরিয়ে গেল। বৃষ্টিটা থেমে গেছে। চারদিকে অদ্ভুত সব চাপা অস্বস্তিকর শব্দ বেড়ে গেছে। গাছের পাতা থেকে ঝরঝরিয়ে জল পড়ছে হঠাৎ কোনও পাখির ডানা নাড়ার চেষ্টায়। অনিমা স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছিল। বারীন ওপর পাটির দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বসে আছে। আবছা আলোয় তাকে পাথরের মূর্তি মনে হচ্ছিল।

একটু পরে সে ফের চাপা গর্জাল—মিথ্যাবাদী! ঠগ! জোচ্চোর! আমাকে বোকা বানিয়ে গেল! ওকে আমি এখনই ধরিয়ে দেব।

সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অনিমা ধমক দিল—কী হচ্ছে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

—তুমি বুঝতে পারছ না ও কী বলে গেল? বিশ্বকর্মা পুজোর দিন দিদি গিয়ে নাকি মেয়েটাকে হাতুড়ি দিয়ে—অ্যাবসার্ড! অসম্ভব!

বারীন দু'হাতে মুখ চেপে ধরে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠল।...

ভোরবেলা থেকে ইলিশগুঁড়ি বৃষ্টি আর এলোমেলো হাওয়া। অনেকদিন শুখার পর বৃষ্টি যদি বা এল, পেছনে নিয়ে এল ডাকিনি-যোগিনীর ঝাঁকের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বারীনের পৈতৃক একতলা বাড়িটা সেই দুর্যোগের ভেতর কঠিন আর বড় বেশি স্তব্ধ। অনিমা রোজকার মতো চা করে স্বামীকে দিয়ে এল। বারীন উত্তর-পশ্চিম কোণের জানালার পাশে চুপচাপ বসে ছিল। দীপিতা উঠোনের কোণে স্যানিটারি-কাম-বাথরুম থেকে মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এল। টুকুন

এখনও ঘুমোচ্ছে। অনিমা বলল—দীপুদি, তোমার চা।

তার গলা একটু কেঁপে গেল কথাটা বলতে। সে নতুন চোখে দেখছিল ননদকে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছিল। বারীনের মতোই শক্ত গড়নের মেয়ে দীপিতা। রোদ-বৃষ্টি-হিম আর ঝড়ঝাপটা খাওয়া গাছের মতো ঋজু গড়ন আর খসখসে চেহারা। এখন গাছের কোটরে একটা বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে থাকতেই পারে। কিন্তু এই দুর্যোগের দিনে স্ত্রীর দোষের দায় মাথায় নিয়ে একটা মানুষ আথান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে ভাবতে গিয়েই অনিমার বুকের ভেতর কান্নার চাপ। একটু বেলা হলে ছাতি নিয়ে বারীন ঘর থেকে বেরুল। দীপিতার ঘরের সামনে গিয়ে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ঠোঁট ফাঁক করল কিছু বলবে বলে। অনিমা একটা চরম মুহূর্ত গুণছিল।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। বারীন ছাতি মাথায় চুপচাপ বেরিয়ে গেল। ধানক্ষেত দেখতেই গেল। অনিমা বড় করে শ্বাস ছেড়ে রান্নাঘরে গেল উনুনে আঁচ দিতে। কয়লাভাঙা হাতুড়িটা হাতে নিয়েই তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। একই রান্নাঘর, একই উনুন, কয়লাগুলোও একই রকম এবং এই একই পুরনো হাতুড়িটা রাতারাতি হঠাৎ একেবারে আমূল বদলে গেছে। বৃষ্টিরাতের এক আগন্তুক অতর্কিতে এসে অনিমার পুরো সংসারটাকেই বদলে দিয়ে গেছে। তুচ্ছ বহুব্যবহৃত একটা হাতুড়ি এখন কী সাংঘাতিক বিপজ্জনক!

অনি! তুই হলে কি পারতিস? নিজেকে মনে মনে এই ভীরু প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়ে অনিমা মনে মনে বলল—হয়তো পারতাম। সে শক্ত মুঠোয় হাতুড়িটা চেপে ধরল। হয়তো পারত সে। কিন্তু স্বামীকে এমন করে আথান্তরে ভাসাত না। বুক ফুলিয়ে পুলিশকে বলত—আমিই মেরেছি।

কিন্তু দীপিতা কেন তা করল না?

হয়তো ভালবাসা মরে গেলে মানুষ এমনি নিষ্ঠুর পাথর হয়ে যায়।

দীপু বলল, আনুদা, আর কিন্তু পারছিনে। অসহ্য !

কী ব্যাপার ? বলে ওর দিকে তাকালাম। আমার ডাইনে বসেছে সে। তার দু' হাঁটুর ফাঁকে বাটুলের মতো গিয়ারের মাথা দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভারের থ্যাবড়া হাতের মুঠো মাঝে মাঝে বাঁটুলটা খামচে ধরছে। আমার তো গোড়া থেকেই খারাপ লাগছিল। আমার দিকে আরও কিছুটা সরে বসতে পারত দীপু। ভেবেছিলাম, নতুন পরিচয়ের সংকোচ। কিন্তু ওভাবে এই পাহাড়ী রাস্তায় আস্ত বুনো শুওরের মতো একেবারে আনকোরা একটা জিপে বসে থাকাটা ওর পক্ষে স্বস্তিকর হবে না জানতাম। এখন ওর কথায় বোঝা যাচ্ছে, সত্যি তা হলও না।

পিছনের খোঁদল থেকে শংখদা বললেন, বমি পাচ্ছে বুঝি ? ট্যাবলেট দিই, খেয়ে নে। বলে শংখদা ঝোলা হাতড়াতে ব্যস্ত হলেন। এবং অনুযোগের সুরে—তখন বললাম, ট্যাবলেট খেয়ে গাড়িতে ওঠ। কথা শুনলিনে !

ওঁর পাশ থেকে একসঙ্গে বিনু আর তনু একসঙ্গে বলে উঠল, আমি খাব। আমিও খাব !

এই মরেছে ! তোরা যে বমিপার্টি হয়ে গেলি রে ! শংখদা হেসে উঠলেন।

মিসেস রায়ের গলা শোনা গেল তারপর।—নামিয়ে দেব বলে দিচ্ছি। খবর্দার, কেউ গাড়ি নোংরা করবে না ! তারপর ফের একসঙ্গে অনেকগুলো হাসি।

আমি কিন্তু দীপুর মুখে অস্বস্তি বা কষ্ট, অর্থাৎ পাকস্থলী ঘুলিয়ে ওঠা কোন বিকৃতির লক্ষণ দেখছিলাম না। দীপু মিষ্টি হাসছিল। ডানদিক থেকে দুটো পাহাড়ের ফাঁক গলিয়ে বিশাল প্রপাতের মতো হাল্কা গোলাপী রোদ এসে ওর মুখে পড়ছিল। আর ওর দু'চোখে দুষ্টুমি। ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা রেখায় কি লেখা। ওর চিবুকে নীল তিল।

আবার বললাম, কি ব্যাপার ?

এই সময় জিপটা দ্রুত বাঁক নিতেই ধুসর ছায়া এসে ঢুকল। দীপুর হাসিতে রহস্য ঘনীভূত হল। সে আস্তে বলল, আমি তোমাকে তুমি বলব আনুদা !

বেশ তো ! বল না ! কিন্তু কি যেন অসহ্য লাগছিল তোমার ?

তোমাকে আপনি বলা !

এই সংলাপ পিছনে সবার কানে গেলে একটা মেয়েলি কোলাহল উঠল।—তাহলে আমরাও বলব ! আমরাও বলব ! এবং মিসেস রায় সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, সে অধিকার তোদের চেয়ে আমারই বেশি, জানিস ? আনু প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার ছেলে শুভর সঙ্গে পড়ত। বল তো আনু ! তাই না ?

হ্যাঁ, মাসিমা !...বলে ফেললাম তক্ষুনি। কি ভাবে এবং কত দ্রুত মানুষে মানুষে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে ভাবা যায় না! গতকাল দুপুরের ফ্লাইটে যখন গৌহাটি এয়ারপোর্টে পৌঁছই, তখন এই ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে সি-অফ করতে গিয়েছিলেন। শংখদা, দীপু বা দীপশ্রী, এবং ওঁদের ক্লাবের ক'জন আমাকে রিসিভ করার জন্যে উপস্থিত ছিলেন। তখন সবই ছিল অন্যরকম। বড্ড বেশি খাতির, আপ্যায়ন, সম্ভ্রমে অস্ফুট দু-একটা উক্তি—এবং দীপু তো আমাকে খালি স্যার-স্যার করছিল। অবশ্য কথা সে খুবই কম বলছিল, সে জীবনে এই প্রথম একজন সত্যিকার লেখককে সশরীরে দেখল। 'সত্যিকার' বলতে তার কাছে সেই লেখক, যাঁর কিনা রীতিমত ছাপার হরফে বই-টই আছে! এবং কথাটা দীপু আমাকে গোপনেই জানিয়েছিল।

আর মিসেস রায়, যাঁর পুরো নাম এখনও জানতে পারি নি, যাঁর ছেলে শুভ আমার সহপাঠী হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আমি মোটেও প্রেসিডেন্সিতে পড়ি নি, তিনি আমাকে সাহিত্যিকমশাই বলে সম্ভাষণ করছিলেন।

জিপ আরও কয়েকটা বাঁক ঘুরতে-ঘুরতে আমি ওঁদের সঙ্গে একাকার হয়ে গেলাম এবং এর কৃতিত্ব দীপুরই।

আমাদের গন্তব্য চেরাপুঞ্জি। তবে শিলঙে হল্টের ব্যবস্থা অনিবার্যভাবে হয়েছে। রাতটা শিলঙে কাটিয়ে চেরাপুঞ্জি যাব। পুরো দিনটা কাটাব সেখানে। তারপর সন্ধ্যায় রওনা হব শিলঙ হয়ে গৌহাটি। কমপক্ষে দেড়শ মাইল তো বটেই।

আমাকে তার পরদিনই কলকাতা ফিরতে হবে। সকাল সাড়ে দশটার ফ্লাইটের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। শংখদা আপত্তি করেছিল, শুনিনি। এখন এই পাহাড়ী ছন্দে গাঁথা সুন্দর রাস্তায় মনে হচ্ছিল, অত তাড়া না দেখালেও পারতাম।

শংখদার পাড়াতুতো এক দাদার তিন মেয়ে এই দীপশ্রী, বনশ্রী আর তনুশ্রী। ওদের বাবা এক নামী গাড়ি কোম্পানির বিগ বস। একেবারে ফ্রেশ একখানা জিপ দিয়েছেন। লক্ষ্য করছিলাম স্পীডের কাঁটা ঘুরছে না। অর্থাৎ এই মালই বিক্রি হয়ে যাবে। কয়েকশো কিলোমিটার ছুটোছুটির কোন চিহ্নই ধরা পড়বে না তার বুকের লেখায়।

না, এটা দুর্নীতি নয়। শংখদা বলছিলেন। স্রেফ টেস্ট।

তবে টেস্টের বিপদ আপদ আমার ঘাড়েই না পড়ে, মনে চাপা অস্বস্তি থেকেই গেছে। একখানে বাঁকের মুখে অন্য গাড়িকে রাস্তা দিতে গিয়ে জিপটা আর স্টার্ট নিচ্ছে না। ভাবনায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সুরাহা হল। তখন আশ্বস্ত হয়ে সিগারেট ধরালাম।

দীপু বলল, এবার নিশ্চয় তোমার শীত করছে আনুদা?

পিছন থেকে মিসেস রায় বললেন, শুভর বাবার ওভারকোটটা দিতে চাইলাম

নিলে না। এবার টের পাচ্ছ তো পাহাড়ী শীতের দাঁত কত ধারাল ?

বললাম, না না। এ আর তেমন কি শীত ?

শংখদা গম্ভীর স্বরে বললেন, না হে। শিলঙের শীতটা বড্ড মারাত্মক! দীপু বলল, চেরাপুঞ্জিতে আরও বেশি শীত!

ছোট বোন তনু বলল, তুই কেমন করে জানলি রে? এই তো প্রথম যাচ্ছিস। দীপু চোখ টিপে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, বুঝতে পারি।

বিনু বলল, তুই গণকঠাকুর ?

বা রে! চেরাপুঞ্জির হাইট তো বেশি। যত হাইট বাড়বে, তত ঠাণ্ডা হবে। দীপু তার যুক্তি আরও চোখা করল ফের।—হিমালয়ের উঁচু চূড়াগুলোয় বরফ জমে যায়, না? শংখদা ?

পিছনের খোঁদলের কোণায় এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন মধুবাবু। বললেন, শিলঙেও বরফ পড়ে, মাইণ্ড দ্যাট। হয় তো আজ রাতেই পড়েছে, দেখতে পাবে ভোরবেলায়।

মধুবাবু, যাকে বলে নীরব কর্মী। ভদ্রলোক বয়সে প্রৌঢ়। এক পায়ে ত্রুটি আছে। লেংচে হাঁটেন। কিন্তু ওঁর নিজের কথায় বলতে গেলে 'এ পঙ্গু বহু-বহু গিরি লঙ্ঘন করেছে, মাইণ্ড দ্যাট!' ভদ্রলোকের কপালের তিনটি ভাঁজে যেন বিষাদ আঁকা আছে।

শীতের কথায় নানারকম শীতের প্রসঙ্গ এলো। সেইসব কথা চলতে থাকল। পাহাড়ের গায়ে ক্রমশ আসন্ন রাতের ঘোর লেগেছে। নীচে পাহাড়তলীতে কুয়াশা ঘনিয়ে উঠছে। জোড়াবাট থেকে শিলঙের রাস্তা বাঁক নিয়েছে। তখন থেকে জেনেছি, ভারতের পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো মোটেও ন্যাড়া নয়, ঘন সবুজ বনে ঢাকা। আসামের এই ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়।

পাহাড়ের ওপর সুপুরি বা কলাবনের কথা কল্পনাও করিনি। কিন্তু রাস্তা ঘন ঘন বাঁক নিতে নিতে যত এগোচ্ছে, চেনা গাছপালা আর দেখতে পাচ্ছিনে। ঘন গভীর জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ে গা ছম ছম করা রহস্য। তারপর অন্ধকার এসে গেল শিগগির! নির্জন আঁকাবাঁকা রাস্তায় জিপের তীব্র আলোয় হঠাৎ চোখে পড়ছে কোন একলা মানুষ, কিংবা আগুন পোহাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে বাড়ির উঠোনে বুড়ো-বুড়িরা। তারপর আলোয় মালা দেখা গেল সামনে। শংখদা ঘোষণা করলেন রংপো এসে গেল। আমরা চা খেয়ে নেব।

দুধারে দোকানপাট। ঢালু হয়ে নেমে গেছে শিলং-গামী রাস্তাটা। একটা চায়ের রেস্তোঁরার সামনে জিপ দাঁড়াল। আমরা নামলাম। এমন ভ্রমণে চা অমৃত। বিশেষ করে আসামের চা বাগানের ঘন লিকারের সুস্বাদু চা।

দীপু আমার ডান কনুইয়ের কাছটা ধরে ফিসফিস করে বলল, মিসেস রায় ভীষণ পেটুক দেখবেন। হুঃ, ওই দেখুন, খাবারের দিকে কেমন রাক্ষুসীর মত

তাকাচ্ছে ! আস্ত পাহাড় গিলে খায় ।

সেই মুহূর্তে মনে হল, ভদ্রমহিলাকে দীপু যেন পছন্দ করে না ।···

শিলঙ পৌঁছতে রাত আটটা । শংখদা সত্যি বলেছিলেন, শিলঙে শীতটা মারাত্মক । হাত জমে যাচ্ছিল । আঙুলের ডগা চিনচিন করছিল । আগের ব্যবস্থামত আমরা যে বাড়িতে থাকব, সেটা ওঁর এক বন্ধুর । ক'দিন আগে ফ্যামিলি কলকাতা গেছে । তাই পুরো থ্রী-রুম বাসাটা আমরা দখল করে ফেললাম । বিছানা-কম্বল সঙ্গে ছিল যথেষ্ট । অসুবিধে হল না । মেয়েরা ভেতরের ঘরে শুল । অল্পস্বল্প খাওয়া দাওয়াও হল । শংখদার বন্ধু তপনবাবু অতিথিপরায়ণ মানুষ । শংখদা, মধুবাবু আর তিনি শোবেন ড্রয়িং রুমে । আমি শোব পাশের ছোট্ট ঘরটায় । শোবার আগে কিছুক্ষণ আরামে আগুন পোহানো হল । তারপর মেয়েরা ঘরে ঢুকলে আমরা একটু করে ব্র্যান্ডি পান করে আরও উষ্ণ হলাম ।

ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে চাপা গলায় আমরা কথা বলছিলাম আর ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিচ্ছিলাম । এই সময় মধুবাবু ফিস ফিস করে হঠাৎ বললেন, মিসেস রায়ের সঙ্গে দীপুদের আবার ভাব হয়েছে জানতাম না । দীপু বলেনি ! ভারি আশ্চর্য তো, শংখ ! এমন কি মিস্টার বোসের গাড়িতেই চলে এলেন !

শংখদা একটু হেসে বললেন, এই ইস্টার্ন রিজিয়নে তো কতবার ভূমিকম্প হয়েছে । বন্যা হয়েছে । ঝড় হয়েছে । আনু এই প্রথম এলো । দু'দিন ধরে ঘুরছে । কোন চিহ্ন চোখে পড়ছে ? জিগ্যেস করুন না মধুদা ! গ্রিন এ্যান্ড এভারগ্রিন এভরি-হোয়্যার !

মধুবাবু বললেন, তাহলেও এত শিগগির !

মিসেস রায় আসলে খুবই-ভাল । শংখদা বললেন, ওর মনটা খুব খোলামেলা । তাছাড়া দোষ তো ওর একার নয় । উনি তো রাজীই ছিলেন । শেষ অব্দি রায়-সাহেবের জেদেই গণ্ডগোলটা হয়ে গেল । এদিকে বোস-সায়েবও কম জেদী নন ।

তপনবাবু বললেন, কী ব্যাপার ? হঠাৎ তোমরা ষড়যন্ত্রমূলক কথাবার্তা শুরু করলে যে ?

মধুবাবু অপ্রস্তুত হাসলেন ।—না, না । এমনি একটা কথা ।

শংখদা বললেন, তপনও জানে । সেই শুভর সঙ্গে দীপুর বিয়ের ব্যাপারটা রে ?

মাই গুডনেস ! তপনবাবু নড়ে বসলেন । কী কাণ্ড ! মনেই ছিল না । কিন্তু ভারি অদ্ভুত তো !

কী অদ্ভুত ?

মিসেস রায় আর দীপুরা একই ঘরে । তপনবাবু চাপা হাসতে থাকলেন ।

শংখদা মাথা দুলিয়ে বললেন, ও সব কোন ব্যাপারই না । মানুষের লাইফটাই এ রকম । মিস্টার এ্যান্ড মিসেস রায় নিজে থেকেই পরে বসন্তদার কাছে গিয়ে নাকি

মিটমাট করে আসেন। তারপর সব মিটে যায়। রায় এ্যান্ড বোস ফ্যামিলি তো বরাবর ফ্রেন্ডস!

কিন্তু বেচারী দীপুর লাইফটা হেল হয়ে গেল!

না, না! কী হেল হবে? চেহারা তো ভালই। হয়ে যাবে এক জায়গায়!

হবে। কিন্তু…

শংখদা প্রকাণ্ড চিমটেতে একটুকরো কয়লা গুঁজে দিয়ে আগুনটা বাড়িয়ে বললেন, আসলে, শুভ ছেলেটা স্কাউন্ড্রেল! অত যদি তুই পিতৃভক্ত, তাহলে আগেই ভাবা উচিত ছিল। একটা নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ করে দিব্যি আমেরিকায় পাড়ি জমালি? এতটুকু অনুশোচনা পর্যন্ত হল না!

আমি দের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে মধুবাবু বললেন, একটা রিয়েল-লাইফ স্টোরি স্যার! লিখলে একখানা নভেল হয়ে যাবে। বল না শংখ, সাহিত্যিক মশাইকে।

শংখদা জিভ কেটে বললেন, না না। দীপু কষ্ট পাবে। কী দরকার?

কৌতূহল জাগছিল। কিন্তু তা দমন করে বললাম, যা ঘটে তা গল্প হয় না মধুবাবু! আমি বানিয়ে লিখতেই ভালবাসি।

তপনবাবু মন্তব্য করলেন, হ্যাঁ। সেজন্যেই তো বলে ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন।

খুব হয়েছে। ও সব থাক। শংখদা বললেন, আনু, আর একটু খাবে নাকি?

নাঃ।

শীত কমেছে তো?

যথেষ্ট।…

একটু পরে শুয়ে শুয়ে দীপুর কথা ভাবছিলাম। যেটুকু আঁচ করেছি, তা একটা নেহাত মামুলী ব্যাপার। আকছার ঘটে থাকে। শুভ নামে কোন যুবক দীপুর সঙ্গে প্রেম করার পর বিয়ের চাপ এসেছিল যেদিক থেকেই হোক। তারপর যথারীতি কেটে পড়েছে। শতকরা নিরানব্বই জন প্রেমিকই তাই করে। বাকি একজন সম্ভবত নির্বোধ। তাই সে প্রেমকে বিয়ের শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পোড়ায়। প্রেম তো প্রেমই। বিয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা মৃত্যুর।

আরামে আমার চোখের পাতা বুজে এলো।

কিন্তু তার মধ্যে দীপুর সেই সপ্রতিভ উজ্জ্বল হাসিভরা মুখটা ভেসে থাকল। ওই মুখে প্রত্যাখ্যাতা প্রেমিকার কোন দুঃখ দেখতে পাচ্ছিলাম কি? একবারও কি ভেবেছিলাম, এই যুবতীটি ভালবাসার অনির্বাণ দুঃখ বুকের তলায় রেখে নির্মল হাসছে?

নাকি ভালবাসা ব্যাপারটা পুরুষের কাছে যেমন, মেয়েদের কাছেও তেমনই ক্ষণস্থায়ী? ফুলে ফুলে মৌ-পিয়াসী পতঙ্গের উপমা কি শুধু পুরুষদেরই প্রতি

প্রযোজ্য, মেয়েদের প্রতি নয় ? কে বলতে পারে ফুলও একাধিক পতঙ্গকে চায় কি না ?

আমি এ নিয়ে স্বভাবত থান ইটের মত বই লিখেছি। এখনও লিখতে পারি। কিন্তু সে সবই আমার বানানো। বাস্তব জীবনের নারী ও পুরুষের সত্যটা কি ? জানি না। সত্যি, জানি না।

ঘুমের মধ্যে ভাবতে ভাবতে মনে হল, দীপুর কাছেই কি কোন ভাবে জানা যায় না এ প্রশ্নের জবাব ? সে কি গোপন করবে যদি তাকে প্রশ্নটা করি ?

মনে মনে মিনতি করে বললাম, দোহাই দীপু, গোপন কর না। সত্যি কথাটা অন্তত আমাকে বল। সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে।...

ছোট বোন তনুশ্রী বড় দীপশ্রীর চেয়ে অনেক বেশি চঞ্চল। অনেক বেশি হাসতে পারে। সবে কলেজে ঢুকেছে। তাই ওর খালি কলেজের গল্প। সকাল আটটায় কাঁপতে কাঁপতে আমরা বিশপ-বিডন ঝর্ণা দেখতে গেছি, তনুশ্রী আমাকে দখল করে নিয়েছে এবং ওর বন্ধুদের কথা বলছে। হঠাৎ দীপু এসে আমার হাত ধরে টানতে টানতে দূরে নিয়ে গেল। তনুশ্রী চেঁচামেচি করে বলল, ওর সঙ্গে যাবেন না আনুদা ! ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে ! শুভদাকে সেবার...বলেই সে জিভ কেটে চুপ করে গেল।

মিসেস রায় ওপাশে মধুবাবু আর শংখদার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমার উদ্দেশ্যে বললেন, এই ঝর্ণা দুটো নিয়ে খাসিয়াদের অদ্ভুত গল্প আছে আনু ! শুনে যাও।

দীপু প্রায় দৌড়াচ্ছিল আমাকে নিয়ে। বলল, একটা এ্যাংগল আছে, সেখানে দাঁড়ালে অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখতে পাবে আনুদা। আমার আবিষ্কার।

সে দাঁড়াল। বললাম, তুমি তো এই প্রথম মেঘালয়ে আসছ বলছিলে না ?

চোখ টিপে দীপু বলল, চুপ। ওদের কানে যেন না যায়। আমি অন্তত দু-দুবার এসেছি শিলঙে। চেরাপুঞ্জিতেও।

তাই বুঝি ? একা ?

না, একজনের সঙ্গে। দীপু আনমনে জবাব দিল। তার দৃষ্টিতে যেন অন্বেষণ।

দুম করে বললাম, শুভর সঙ্গেই কি ?

দীপু চমকে উঠল। ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে—তুমি কতটুকু জেনেছ আনুদা ?

অতি সামান্য।

শুভ তো তোমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল ?

মোটেও না ! তাকে কস্মিন কালেও দেখি নি, চিনি না।

দীপু ঈষৎ গম্ভীর হয়ে তাকাল—আমি জানি মিসেস রায় ভীষণ মিথ্যুক।

এই মুহূর্তে ওর বেদনাদায়ক স্মৃতির দিকে ওকে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। এখন শিলঙের আকাশ পরিষ্কার, কুয়াশা ধুয়ে সোনালী রোদ গড়াচ্ছে যুগল ঝর্ণার চাপা

প্রভাত বন্দনা যাচ্ছে শোনা, এবং তাদের রূপোলী শরীরে নাচের অপরূপ মুদ্রা। অতএব বললাম, দীপু, কী যেন গল্প আছে এই ঝর্ণা দুটো নিয়ে ?

খাসিয়ারা বলে, ওরা যমজ বোন। আর…

হঠাৎ চুপ করে গেল সে। কি দেখতে দেখতে অস্ফুট স্বরে ফের বলল, পাইন গাছটা তো নেই! অথচ পাথরটা আছে!

কোন্ পাইন গাছটা দীপু ? কোন্ পাথরটা ?

দীপু সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, আনুদা! এবার এখানে দাঁড়িয়ে ঝর্ণাদুটোকে দু'চোখে ভাগ করে নাও। অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাবে।

চেষ্টা করে বললাম, ভ্যাট্। তা হয় নাকি ?

হয়। এই তো আমি দেখতে পাচ্ছি। দীপু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, অবিশ্যি বিকেলেই এ ব্যাপারটা চমৎকার হয়। তখন পিছন থেকে সূর্যের আলো পড়ে ওদের গায়ে।

তুমি বিকেলে দেখেছিলে কতদিন আগে ?

গত বছর মার্চে।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, উঠেছিলে কোথায় ?

দীপু এতটুকু অপ্রস্তুত না হয়ে জবাব দিল, কোথায় আবার ? সানরাইজ হোটেলে।

তনুশ্রী দৌড়ে এলো।—আপনারা কি দেখছেন আনুদা ? আমি দেখব।

দীপু সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত ধরে টানল।—চল আনুদা। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সে আবার আমাকে নিয়ে চড়াইয়ে এগোল। তনুশ্রী একা দাঁড়িয়ে খুঁজে হন্যে হতে থাকল। একটু এগিয়ে দেখলাম মেজ বনশ্রী চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন আকাশ দেখছে। সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। গোলগাল পুতুল পুতুল চেহারা। দীপু তাকে ডেকে গেল।

জিপের কাছে মিসেস রায়, মধুবাবু আর শংখদার সঙ্গে কথা বলছিলেন। শংখদা ঘড়ি দেখে বললেন, তুমি তো সাহিত্যিক মানুষ। শিলঙে আর কিছু না হোক রবীন্দ্রনাথ যে দুটো বাড়িতে ছিলেন, তা তোমার দেখে যাওয়া কর্তব্য। প্রথমে 'দি ব্রুকে' যাওয়া যাক। বাড়ির অনেকটা নীচে ছোট এক চিল্‌তে নদীর মত আছে। ওয়াণ্ডারফুল!

মধুবাবু বললেন, মশাই, রবিঠাকুর কি এমনি এমনি অত ভাল পদ্য লিখতে পারতেন ? জায়গার গুণে পদ্য ফুটে বেরুত আপনা আপনি।

মিসেস রায় হাসতে হাসতে বললেন, কিন্তু নাটকও কি বেরুত ? শিলঙেই তো 'রক্তকরবী' লিখেছিলেন শুনেছি। নিশ্চয়ই ড্রামাটিক ব্যাপার কিছু ছিল এখানে!

দীপু বলল, শিলঙ ইজ অলওয়েজ ড্রামাটিক।

মিসেস রায় যেন স্নেহের সুরে বললেন, ডু ইউ ফিল ইট দীপু ?

হ্যাঁ। এখানেই নন্দিনীকে দেখতে পেয়েছিলেন কবি।

দেখ, সত্যি বলতে কি, নাটকটা আমার মাথায় ঢোকে না। নন্দিনীর ব্যাপারটা —তার ওপর রক্তকরবীই বা কেন ? মিসেস রায় সিরিয়াস ভঙ্গীতে বললেন।

শংখদা গতিক বুঝে বললেন, আর দেরি নয়। ওঠা যাক্। বেলা হয়ে যাবে, পাক্কা দেড়ঘণ্টার জার্নি। দীপু যথাস্থানে ঢোকো। আনু, ওঠ। আসুন মিসেস রায়।...

আবার জিপ ঘন ঘন চড়াই উৎরাই রাস্তায় চলতে থাকল। পাহাড়ে পাহাড়ে রঙীন ছবির মত সুন্দর বাড়ি। বিশাল পাইনের বন রাস্তার ধারে পয়ারছন্দে গাঁথা। দ্রুত রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ছড়ানো বাড়ি সশ্রদ্ধভাবে দেখার পর আমরা যখন চেরাপুঞ্জির রাস্তায় পৌঁছলাম, তখন যেন স্বর্গলোকের দরজা খুলে গেল।

বাঁয়ে গভীর উপত্যকা। সবুজ অরণ্যের মাথায় টুপির মত টুকরো মেঘ। আঁকাবাঁকা পীচের রাস্তা পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলছে স্বর্গের দিকে মেঘলোক পেরিয়ে।

চেরাপুঞ্জিতে ঢোকার মুখে ফিস ফিস করে দীপু বলল, একটা বাড়ি দেখাব। মনে রাখবেন।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালাম। দীপুর মুখে যেন প্রচ্ছন্ন হাসি। স্মৃতি তো বিষণ্নতা আনে। ওর এই আনন্দ কেন ?

ঘোরালো রাস্তার একখানে বাঁকের ওপর একটা অতি সাধারণ বাড়ি দেখিয়ে দীপু ফের ফিসফিস করে বলল, এই বাড়িটা। এখানে আমরা ছিলাম।

বাড়িটা খাসিয়াদের। এক বুড়ি অজস্র গহনাগাঁটি পরে উঠোনে বসে রোদ পোহাচ্ছে। আকাশে মেঘ আছে টুকরো টুকরো। চির-বৃষ্টির জনপদ চেরাপুঞ্জি আমাদের করুণা করেছিল। মাঝে মাঝে খাসিয়া যুবতীর হাসির মত রোদ। শংখদা ঘোষণা করলেন, আমরা প্রথমে যাব মৌসমী ফলসে।

চেরাপুঞ্জি ছাড়িয়ে আরও ছ'মাইল এগোতে হল। সেখানে পাহাড়ের মাথায় বিস্তৃত সমতল প্রান্তর। দূরে অনেক নীচে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলা দেখা যাচ্ছে। অপূর্ব দৃশ্য। সামনে বিশাল পাথরের দেওয়ালে এখানে ওখানে কয়েক ফালি জলধারা গভীরে নেমে যাচ্ছে।

দীপু আবার আমার হাত ধরে দৌড়তে শুরু করল। ওরা সবাই জলপ্রপাত দেখছে। আমরা রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে শুকনো ঘাসের মাঠে একটা পাথরের ওপর বসলাম। তারপর দীপু বলল, আমাকে তুমি খুব বেহায়া ভাবছ তো আনুদা ?

না না। তা কেন ভাবব ?

তাহলে সত্যি বল তো, শুভ তোমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল কি না ?

বললাম তো। তাকে আমি চিনিই না।

তুমি তো সত্যিকারের লেখক আনুদা। তোমার তিনটে বই আমি পড়েছি।

তার মধ্যে 'অসবর্ণে' তুমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়েছ। পড়ার পর ভেবেছিলাম, যদি কখনও লেখককে মুখোমুখি পাই জিজ্ঞেস করব, এমন উদ্ভুট্টে কাণ্ড কেন মাথায় খেলল ?

একটু অস্বস্তিতে বললাম, উদ্ভুট্টে লেগেছে তোমার কাছে ?

হ্যাঁ। ভীষণ।

কেন ?

ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে দিব্যি বাইরে গিয়ে কাটাচ্ছে। ফ্রিলি সব আলোচনা করছে। অথচ শুচ্ছে আলাদা আলাদা বিছানায়। এবং…

ওকে থামতে দেখে ভাবলাম, বুঝি ও নারীসুলভ সংকোচে বিরত হঠাৎ। কিন্তু না। দীপু হেসে উঠল। হেসে ভেঙে পড়ল প্রায়। বললাম, হাসছ কেন দীপু ?

দীপু হাসির মধ্যে মাথা জোর করে দুলিয়ে বলল, না। হয় তো ওটা হত শরৎচন্দ্রের যুগে। আজকাল ওই লুকোচুরি কেউ করেই না।

কি জানি।

কি জানি নয়, করেই না।…দীপু জোর দিয়ে বলল। জানো না আনন্দা ? মেয়েরা যখন আত্মদান করে তখন নিজেকে একেবারে উজাড় করেই দেয় ? কিছু বাকি রাখে না ? তোমার বইতে শরীর শরীর করে দশপাতা ফেনিয়েছ। যেন শরীর একটা কি অদ্ভুত ব্যাপার ! যেন শরীরটা প্রেমের সামনে বড় এক শত্রু !

নয় কি ? বিশেষ করে অবিবাহিতা মেয়ের ক্ষেত্রে ?

পাগল আনন্দা। যে মেয়ে পথে পা বাড়িয়েছে, সে হাঁটবেই। তার থামার উপায় নেই !

তুমি হয় তো নিজের কথাই বলছ দীপু !

তা তো বলছিই। আমি তো নিজেকে দিয়েই বিচার করব।

তাহলে আপত্তি না থাকলে তোমার ব্যাপারটা বল।

দীপু পাথর থেকে নেমে একটা ঝোপে হাত বাড়াল।—আনন্দা ! আনন্দা ! এই দেখ দারুচিনির গাছ !

অবাক হয়ে বললাম, সে কি ! দারুচিনি জঙ্গলে হয় নাকি ?

হয় এখানে। সেবার তেজপাতাও দেখেছিলাম !

সে একটি ডাল ভেঙে পাথরে উঠে এলো। ছাল ছাড়াবার চেষ্টা করে বলল, আমার ফ্রিলি চলাফেরার একটা সুবিধে ছিল। কারণ তখন আমি একটা স্কুলে মাস্টারির চাকরি নিয়েছিলাম। বাবার আপত্তি ছিল না। ছিল মায়ের। কিন্তু আমি বরাবর ডোণ্ট কেয়ার মেয়ে।

সেটা টের পাচ্ছি।

দীপু হাসতে হাসতে বলল, বাবার মতে, এক্সপিরিয়েন্স হোক মেয়ের। কারণ উনি নিজেও সামান্য অবস্থা থেকে এতখানি উন্নতি করেছেন। দেশভাগের পর

সর্বশান্ত হয়ে চলে এসেছিলেম আসামে। তারপর খুব স্ট্রাগ্‌ল। স্ট্রাগলিং লাইফ খুব পছন্দ বাবার।

তাই স্বাভাবিক।

স্কুলের চাকরি পেয়েছিলাম নওগাঁওতে। সেই যে জোড়াবাট দেখে এলেন, সেখানে অন্য রাস্তাটায় যেতে হয়। বেশ দূর। থাকতাম এক বন্ধুর বাড়িতে। শুভ গেলে বেরিয়ে পড়তাম। ওরা ভাবত, বাড়ি যাচ্ছি। আর বাড়িতে ভাবত নওগাঁওতে আছি। ব্রিলিয়াণ্ট সুযোগ।

খুব ঘুরতে দুজনে?

খুব মানে—শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি বড়জোর।…দীপু অন্যমনস্ক হয়ে দারু-চিনির পাতা ছিঁড়তে থাকল।

একটু পরে হাসতে হাসতে বললাম, হুঁ। রিয়েল লাইফের লাভ স্টোরি কখনও শুনিনি।

বলেই তো দিচ্ছি। লিখবে না কিন্তু।

না। আমি সব বানিয়ে লিখি।

আনুদা, তুমি কখনও প্রেম কর নি? সত্যি বলছ?

দীপু নির্দোষ চোখে এমন তাকাল, না বলে পারলাম না, ওই একটু-আধটু। তবে সেটা একতরফা।

তার মানে?

মানে, আমি কোন মেয়েকে ভীষণ ভালবাসছি মনে মনে, সে টের পাচ্ছে না।

টের পাইয়ে দাও নি কেন?

সাহস ছিল না। যদি অপমান করে বসে?

প্রেম জিনিসটাতে সাহসের শর্ত থাকে।

তুমি নিজের কথা বল দীপু।

দীপু ঈষৎ সিরিয়াস ভঙ্গীতে বলল, আমার অথবা আমাদের দুজনেরই একটা ভুল হয়েছিল গোড়াতেই। শরীর বাদ দিয়ে প্রেম হয় না, তা জানি। কিন্তু শরীরের আবার নিজের একটা ব্যাপার আছে। ঠিক বোঝাতে পারব না। তুমি তো লেখক মানুষ, বুঝে নিও। আমরা শরীরের সেই নিজস্ব ফাঁদে আটকে পড়েছিলাম। উপমা দিয়ে বলতে গেলে ওই ঘাসে ঢাকা পাহাড়টা দেখছ, আকাশ আর মেঘ আর রোদ নিয়ে তার একটা টোটালিটি আছে—সেটাই ওর সৌন্দর্য। কিন্তু খুঁজলে ওর মধ্যে হয় তো অনেক রঙীন পাথর পাবে, এক চিল্‌তে স্বর্ণও পাবে, কিংবা কোন গুহা, যা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। আমরা শরীরের সেই টুকরো-টুকরো নিজস্ব জিনিষ আবিষ্কার করতে মেতে উঠলাম।…তোমার খুব খারাপ লাগছে! থাক।

না না। চমৎকার বলছ তুমি। বল।

তুমি আমাকে খারাপ মেয়ে ভাবছ!

মোটেও না। তুমি ভীষণ ভাল, দীপু!

দীপু হাসল।—মাস্টারি করতে করতে অনেক গুরুগম্ভীর কথা শিখে ফেলেছি। আনন্দা, ভেতরে ভেতরে আমি কিন্তু পঞ্চাশের জবুথবু বুড়ি। ছেলেবেলা থেকেই।

ওকে হাল্কা করার জন্য বললাম, মেয়েবেলা বল বরং! তোমাদের আবার ছেলেবেলা কী!

দীপু জোর হেসে উঠল।—ঠিক বলেছ তো! খেয়ালই করিনি কখনও। তাই তো আনন্দা, মেয়েরাও ছেলেবেলা কেন বলে?

পুরুষ-শাসিত সমাজের প্রভাবে।

ঠিক বলেছ! দীপু আবার যেন আনমনা হয়ে গেল। একটু পরে বলল, ভুল হয়েছিল, আমরা দুজনে শরীরের নিজস্ব ব্যাপারগুলো আবিষ্কার করে এমন হ্যাংলা হয়ে পড়লাম যে শেষ অবধি যখন আর নতুন কিছু আবিষ্কার করার মত কিছু রইল না, তখন ক্লান্ত হয়ে পরস্পর মুখ ফিরিয়ে বসলাম। নটেগাছ মুড়িয়ে গেল। ব্যস!

তাহলে শুভর একার দোষ নয়?

না।…বলে দীপু ফের অবিচল স্বরে বলল, তাই বলে প্রেমের খাতিরে শরীর নিয়ে শুচিবায় থাকাটা আমি মানিনে!

তোমার কষ্ট হয় না দীপু?

কিসের কষ্ট!

ধর, নষ্ট প্রেমের। কিংবা ধর, নিছক স্মৃতির?

না।…বলে দীপু হেসে উঠল ফের।—বলেছি না? বাবার শিক্ষা। জীবনে স্ট্রাগ্‌ল চাই এবং প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স চাই পোড় খাওয়ার। পুড়ে খাঁটি হওয়া যাকে বলে। আনন্দা, যদি আবার প্রেমে পড়ি, এবার আগের এক্সপিরিয়েন্স কাজে লাগাব কিন্তু।

তার মানে হিসেব করে পা ফেলবে!

নিশ্চয়ই।

কিন্তু দীপু, হিসেব করে কি প্রেম-ট্রেম জমে? আমি জানি না। আমি জিগ্যেস করছি।

আমিও তো জানি না। দেখতে চাই জমে কি না।

না জমলে?

না জমলে সুইসাইড করব না। সন্ন্যাসিনীও হব না।

আচ্ছা দীপু, যদি শুভ হঠাৎ তোমাকে ফের এ্যাপ্রোচ করে, কী করবে?

দীপু বিকৃত মুখে বলল, আমি ওকে ভীষণ ঘৃণা করি। সেও আমাকে ঘৃণা করে। পায়ের শব্দে ঘুরে দেখি একদল খাসিয়া মেয়ে এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। ওপাশে একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। স্কুলের মেয়েরা। রক্তিম আপেলের

মত উজ্জ্বল সুন্দর সব মুখ। দীপু ঘুরে ওদের কী বলল খাসিয়া ভাষায় ওরা জবাব দিল। তারপর আমাদের ঘিরে ফেলল। আমরা চেরাপুঞ্জির সৌন্দর্যে ভেসে গেলাম কিছুক্ষণের জন্যে।...

চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছি বিকেলে। মধুবাবু ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে বললেন, আসুন স্যার, ওদিকে একটু ঘুরি। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

রাস্তায় মিছিল করে খাসিয়া আর জয়ন্তী নরনারী আসছে নাচতে নাচতে। শিঙা এবং ঢোল বাজাচ্ছে ওরা। বর্ণাঢ্য মিছিল। আমাদের দলের সবাই ভিড় করে তাই দেখছে। আমাকে নিয়ে মধুবাবু বস্তী পেরিয়ে একটু দূরে চলে এলেন। কৌতূহল জেগেছিল। কী কথা থাকতে পারে মধুবাবুর?

একটা কথা জিগ্যেস করছি স্যার। কিছু মনে করবেন না!

না না। বলুন!

ইয়ে, দীপু আমার সম্পর্কে কিছু বলছিল নাকি!

মধুবাবুর প্রৌঢ়মুখে যুবকের লজ্জার রঙ ফুটে উঠল। আমাকে অবাক করে উনি চাপা স্বরে বললেন, মেয়েটার জন্যে বড্ড মায়া হয় স্যার। বুঝলেন? বিয়ে টিয়ে হওয়ার চান্স বোধহয় আর নেই। কারণ, সবাই জেনে গেছে পেটে বাচ্চা এসেছিল। অনেক চেষ্টায় চাপা দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু নওগাঁও স্কুলের চাকরিটা চলে যায়। অবশ্য চাকরি নেহাৎ সখের। বাপের প্রচুর পয়সা আছে। বিগ অফিসার কোম্পানিতে।

এবার একটু খারাপ লাগল। দীপুর প্রসঙ্গে এ ভদ্রলোকের এ সব মন্তব্য শুনতে চাই নি। দীপু আমাকে আকৃষ্ট করেছে গভীর ভাবে। তাই বললাম, কোন মেয়ের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা শোনা আমার অভ্যাস নেই মধুবাবু।

মধুবাবু অপ্রস্তুত হয়ে জিভ কেটে মাথা দোলালেন।—না, না। আমি সরল মনেই বলেছি স্যার। আসল কথাটা তো এখনও বলা হয় নি! মানে...

সপ্রশ্ন দৃষ্টি রাখলাম ওঁর মুখে।

আমি স্যার এই উনপঞ্চাশে পড়েছি। পাক্কা ব্যাচেলার। সারাজীবন সোশ্যাল ওয়ার্ক করেই কাটালাম। একবার ইলেকশানেও দাঁড়িয়েছিলাম। হেরে গিয়েছিলাম। পলিটিক্স বদমাইসি স্যার। আমার পোষাল না। আপনি সাহিত্যিক। জ্ঞানী মানুষ। তাই জিগ্যেস করছি, কাজটা কি ঠিক হবে?

কী কাজ বলুন তো?

দীপুর সঙ্গে আমার একটা রিলেশন গ্রো করেছে ইদানীং। তো সাহস করে শেষমেশ একটা প্রোপোজাল দিয়েই বসলাম। মানে, এমোশানাল অবস্থা আর কি।

মধুবাবু খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগলেন। আমার কান গরম হয়ে উঠল

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও। বললাম, দীপুকে আপনি বিয়ে করবেন?

আজ্ঞে।

দীপু রাজী হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, স্যার। বড্ড ফ্র্যাংক মেয়ে। বলেছে, কোন আপত্তি নেই। সামনে ফাল্গুনে বিয়েটা হতে পারে। মিঃ বোসের কাছে কথাটা ও নিজেই তুলবে বলেছে। উনি হাতে স্বর্গ পাবেন।

এ মুহূর্তে হঠাৎ কেন যেন এই খোঁড়া প্রৌঢ় লোকটির প্রতি সহানুভূতি জাগল এবং দীপুর প্রতি—অভিমান বলব না, কেমন একটা সন্তর্পণ ঘৃণাভাব দেখা দিল। কিছুতেই সেটা মন থেকে সরাতে পারলাম না।

মধুবাবু ফের বলালন, ক্লাবের ব্যাপারেই দীপুর সঙ্গে মেলামেশা হয়েছে আমার। আসলে মেয়েটা খুব সরল। তার ওপর মিঃ বোস মেয়েকে যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়েছেন। বুঝে চলতে পারে নি দীপু। তাই বিপদে পড়েছিল! ওর জন্যে আমার খুব কণ্ট হয় স্যার।

ঘুরে পা বাড়িয়ে বললাম—ভালই তো। আপনি মহৎ কাজই করছেন।

উজ্জ্বল [illegible] ভদ্রলোক বললেন, আপনি বলছেন স্যার?

বলছি। চলুন।...

তারপর মুহূর্তে-মুহূর্তে চেরাপুঞ্জি আমার কাছে নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিল। অসহ্য তার ঠাণ্ডা দাঁতের কামড়। মন তেতো। ধুর ধুর! এমন জায়গায় মানুষ থাকে? এত শীত, আর দুরন্ত বৃষ্টিও! শুধু মেঘ আর মেঘ। অন্ধকারে হাজার হাজার ডাইনী বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ের গুহা থেকে। হিহি করে হাসে সারারাত। সুন্দরী যুবতী পৃথিবীর মুখের চামড়া এখানে ভাঁজবহুল, লোল। জরাগ্রস্ত এক বৃদ্ধা। দীপু বলেছিল, তার মধ্যে নাকি এক পঞ্চাশের জবুথবু বুড়ি বসে আছে। ঠিক ঠিক তাকেই দেখতে পাচ্ছিলাম।

অন্ধকার রাস্তায় জিপ ফিরে চলেছে যখন, দীপু তখন সেই গিয়ারটা এড়িয়ে আমার কাছে ঘেঁষে বসেছে। তার উরুর উষ্ণতা কোথায় গেল? হিম-হিম স্বাদ শুধু। আমরা সবাই ক্লান্ত। চুপচাপ বসে আছি। জিপের ঝাঁকুনি সারাক্ষণ। ঘুরে ঘুরে রাস্তা চলেছে যেন নরকের দিকে। আমার বাঁ পাশের পর্দা এবার মুড়ে দেওয়া হয়েছে। নয়তো জমে যেতাম ঠাণ্ডায়।

দীপু আস্তে একবার বলল, সরে এসো না আনুদা, পড়ে যাবে যে! তারপর সে হাত বাড়িয়ে আমার কোমর বেড় দিয়ে কাছে টানল। তারপর কানের কাছে মুখ রেখে বলল, শীতের মধ্যে উত্তাপ যতটুকু পাই, নিতে দোষ কি?

তার এই আকর্ষণ এবং ঘনিষ্ঠতায় প্রেম নেই, [illegible] ভালই জানি সে সত্যি সত্যি একান্তভাবে উত্তাপই চাইছিল। এবং এও জেনেছি, সেই উত্তাপ পেতে সে কোন বাছবিচার করবে না। দীপুর জন্যে আবার মমতা ফিরে এলো।...

রাত অনেক হলে বাগানের দিক থেকে ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও করে একটা পেঁচা ডেকে ওঠে। মল্লিকদের কুকুরটা সন্দিগ্ধভাবে দু-একবার ডেকেই সপ্রশ্ন চুপ করে যায়। আমি জানি, এইবার তার আসার সময় হয়েছে।

আমাদের বাড়িটা বেশ বড়। লোকজন তত কিছু নেই। ওপরে-নিচে চারটে করে আটটা ঘর। নিচের দুটো ঘরে থাকেন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আর তাঁদের মেয়ে শ্রাবন্তী। একটা ঘরে পুরনো আসবাবের আবর্জনা। বাকিটাতে বাড়ির সাবেক আমলের চাকর ষষ্ঠী-দাস। তার বয়সও প্রায় সত্তর হয়ে এল। সারারাত খক খক করে কাশে আর একটু শব্দ হলেই ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, যাঃ! যাঃ! আমি জানি কাকে সে এমন করে তাড়াতে চায়।

ওপরের চারটে ঘরে আমার জীবন যাত্রা, আমার আর শ্রুতির। শ্রুতি বড় ঘুমকাতুরে। সে কিছু টের পায় না। এই যে আমি কাকে এত রাতে দরজা খুলে দিই, কার সঙ্গে কথা বলি, কিচ্ছু না। আমার আদরের ভেতর কখন গভীর ঘুমে এলিয়ে যায়। তার শরীরের শ্বাসপ্রশ্বাস শুনতে শুনতে হঠাৎ চমক ভাঙে প্রাকৃতিক সংকেতের মতো পেঁচার চিৎকারে। তারপর বাগানের দিকে শনশন করে ওঠে বাতাস। গাছপালা দুলতে থাকে। পুরনো জানলাটা খট খট করে শব্দ করে। তারপর সিঁড়িতে যেন পায়ের শব্দ। সে আসছে। উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠি। সিঁড়িতে যেন পায়ের শব্দ। সে ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

দরজা খুলে আমি একটু সরে দাঁড়াই। টের পাই তার ঘরে ঢোকা···তার শরীরের গন্ধে। গন্ধটা ছেঁড়া ঘাসের মত কিংবা ভিজে মাটির মত, অথবা পাখির বাসার মত ঈষৎ ঝাঁঝাল, সঠিক বলা কঠিন কারণ তার গন্ধটা যেন খুবই প্রাকৃতিক। হয়তো সে প্রকৃতির খুব ভেতরদিকে চলে গেছে বলেই। জীবজগতের অবচেতনায় ওই গন্ধ থাকে কি? বুঝতে পারি না। তার অশরীরী শরীরের কোন গন্ধ থাকার কথা নয়। তাকে প্রশ্ন করলে সে বলে, তাই বুঝি? জানি না তো।

তাকে বলি, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

সে বলে, আমি তো এরকমই।

না। তুমি এরকম ছিলে না।

সে একটু হাসে। তা ঠিক। ছিলাম না।

কেমন ছিলে সে তো মনে পড়ে তোমার, নাকি পড়ে না?

বোকা। মনে না পড়লে এলাম কেন?

তাহলে তুমি নিজেকে দেখাও। আমারও তো তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

তুমি ভয় পাবে।

তোমাকে আমি ভয় পাবনা স্মৃতি! তুমি আমারই অপরাংশ হয়ে ছিলে একসময়।

একটু পরে সে বলে, পারছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে।

তাহলে থাক।

বরং চল আমরা বাগানে যাই।...

আমরা বাগানে গিয়ে বসে থাকি। কথা বলি। পুরনো সব কথা...স্মৃতি থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে। দুঃখের কথা। সুখের কথা। কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই ষষ্ঠীদাসের ডাক শুনতে পাই। সে লন্ঠন হাতে আমাকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসে। সে বড় ধূর্ত মানুষ। সব টের পায়। আমাকে বকাবকি করে। বলে, ঘুম হয় না তো ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন? এমনি করে হিমে বসে থাকলে যে উল্টে অসুখে পড়বে।...

হতচ্ছাড়া ষষ্ঠীদাসের দৌরাত্ম্যে অবশেষে বাগানে গিয়ে কথা বলা ছাড়তে হল। কিন্তু বুঝতে পারলাম, কেন স্মৃতি ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে চাইত না। শ্রুতিকে ও ঈর্ষা করত। ঘুমন্ত শ্রুতির পাশে গিয়ে দাঁড়ালে আমার খুব ভয় হত। বলতাম, ওখানে কী করছ? এখানে এস। শ্রুতি জেগে যেতে পারে।

জাগলেও তো আমাকে দেখতে পাবে না।

কে জানে! মেয়েরা হয়তো সব টের পায়।

সে হাসত। হুঁ, পায়ই তো! তুমি যখন শ্রুতিকে আদর কর, দূরে থেকে টের পাই। মনে হয়, আমার যদি শরীর থাকত!

ওকে মেরে ফেলতে তো?

হুঁ।

এখন পার না?

না।...একটু পরে বলল ফের, আমি আর কিছু পারি না। শুধু যাওয়া-আসা ছাড়া।

মনে হল, ও কাঁদছে। বললাম, ওকে ঈর্ষা কোর না। ও তোমারই সহোদরা।

শোন!

বল।

তুমি কাকে বেশি ভালবাস এখন...শ্রুতিকে না আমাকে?

দুজনকেই।

মিথ্যা! আমি তোমার চারঘরের সংসার ঘুরে দেখেছি। এখন যা-খা যেমন হয়ে আছে, আমার সময়ে তেমন কিছুই ছিল না। ওই ড্রেসিং টেবিলটা পর্যন্ত নতুন! আর শ্রুতির কত শাড়ি! কত বিদেশি সেন্ট! কত...

শ্রুতি একটু বিলাসী প্রকৃতির মেয়ে। আর তুমি জান, তুমি ছিলে সাদাসিধে...

সাজতে ভালবাসতে না। টাকাকড়ি খরচ করতে দিতে না। মনে পড়ে, সেবার তোমার জন্য অত সুন্দর একখানা কাঞ্জিভরম কিনে আনলাম। তুমি শ্রুতিকে পরতে দিলে। আর একবার…

হঠাৎ থেমে গেলাম। টের পেলাম। ও নেই। চলে গেছে। এখনকার মত মাথা ভাঙলেও আর ফিরে আসবে না। কোথায় যায় ও? জীবজগতের সীমানা পেরিয়ে প্রকৃতির কোন গভীরতর স্তরে গিয়ে বসে থাকে ও? আমি যদি ওকে অনুসরণ করে যেতে পারতাম সেখানে!…

একরাতে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি থামল না। মধ্যরাতে একটু কমল মাত্র। তারপর তার আসার সংকেত শুনতে পেলাম বাগানের দিকে। দরজা খুলে দিলাম। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

সেই মুহূর্তে শ্রুতি জেগে গেল। চমকে ওঠা গলায় বলল, কোথায় গেলে?

এই তো!

অন্ধকারে দরজা খুলে কোথায় যাচ্ছ?

সে টেবিল ল্যাম্প জেবলে দিল। ভারি হাতে দরজা আটকে দিয়ে বললাম, বৃষ্টি দেখতে যাচ্ছিলাম বারান্দায়।

শ্রুতি একটু চুপ করে থাকার পর বলল, জানলা থেকে দেখা যায় না?

ছাট আসছে যে!

তোমার কী হয়েছে?

কই, কিছু না।

আমার ধারণা, তুমি সারারাত জেগে থাক।

যাঃ! কে বলল?

আমি জানি। তুমি…তোমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না আমার পাশে! শ্রুতি শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলল, কতবার হাত বাড়িয়ে তোমাকে খুঁজি, পাই না।

আশ্চর্য! আমি তো তোমার পাশেই থাকি, না।

শ্রুতি বালিশে মুখ গুঁজে বলল, কোথায় থাক তুমিই জান।

ওর কাছে এসে পিঠে হাত রেখে বললাম, ঘুমোও।

তুমি?

আমার ঘুম পাচ্ছে না। আর বৃষ্টিটা কী সুন্দর—শোন!

আমি জানি, কেন ঘুম হয় না তোমার! দিদির কথা মনে পড়ে তো?

হঠাৎ ওকথা কেন শ্রুতি?

হাসতে হাসতে বললাম, ছিঃ! যে মরে গেছে তাকে ঈর্ষা করতে আছে?

কে মরে গেছে? দিদি মরে নি। দিব্যি বেঁচে আছে।

পাগল! কী সব বলছ শ্রুতি?

শ্রুতি ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে বলল, বেঁচে নেই—তোমার মনে? ষষ্ঠীদা বলে,

তুমি রাতে বাগানে গিয়ে বসে থাক—কেন আমি যেতে দিই এমন করে ? কেন বাগানে যাও তুমি ? বল ?

ঘুম আসে না।

এত ভাবলে ঘুম তো আসবেই না। শ্রুতি আবার পাশ ফিরে শুল। ফের আস্তে করে বলল, আরও অনেক কথা জানি। বলব না।

কী জানে, সে কিছুতেই বলল না। কিছুক্ষণ সাধাসাধি করে ছেড়ে দিলাম। মনে হচ্ছিল শ্রুতি কেঁদে ফেলবে—অথবা এক নেপথ্যের কান্না ওকে ভিজিয়ে দিচ্ছে ভেতর থেকে। অবশ্য খুব শক্ত মেয়ে সে, জানি। স্মৃতির একেবারে উল্টো। সে প্রচণ্ড সাহসী। বেপরোয়া। স্পষ্টভাষী মেয়ে। কিন্তু স্মৃতির মতো জেদি নয়।

পরের রাতে আমার উৎকণ্ঠা ছিল স্মৃতির আসা না টের পেয়ে যায় সে। এরাতে বৃষ্টি ছিল না। নরম চেহারার একটুকরো চাঁদ ছিল বাগানের মাথায়। পোকামাকড় ডাকছিল বৃষ্টির স্মৃতি নিয়ে। ফিকে জ্যোৎস্নায় ভিজে গাছ পালা আর ঘাসের গন্ধের সঙ্গে মিশে রাতের ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল ঘরে। ভাবছিলাম, কাল রাতে ফিরে গেছে অমন বাধা পেয়ে, আজ কি আর আসবে স্মৃতি ?

এল—কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নয়। জানালার ওধারে দাঁড়িয়ে বলল, এসেছি।

এ রাতে কোন প্রাকৃতিক সংকেত শুনলাম না। কোন পূর্বাভাষ না। মল্লিকদের কুকুরটাও বুঝি অগাধ ঘুমে লীন। বললাম, ভেতরে আসছ না কেন ?

একটা কথা বলতে এলাম শুধু।

কী কথা ?

আমি আর আসব না।

জানালার রড শক্ত করে ধরে বললাম, না। তোমাকে আসতেই হবে—আমি যতদিন বেঁচে আছি। আমার রাতগুলো তোমার জন্যেই রেখেছি, আর দিনগুলোকে শ্রুতির জন্য।

সে একটু হাসল। তুমি বড়লোক মানুষ। তোমার কত খেয়াল!

না, না। খেয়াল নয়। এমনটা হয়ে গেছে—তুমি বুঝতে চেষ্টা কর লক্ষ্মীটি। চিরকাল আমার বরাতটাই এরকম। কিছু নিয়ন্ত্রণে থাকে না আমার। আরও দেখ, আমার সব বাস্তব আর কল্পনাও আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। ওরা দুটো দিকে, মধ্যিখানে আমি। টাগ অফ ওয়ারের নিষ্ঠুর খেলা।

ওসব কথা আমার মাথায় ঢোকে না। আমি যাই!

শোন, শোন! একটা কথা বলে যাও।

কী ?

তুমি কেন আর আসবে না ? শ্রুতির জন্যই কি ?

শ্রুতির জীবন আমার মত নষ্ট হয়ে যাক, তা চাইনে। আমি তার দিদি।

শোন, শ্রুতির বদলে তোমাকেই চাই।

এমনি করে একদিন আমার বদলে শ্রুতিকে চেয়েছিলে, মনে পড়ে? কী? চুপ করে গেলে যে?

আমি অনুতপ্ত। ক্ষমা কর।

দেখ আমি যেখানে আছি, সেখানে ক্ষমা বা অনুতাপ বলে কোন কথা নেই। তোমার মনে পড়ে? ওই খাটে আমি শুয়ে ছিলাম। আমার শ্বাসকষ্ট। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন তুমি আর শ্রুতি পাশের ঘরে ছিলে। একটু পরে শ্রুতি এল। ওকে দেখেই চমকে উঠলাম। তার শরীরে তোমার ছাপ পড়েছিল। জলের গ্লাস তার হাতে কাঁপছিল।

তুমি ধাক্কা মেরে গ্লাসটা ফেলে দিলে। শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম···

জানালায় কী করছ?

শ্রুতির চমকেওঠা প্রশ্নে আমিও খুব চমকে উঠলাম। সে টেবিলল্যাম্প জেবলে বিছানায় উঠে বসল। তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল আবার তুমি জেগে আছ?

ঘুম আসছে না। দেখ অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে।

শ্রুতি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে বলল, তুমি চাও, আমিও দিদির মত মরে যাই, তাই না?

আঃ কী বলছ শ্রুতি!

তুমি বুঝি ভাবছ আমি কিছু টের পাই না? শ্রাবন্তীর দিকে এবার তোমার চোখ পড়েছে।

ছিঃ! চুপ কর।

শ্রুতি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। না—চুপ করব না। তুমি চাইছ, আমিও দিদির মত স্যুইসাইড করি, আর তুমি শ্রাবন্তীকে বিয়ে কর।

শ্রুতি! চুপ কর। কী বলছ তুমি? স্মৃতি স্যুইসাইড করেনি।

করেছিল। আমি জানি। শ্রুতি নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বরে বলল। ক্যাপসুলটা খেয়ে রিঅ্যাকশান হচ্ছিল, ডাক্তার সেটা বন্ধ করতে বলেছিলেন। দিদির বালিশের তলায় কৌটোটা দেখেছিলাম। কৌটোটা খালি ছিল।

আশ্চর্য। তুমি বলনি! কেন বলনি শ্রুতি?

তুমি কষ্ট পাবে ভেবে। শ্রুতি মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল।

তার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে সে শুয়ে পড়ল। টেবিলল্যাম্প নিভিয়ে দিল। জানলার বাইরে বাগানের দিকে জ্যোৎস্নার ভেতর কুয়াসার মত কী একটা দাঁড়িয়ে আছে। স্মৃতিই কি? শ্রুতিকে ডাকলাম, শ্রুতি, শোন!

কী?

শ্রাবন্তীর কথা তোমার মাথায় এল কেন? তার সঙ্গে তো আমার দেখাও হয়

না। তেমন কিছু আলাপও নেই। তাছাড়া সে তো তোমার কাছেও আসে না।

বাইরে কী হয় তুমিই জান। সারাদিন কোথায় থাক, কী কর, আমি কি দেখতে যাই ?

শ্রুতি, ফ্লাড রিলিফের কাজে আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয় আজকাল। অন্য-বিছুতে মন দেবার সময় কোথায়।

তুমি লিডার মানুষ। তোমার মনে কত দয়া। এমনি করে সেবার ফ্লাডের সময় তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলে। তখন বুঝিনি, এই বাড়িটা তোমার একটা ফাঁদ।

ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, ঠিক আছে। ওদের চলে যেতে বলব। ওদের এরিয়া থেকে ফ্লাডের জল নেমে গেছে। কিন্তু আমার অবাক লাগছে শ্রুতি। নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। কাল রাতে তুমি বললে, স্মৃতিকে ভুলতে পারি নি। আজ রাতে বলছ, শ্রাবন্তীর জন্য···

কথা কেড়ে শ্রুতি বলল, তাই ভেবেছিলাম। পরে মনে হয়েছিল, যে মরে গেছে তার পেছনে কেন তুমি ছুটবে ? যে বেঁচে আছে রক্তমাংসের শরীরে, তার পেছনে ছোটাই স্বাভাবিক। নয় ? বল তুমি।

কিন্তু তুমি তো আছ। তুমি তো জীবিত।

আমি বাসি হয়ে গেছি। দিদিও তোমার কাছে বাসি হয়ে গিয়েছিল। তাই তুমি আমার পেছনে ছুটেছিলে। কিন্তু জেনে রাখ, আমি দিদির মত বোকা নই।

তর্ক করে লাভ নেই। ফেমিনিন লজিক। আমি চুপ করে থাকলাম। শ্রুতিও চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। শ্রুতি আমাকে বাধা দিল না।

বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কতক্ষণ। স্মৃতি কি আর কোনদিন আসবে না কথা বলতে ? জ্যোৎস্নায় হেমন্তের গাঢ় কুয়াসা জড়ানো। ঘুম জড়ানো গলায় খুব গভীর থেকে পোকামাকড় গান গাইছে। সামনে শীত · তখন ওরা আরও গভীরে দীর্ঘ ঘুমের দিকে যাবে কোথায় সেই প্রাকৃতিক অভ্যন্তর—জঠরের উষ্ণতা যেখানে বাইরের পৃথিবীর হিমকে পৌঁছতে দেয় না ? সেখানে কি স্মৃতিও ঘুমোতে চলে গেল জীবজগতের অবচেতনায় ?

আমার কষ্টটা বাড়ছিল। স্মৃতিকে আমি ভালবাসতাম। শ্রুতিকেও হয়তো ভালবাসি—চেষ্টা করি। পেরে উঠি না। খালি মনে হয়, শ্রুতি আমার জন্য নয়, আমার সংসারের জন্য। একটি প্রয়োজনীয় ফিলার শ্রুতি। আর স্মৃতি ছিল আমার জন্য—আমার সংসারের বাইরে একটি নিজস্বতার প্রতীক। স্মৃতি, কেন গেল ?

যাই নি। সে ফিসফিস করে বলল। এই তো আছি।

কিন্তু কোথায় আছ ? আগের মত কাছে আসছ না কেন ?

পারছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছি ক্রমশ। নিজেকে কুড়িয়ে বড়ো করা যাচ্ছে না।

মনে হল, চারদিকে ঘাস, গাছপালা, পোকা-মাকড়, শিশির, কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না আর কুয়াসার ভেতর থেকে স্মৃতির শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। সে বলছে, আমি আছি। আমি আছি।

আর চারপাশ থেকে আবছা এক গন্ধ—ছেঁড়া ঘাসের পাতা অথবা শেকড়ের, বৃষ্টিভেজা মাটির, জলের, পাখিদের বাসার গন্ধের মতো কটু—স্মৃতির দ্বিতীয় জীবনের গন্ধ। প্রকৃতির নিজস্ব গন্ধ।

লণ্ঠনের আলো ফুটে উঠল। দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছিল। ষষ্ঠীদাসের ডাকাডাকি শুনতে পাচ্ছিলাম। সে সব টের পায়।…

ছুটির দিনে দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিল সুধাকর। খাওয়ার পর শীতের রোদে একটুখানি বসতেই চোখে ঘোর লেগেছিল। তখন লেপঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েছিল সে। ঘুম আসতেও দেরী হয় নি। তারপর কিছু এলো-মেলো স্বপ্নও দেখে থাকবে। মীনাক্ষীর টানাটানিতে একসময় তার ঘুম ভাঙল।

চোখ খুলে সুধাকর দেখল, বারান্দার রোদ উঠোনের পাঁচিল পেরিয়ে যাচ্ছে। ছায়ার বুকের তলায় যথারীতি তার ছোট্ট সংসারটা আদুরে বেড়ালের মত শান্ত হয়ে রয়েছে। শহরতলীর এদিকটা মোটামুটি চুপচাপই থাকে সারাক্ষণ। ঘুম ভাঙার পর তার কানে কেবল একটা গাড়ির চলে যাওয়া শব্দ ভেসেছিল—আস্তে আস্তে সেটা ফুরিয়ে গিয়ে ফের স্তব্ধতা নামছিল। সুধাকর বুঝতে পারছিল না মীনাক্ষী তার ঘুম ভাঙাল কেন। আঙুলে ফুল চটকালে যেমন কিছু আলতো রঙ আর গন্ধ লেগে থাকে, মনে স্বপ্নের সেই রকম একটুখানি অস্পষ্ট চিটচিটে ভাব, তবে চেষ্টা সত্ত্বেও স্বপ্নটা কী তা স্মরণ করা অসম্ভব। সে ভাল করে তাকিয়ে এবার মীনাক্ষীর মুখের চাপা উৎসাহটা লক্ষ্য করতে পারছিল। কেমন যেন অস্ফুট চাঞ্চল্যে তার চোখদুটো টলমল করেছে। নিস্পৃহ ঠাণ্ডা গলায় সুধাকর বলল, কী হয়েছে?

মীনাক্ষী একটু হেসে তার মুখের ওপর ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, বিশু ঠাকুরপোরা এসেছে।

তাই নাকি! বলে সুধাকর কুঁকড়ে লেপটা ভালো করে ঢাকা দিয়ে নিল। বিশ্বনাথরা এসেছে শুনে যতখানি উৎসাহ আর অস্থিরতা তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, তা দেখা যাচ্ছিল না তার মধ্যে। বিশ্বনাথ আজকাল ভালো চাকরী করে। ওর বৌ মণিকাও কোথায় যেন স্কুলে গান শেখায় শুনেছিল। মণিকার গান অবশ্য শোনার সুযোগ পায়নি সুধাকর। তবে মীনাক্ষী শুনে থাকবে। সে কয়েকবার ওদের বাড়ি গেছে। ছেলেকে নিয়েই গেছে। সুধাকরের যাবার অবসর হয়নি। পথে কয়েকবার দৈবাৎ মণিকার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। ভালো চেনাজানা থাকলে এসবক্ষেত্রে যা হয়, তাই হয়েছে। তবে দুজনেরই নিজ নিজ কাজের তাড়া—নিজের-নিজের দিকে চলে গেছে। তারপর কিন্তু অবাক হয়ে সুধাময় দেখেছে—সে মণিকার একটা অস্পষ্ট ছবি হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে যেন দেয়ালের একটা যোগ্য জায়গা খুঁজছে। খুব বিরক্ত হয়ে সে তখন তার কাজের কথা নিয়ে ভাবতে বসেছে। এই মণিকার চেহারাটা কোনমতে স্পষ্ট স্মৃতিতে ভাসে না তার।

যখন দেখা হয়, চিনতে পারে—আরে তাই তো, ও এইরকম। তারপর কিন্তু ভুলে যায়। মণিকার মুখটা আর স্পষ্ট মনে থাকে না। নানা রকম মুখের আদলে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে সে। ভাবে, হয়ত এই রকমই হবে। পরে মুখোমুখি হলে দেখে—নাঃ, মণিকা অন্যরকম। আসলে খুব ঘনঘন দেখাসাক্ষাৎ না হলে হয়ত এমন বিস্মৃতি বা ভুল স্বাভাবিক।

হাতপা গুটিয়ে এখন সে চেষ্টা করছিল মণিকার মুখের ছবি খুঁজতে। বাজী ধরার মত হাতড়াচ্ছিল সে। উঠে গেলেই পাশের ঘরে দেখতে পাবে। মিলিয়ে দেখবে তখন। অবশ্য এই ধরনের ছেলেমানুষী সুধাকরকে অনেক সময় পেয়ে বসে। বিয়ের পর অনেকদিন মীনাক্ষীর চেহারা নিয়ে এমনি বাজী ধরে খেলেছে সে। আজকাল আর অবশ্য খেলবার সুযোগ নেই। মীনাক্ষীর ছবি এখন মারাত্মক রক্তমাংসময় আর প্রাণবন্ত—চেষ্টা করেও ভোলা যাবে না। দেয়ালে খোদাইকরা টেরাকোটার শিল্প সে—ফ্রেস্কো নয় যে ঝড়জলে ধুয়ে-মুছে যাবে।

মীনাক্ষী অবাক হচ্ছিল তার আচরণে। ভুরু কুঁচকে ফের চাপা স্বরে বলল, ও কী! ওঠ। ওরা কী ভাবছে।

আলসেমিতে জড়িয়ে সুধাকর বলল, উঠছি। ততক্ষণ তুমি গিয়ে গল্প কর না!

লেপটা তুলে দিতে গেল মীনাক্ষী। সুধাকর প্রাণপণ চেষ্টায় বাধা দিতে দিতে আরও গুটিমুটি জড়াল সেটা। এবার মীনাক্ষী যেন আমোদ পাচ্ছিল। সে কাতুকুতু দিতে থাকল তাকে। চোখ বুজে নিঃশব্দে হাসছিল সুধাকর। কাতুকুতুতে ওর সুড়সুড়ি লাগে না আদৌ। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হল মীনাক্ষী। তখন চিমটি কাটতে থাকল।

সুধাকরের তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর গায়ের চামড়া বেশ পুরু আর টান টান। এক সময় ভোরবেলা উঠে ব্যায়াম করা অভ্যাস ছিল। দেহ বেশ কিছুটা সুগঠিত হয়ে উঠেছিল। আজকাল মনের সে একাগ্রতা আর নেই। ভোরে উঠতে পারে না। কাজকর্মে ব্যস্ততাও আছে। আলসেমির সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাকে। তবে কতকগুলো ব্যাপারে আলসেমিকে সে কিছুতেই হারাতে পারে না।

পেটের ওপর চিমটি বা কাতুকুতু দেবার উদ্দেশ্যে মীনাক্ষী এক ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিতেই সুধাকর ওকে বাগে পেল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবার চেষ্টা করছিল সে। আর তখনই দরজার সামনে মণিকা এসে দাঁড়িয়েছে।

পর্দা সরানো ছিল। এক ঝটকায় অপ্রস্তুত ভিজে মুখে মীনাক্ষী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, কুড়ের রাজা একেবারে। দেখুন না, তখন থেকে ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করছি·····

মণিকাও অপ্রস্তুত হয়েছিল। ভাবছিল, সরে আসবে কি না। সে বলল, হার মানলেন বলুন। আমি হলে কিন্তু হার মানতুম না।

মীনাক্ষী বলল, তাই নাকি! চেষ্টা করে দেখুন তো ভাই।

তার আগেই এক লাফে সুধাকর উঠে বসেছে। ডোরাকাটা পাজামা গুটিয়ে গিয়েছিল। সেটাও ক্ষিপ্র হাতে ভদ্র করে নিয়েছে। সে বলল, আরে আসুন, আসুন। আমি কিন্তু বিশ্বাসই করিনি ওর কথা। তাই···

তাই উঠছিলেন না। মণিকা কথা কেড়ে বলল, তবে ভালো করে চোখ দুটো রগড়ে নিন। স্বপ্নও হতে পারে।

মীনাক্ষী লেপ ভাঁজ করছিল। তার মুখটা তখনও থমথম করছিল। মণিকা একেবারে এখানে এসে উঁকি মেরেছে—এইটে তার খারাপ লাগছিল। এই গায়েপড়া ভাবটুকু এতদিন সে মণিকার মধ্যে লক্ষ্য করেনি। তাছাড়া ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে একটা কথা আছে। যত চেনাজানাই থাক, এমনি করে অপরের শোবার ঘরে সাড়া না দিয়ে হুট করে চলে আসার কোন মানে হয় না। মীনাক্ষী অনেকবার ওদের বাড়ি গেছে। কিন্তু এমন আচরণ কোনমতে তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মীনাক্ষী কত সাবধানে, কত ভদ্রতায় সময়টুকু কাটিয়ে এসেছে। কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায়নি সে। এমনকি ওদের ছেলেপুলে নেই কেন, কৌতূহল তীব্র থাকা সত্ত্বেও সে নিয়ে কোন প্রশ্ন করেনি।

খাটের মাথার দিকে পাশেই দেয়াল ঘেঁষে একটা বড় টেবিল। তার ওপর সুধাকর মীনাক্ষী ও তাদের ছেলে রন্টুর কয়েকটা ছবি রয়েছে। ছবির আশেপাশে কয়েকটা সুন্দর কাঠের পুতুল! মণিকা এগিয়ে নিঃসঙ্কোচে পুতুলগুলো নাড়া-চাড়া করতে থাকল। ছবিগুলো দেখছিল না হয়ত। একটা পুতুল তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল সে। বলল, কোথায় কিনলেন? বেশ সুন্দর তো!

মীনাক্ষী জোর করে হেসে বলল, মহীশূর থেকে এনেছিলাম। দেখবেন, গলার কাছটা রন্টু ফাটিয়ে দিয়েছিল—আঠা লাগানো আছে।

বাঃ, ভারি চমৎকার পুতুল কিন্তু। মণিকা বলল।

রন্টুর কথা জিগ্যেস করছে না দেখে মীনাক্ষীর আরও খারাপ লেগেছে। সে বিছানাটা গুছিয়ে ফেলে বলল, ঠাকুরপো একা বসে আছেন ওদিকে। চলুন, ওঘরে গিয়ে বসা যাক।

সুধাময় ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে মণিকাকে লক্ষ্য করছিল এতক্ষণ। কী মুশকিল, এরকম ডিমালো নিটোল মুখই তো মণিকার—কিছুতেই মনে আসছিল না। এবারে নাকে একটা সরু সাদা পাথরের ফুল পরেছে মণিকা। একটু অন্যরকম লাগছে—কেমন যেন বিদেশী-বিদেশী ধাঁচ। কেমন নতুন হয়ে ওঠা চেহারা। ঠোঁটের নীচে একটা মোটা তিল আছে এ্যাদ্দিন লক্ষ্য করা যায় নি। সুধাময় টেবিলের দেরাজ খুলে সিগ্রেট দেশলাই বের করল। তারপর পা বাড়িয়ে বলল, রন্টু কোথায়? ওকে ডাকো।

ছাদে খেলা করছে। মীনাক্ষী বলল।···আরে, তুমি···

সুধাময় থমকে দাঁড়াল।……কী হল?

তোমার শীত করছে না? গেঞ্জী গায়ে বেরোচ্ছ যে! এতক্ষণ তো লেপ ছেড়ে উঠতে চাচ্ছিলে না, বলে মীনাক্ষী কোণের দিকে রাখা ছোট্ট আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা এনে দিল।

সুধাকর সেটা গায়ে চড়িয়ে বাইরে গেল। পাশের ঘরটা ড্রইংরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বেশ ভালো করে সাজানো থাকে ঘরটা। সে দেখল বিশ্বনাথ খবরের কাগজে চোখ রেখে বসে রয়েছে। ওকে দেখে সে বলল, আয়। ঘুমুচ্ছিলি নাকি!

সামনে সোফায় বসে সুধাকর বলল, নাঃ। একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলুম।

বিরক্ত হলি না তো। বলে বিশ্বনাথ হেসে উঠল।

না, না। তোর তো আসবার কথা ছিল।

ছিল। কিন্তু আসাই হত না হয়ত।

কেন?

আর বলিস কেন? কোম্পানী ছুটির দিনেও প্রোগ্রাম চাপিয়ে দেয় কাঁধে। বারাসতের ওদিকে একটা কনট্রাকট পাওয়া গেছে। তাই নিয়ে…মরুকগে। বিশ্বনাথ কাগজটা গুটিয়ে রাখল।…তোর খবর কি বল্। কোথায় যেন ট্রান্সফার করছে বলছিলি!

সুধাকর বলল, হ্যাঁ। বহরমপুরে। কী করব, তাই ভাবছি।

পকেট থেকে সিগ্রেট বের করছিল বিশ্বনাথ। সুধাকর নিজের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল। সিগ্রেট জেবলে বিশ্বনাথ বলল, বহরমপুর ভালো জায়গা। তবে তোর অবশ্যি অসুবিধে আছে। নিজের বাড়ি করে ফেলেছিস।

আর বাড়ি! সুধাকর মুখ বিকৃত করল।…কী নচ্ছার জায়গা। আগে জানলে এখানে বাড়ি-ফাড়ি করার কথা কে ভাবতো। চারপাশে সব আজেবাজে প্রকৃতির লোকের আড্ডা। সত্যি কিন্তু, নিরিবিলি শান্তিতে থাকবার কোন উপায়ই নেই।

কেন? এদিকটা তো বেশ নিরিবিলি।

ও বাইরে-বাইরে। রাজ্যের যত ওয়াগনব্রেকার আর গুণ্ডাবদমাস এখানে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রের দিকে কী সব নারকীয় ব্যাপার ঘটে, তুই কল্পনা করতে পারবি না। রেই…সতু মিস্ত্রির লেনেই বরং ভালো ছিল। বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে গেল। তৈরী বাড়ি ছিল। একতলা—ত্রিশ-হাজার অব্দি দাম উঠেছিল। তখন নেলুম না।

বিশ্বনাথ হেসে উঠল।…না। ভালো করেছিস। নিজহাতে গড়া মোর… সেই যে কী আছে পদ্যে!—হ্যাঁ—নিজহাতে গড়া মোর কাঁচাঘর খাসা। বেশ ভালো বাড়ি করেছিস। হ্যাঁরে, বাইরে ওই লনমত জায়গাটুকু তোরই তো?

হ্যাঁ।

সবজীক্ষেত বা বাগান-টাগান করছিস না কেন ?

ঘাড় নাড়ল সুধাকর।…করবো। সময়ই পাচ্ছি না একেবারে।

বৌকে ভার দে। ম্যানেজ করে নেবে। পারবে না ?

কে, মীনাক্ষী ? একটু হাসল সুধাকর।…নাঃ। ওর দ্বারা ওসব হবে না।

বেশ আরামে পাদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বনাথ বলল, আমার গিন্নীটি কিন্তু এ ব্যাপারে খুব করিৎকর্মা মেয়ে। ছাদে টব সাজিয়ে একখানা মনোরম বাগিচা করে ফেলেছে। তুই দেখিসনি। তোর গিন্নী অবশ্যি দেখে এসেছেন। বলেননি তোকে ?

না। সুধাকর বলল। তারপর ফের হাসল একটুখানি।…হয়ত বলতে সাহস পায়নি। ওসবের জন্যে টাকাকড়ি দরকার তো। এই বাড়িটা করতেই সর্বস্বান্ত— তার ওপর আবার ফুলবাগিচা। ধুস্! ছাদে গেলেই দেখতে পাবি, কত কাজ বাকি আছে এখনও। বাইরে থেকে বাড়িটা কেমন বিচ্ছিরি কিম্ভূত লাগে না ? বিশ্বনাথ বলল, আমি দেখিনি। লক্ষ্য করিনি।

বাইরে মীনাক্ষীর ব্যস্ততা টের পাওয়া যাচ্ছিল। ছাদ থেকে ঝিকে ডেকে এনে বাইরে পাঠাচ্ছিল সে। মণিকা সম্ভবত ছাদে গিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত রন্টুর সঙ্গে জমিয়েছে সে। হঠাৎ সুধাকরের মনে হল, ইতিমধ্যে তার শান্ত নিরুপদ্রব বাড়িতে ভীষণ ব্যস্ততার সাড়া পড়ে গেছে। একটা উৎসবের প্রস্তুতি যেন সবে শেষ হয়ে গেল। এবার একটা হইচই লাগতে চলেছে। এসব ব্যাপার বরাবর সুধাকরের অপছন্দ। সে পারতপক্ষে ভীড় বা ঝামেলা এড়িয়ে থাকতে চায়। কিন্তু এখন তার খুব ভালই লাগল। তার মনে হল, বাড়িটা এতদিনে যেন যথেষ্ট কাজে লাগল। ধন্য হওয়ার স্মিত আনন্দ ও চাপা প্রগলভতায় থমথম করছে তার ঘরবাড়ি। আবহাওয়ার স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা ভাবটুকু ঘুচে একটা উষ্ণতার স্বাদ এসে গেছে আস্তে আস্তে। সুধাকর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আয়, ছাদে গিয়েই বসি। এখনও কিছু রোদ আছে হয়ত।

সে বারান্দা থেকে দুটো ছোট্ট প্ল্যাষ্টিকের চেয়ার দুহাতে নিয়ে উঠোনের খোলা সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেল। ধাপগুলোয় এখনও পলেস্তারা করা হয়নি। খুব সাবধানে তাকে অনুসরণ করছিল বিশ্বনাথ।

ছাদে উঠে ওরা দেখল, রন্টুর সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছে মণিকা। এতক্ষণ বুঝি ঝি মেয়েটির সঙ্গেই খেলা করছিল রন্টু। ওদের দেখে মণিকা বলল, রন্টু আমায় হারিয়ে দিতে পারছে না। রন্টুর বাবা…হঠাৎ জিভ কাটল সে।…দিদি আবার শুনে ফেললেন না তো।

সুধাকর বলল, শুনলেও ক্ষতি নেই। রন্টুর বাবাও হারবে।

বিশ্বনাথ বলল, তোমার সাহস তো কম নয় মণি। সুধাকর রীতিমত ব্যায়াম-বীর—তাছাড়া সবরকম স্পোর্টস ওর জানা আছে। তুমি ওকে অত হেনস্তা করো না।

ইস্! মণিকা ঠোঁট টিপে ভ্রূভঙ্গী করল।...আসুন না, দেখা যাক একহাত। খেলবেন? বিশ্বনাথ এগিয়ে গিয়ে র‍্যাকেট নিল রুন্টুর হাত থেকে। রুন্টু কাঁচুমাচু মুখে একপাশে দাঁড়াল। আপত্তির লক্ষণ তার ভঙ্গীতে প্রকট। কিন্তু বাবাকে সে যে বেশ ভয় করে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

বিশ্বনাথ বলল, আরে! ও বেচারার আনন্দে তোমরা বাধা দিচ্ছ কেন? ওকে খেলতে দাও। আমরা বরং গল্পগুজব করি এসো।

সুধাকর খুব ধীরে র‍্যাকেটনাড়া দিয়ে বলল, খেলাধুলো একসময় নাড়ির ব্যাপার ছিল। কাউকে খেলতে দেখলে এখনও রক্ত চনমন করে ওঠে। সত্যি, জীবন থেকে কত কী একে একে চলে যাচ্ছে! কই, রেডি?

কিছুক্ষণের মধ্যেই মণিকা ঘেমে উঠেছে। শেষ রোদে তার মুখটা জ্বলে গেছে একেবারে। কপালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। সাদা ককটাও জ্বলে উঠছে—উল্কার মত আনাগোনা তার। ছাদটা বেশ প্রশস্ত। আর সুধাকর ইচ্ছে করেই ধীর গতিতে র‍্যাকেট চালাচ্ছে, যেন মণিকাকে সুযোগ দিচ্ছে বারবার। মণিকা সে সুযোগ নিচ্ছিল। এগিয়ে পিছিয়ে বা ঝুঁকে র‍্যাকেট চালাতে গিয়ে তার আঁচলটা বুক থেকে সরে যাচ্ছিল। ফিকে সবুজ ব্লাউজের সবটুকুই চোখে পড়ছিল সুধাকরের। এমন কি কন্ঠার হাড়ের নীচেও একটা মোটা তিল আছে দেখছিল মণিকার। একসময় সে দেখল ককের দিকে নয়, তার মন আর দৃষ্টি যেন অন্যরকম র‍্যাকেট হাতে অন্যরকম খেলুড়ের মত মণিকার দিকেই ছুটোছুটি করছে। ঈষৎ সংকোচে আড়ষ্ট সুধাকর হঠাৎ ককটা মাটিতে পড়তে দিয়ে বলল, গেম হতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে—খেলার যা গতি।

মণিকা হাউমাউ করে উঠল—সেকি! খেলবেন না? না—না, তা হবে না। খুব আনাড়ি ভাবছেন বুঝি! নিন—রেডি?

পিছন থেকে মীনাক্ষী এসে বলল, রুন্টু, একবার নীচে আয়।

ওরা দুজনেই চমকে উঠেছিল। মীনাক্ষীর কণ্ঠস্বরটা কেমন ঝাঁজে ভরা। বিশ্বনাথ বলল, বৌদি কি আমাদের ফেলে নীচেই থাকবেন নাকি?

মীনাক্ষী একটু হাসল।...আসছি। বলে সে রুন্টুকে নিয়ে নেমে গেল।

সুধাকর চোখটিপে বলল, তোমাদের সৎকারের আয়োজন হচ্ছে। ব্যস্ত হয়ো না।

তিনজনে হেসে উঠল এক সঙ্গে। ছাদ থেকে রোদটুকু মিলিয়ে গেছে একেবারে। গাছপালার মাথায় কুয়াশার টুপি। ছায়া ঘন হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। ওদিকে রেল-লাইনের ওপর তীব্রবেগে একটা খালি এঞ্জিন ধকধক করে ছুটে গেল। অদূরে হাউসিং এস্টেটের মাঠে খেলুড়েরা খেলা শেষ করে ফিরে চলেছে। আলো জ্বলে উঠেছে এখানে ওখানে। গেম হবার মুখে ট্রে ভরতি চা আর খাবার এসে গেল। অগত্যা খেলা ভাঙতে হল ওদের।

সুধাকর বলল, এখানে চা খাবো? ঠাণ্ডা পড়তে সুরু করেছে। বরং নীচে যাওয়া যাক।

বিশ্বনাথ বলল, হ্যাঁ। তাই যাওয়া যাক।

মণিকা বলল, উঁহু। ফাঁকা আকাশের নীচে আরো কিছুক্ষণ কাটানো ভালো। উঃ, কতদিন এমন খোলামেলা জায়গা পাইনি।

সুধাকর বলল, কিন্তু ঠাণ্ডা যে! শীতের সন্ধ্যায় এমনভাবে···সে হঠাৎ থেমে গেল।

ঝি ট্রে এনেছিল—মীনাক্ষী নীচে। মণিকা ট্রেটা নীচেই রেখে চায়ের কাপগুলো একে একে ওদের এগিয়ে দিল। তারপর খাবারের প্লেটগুলো দেখিয়ে বলল, পরে হবে। এখন তোমার দিদিমণিকে ওগুলো তুলে রাখতে বলো।

ওরা কুয়াশা মেশানো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ও বসে চা খাচ্ছিল নিঃশব্দে।

একসময় সিগ্রেট ধরিয়ে বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়াল। আলিসায় ঝুঁকে চারপাশটা দেখতে দেখতে বলল, ভীষণ কুয়াসা জমছে আজ। মণি, তোমার গলা ধরে যাবে। কাল কোথায় ফাংশন আছে বলছিলে।

মণিকা ইতিমধ্যে গায়ে কার্ডিগান চড়িয়েছে। গলায় একটা বড় রুমালও জড়িয়েছে। চমকে উঠে বলল, আরে তাইতো!

সুধাকর বলল, ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিলেন। চলুন, আপনার গান শুনবো আজ।

তিনজনেরই এইসময় আরো মনে পড়ে গেছে, মীনাক্ষী একবারও ওদের কাছে আসেনি তখন থেকে। ছাদের ওপর অল্প আলো অল্প অন্ধকার। তিনজন তিন জায়গায় দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল। স্পষ্ট কেউ দেখছে না। আবছা মূর্তির মত তিনজন মানুষ পা টিপে টিপে নীচে নেমে এল। ওরা দেখল মীনাক্ষী রন্টুকে পড়াতে বসেছে পাশের ঘরে। ওদের সাড়া পেয়েও সে বেরিয়ে এল না। বারান্দায় চাপাস্বরে মণিকা বলল, কী ব্যাপার? ওঁকে দিয়েই প্রাইভেট টিউটরের কাজ করান নাকি?

সুধাকরের মুখটা ভিজে দেখাচ্ছিল। সে মাথা নাড়ল মাত্র।

বিশ্বনাথ বলল, মণি, আরও বসবে নাকি? বরং আরেকদিন আসা যাবে।

সুধাকর বলল, না-না। গান শুনব বলছিলুম না! চল, ওঘরে গিয়ে বসি।

মণিকা বলল, গান হবে এক শর্তে।

সুধাকর বলল, বলুন।

মণিকা পাশের ঘরের দিকে কটাক্ষ হেনে বলল, আমরা এ ঘরে গিয়ে বসে থাকব। ধরুন আধঘণ্টা। এর মধ্যে উনি যদি স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে আসেন, গান হবে। নয়তো না। একটা কথা—কেউ কিন্তু ওঁকে ডাকতে পারবেন না বলে দিচ্ছি।

বিশ্বনাথ সকৌতুকে বলল, অদ্ভুত সর্ত তো! যাও, কোন মানে হয় না।

ওঁর পড়ানোর ব্যাঘাত হবে। গানফান থাক।

মণিকা জেদী বালিকার মত ঘাড় নাড়ল।—সে আমি জানিনে। সবখানে গানের বাবদ একটা মূল্য পাই, এখানেও বিনিমূল্যে তো দিতে পারিনে!

সুধাকর হাসবার চেষ্টা করে বলল, আপনার সর্তটা কিন্তু সত্যি অদ্ভুত! তবে মূল্যটা বড় বেশি দাবী করা হচ্ছে না কি?

মণিকা বলল, মোটেও নয়।

সুধাকর বলল, অত শক্তিমান হয়ত আমি নই। তাছাড়া ও যদি সত্যি সত্যি আমাদের কাছে এর মধ্যে না আসে, তাহলে...

মাথা নাড়ল মণিকা।—তাহলে ওঁকে খারাপ ভাববো, এই তো? ...মোটেও না, বরং বলব, খুব দৃঢ়চেতা আর কর্তব্যপরায়ণ মেয়ে। ওঁকে পাওয়া আপনার সৌভাগ্য বলব।

সুধাকর মুখে বলল না কথাটা। মীনাক্ষীকে অপমান করার মত এ দুর্ঘটনা সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা তার পক্ষে একান্ত কর্তব্য তো বটেই। মীনাক্ষী তার স্ত্রী। এদের কাছে সে ছোট হয়ে যাচ্ছে—ভাবতেও খুব কষ্ট হয়। কিন্তু তার এ অভাবিত আচরণের কোন কারণও তো খুঁজে মেলে না। হঠাৎ সে এমন দূরে চলে গেল কেন?

গতিক দেখে বিশ্বনাথ বলল, মণি, ওসব সর্তফর্ত সত্যি খুব নোংরা ব্যাপার। বরং চল, আমরা ঘরে চুপচাপ গল্প করি। উনি ঠিকই এসে যাবেন।

ওরা ঘরে ঢুকল। একটা নীচু কফিটেবিল ঘিরে তিন দিকে তিন্ জন বসল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল ওরা। কেউ কোন কথা বলছিল না। আসলে, কথা বলতে ভাল লাগছিল না কারুর। বিশ্বনাথ সেই খবরের কাগজটা পড়ছিল। সুধাকর নিঃশব্দে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটটার ছেঁড়া অংশ মেরামতের চেষ্টা করছিল। আর মণিকা আড়চোখে তার কাজ লক্ষ্য করছিল। চোখে চোখ পড়তেই সুধাকর চোখ নামিয়ে ফের নিজের কাজে ব্যস্ত হচ্ছিল।

তবু মীনাক্ষী এল না। পাশের ঘরে রুণ্টুর উৎসাহী কণ্ঠের আবৃত্তি শোনা যাচ্ছে। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে তাহলে রুণ্টু। হয়ত অন্যদিনও এভাবে পড়ে বা মীনাক্ষী পড়ায় ছেলেকে—সুধাকর খেয়াল করে না। কিন্তু তাহলেও একটা বেলা পড়ানো বন্ধ রাখলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না! সামনে রুণ্টুর পরীক্ষা অবশ্য আছে। তার জন্যে এতখানি আদিখ্যেতা দেখানোর কোন মানে হয় না। তুষের আগুন মনে জ্বলছিল সুধাকরের। মীনাক্ষীর এই অদ্ভুত আচরণের ফলে তারা কতখানি অপমানিত হল—আন্দাজ করা মোটেও কঠিন নয়। বিশ্বনাথই বা কী ভাবছে!

মণিকা হঠাৎ গুনগুন করে উঠল। হয়ত নিঃসর্তেই গান গাইবে। কিন্তু এই অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় আর গান-ফানের ব্যাপার না আসাই ভালো। সুধাকর মুখ

তুলে বলল, সর্ত ভঙ্গ করছেন কিন্তু।

মণিকা জবাব না দিয়ে গুনগুন করে একটা গানের কলি স্পষ্ট করছিল।

সুধাকর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, থাক। ছেড়ে দিন। তার মুখটা বেশ কঠোর দেখাল।

বিশ্বনাথ কাগজ রেখে বলল, থাক। চল, আজ উঠি।

মণিকা অপরূপ হাসছিল। অথচ ঠোঁটে সেই গানের গুনগুনানি ফুরোয়নি। সে উঠে দাঁড়াল—তখনও সুরটা রইল। বেরিয়ে বারান্দা ধরে হাঁটছিল—দরজা খুলে বেরোল, তখনও সরে গেল না সে অস্ফুট অর্ধোচ্চারিত সুরের বাণী।

সদর দরজা বন্ধ কিন্তু পিছনে সেই সুরটা যেন একটা না ফোটা ফুলের কলির মত তাকে ছুঁয়ে আছে। বড় আরামে আর পরিতৃপ্তিতে সুধাকর আস্তে আস্তে হেঁটে মীনাক্ষীর ঘরের দরজায় গেল। তারপর বলল, ওরা চলে গেল।

মীনাক্ষী কান করল না।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বোকার হাসি হেসে সুধাকর বলল, রণ্টু, তোর র‍্যাকেটটা ছিঁড়ে ফেলেছি।

রণ্টুর চোখ বইয়ের দিকে। সে ভয়ে ভয়ে একবার তাকিয়েই ফের চোখ রাখল যথাস্থানে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সুধাকর ছাদে চলে গেল। ছাদে কুয়াসা ঘন হয়েছে। দূরে লাইটপোষ্টের বাতি থেকে আবছা আলো ছড়ানো পথে দুটো চলমান আবছা মূর্তি। কে জানে কেন, বিশ্বনাথকে আজ খুন করতে ইচ্ছে করছিল সুধাকরের। কাকে এনেছিল সঙ্গে। সব কেড়ে নিয়ে যেতে বসেছিল। মীনাক্ষী জোর প্রতিরোধ দিয়েছে। তা না হলে এত রক্তের বদলে গড়া ঘর বাড়িটা নির্মূল হয়ে যেত।

অনেকক্ষণ ধরে কুয়াসার মধ্যে একা ছাদে এক মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ছেঁড়া র‍্যাকেট নিয়ে অদৃশ্য সাদা কক লোফালুফি করেও সুধাকরের তবু সাধ মিটছিল না।

প্লেনটা মাটি ছোঁওয়ামাত্র যেন আমাকে ভুলে গিয়েছিল সহযাত্রিনী নন্দিনী মিত্তির। এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে পেঁাছেই আমাকে পাশ কাটিয়ে নিজের লোকজনের ভিড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বেরিয়ে গিয়ে প্রথমে বিস্ময়, পরে চাপা ক্ষোভে গরগর করতে করতে দেখছিলাম রঙীন প্রজাপতির মত ওদের গাড়িটা বাঁক ঘুরে গাছ-পালার আড়ালে মিলিয়ে গেল।

ক্লান্ত হতাশ, আর ক্ষুব্ধ আমি—একবার ভাবলাম, ত্বরিতে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিই—পরে ঠিক করলাম, হাঁটতে-হাঁটতে যাওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে এখন মঙ্গল হবে। নন্দিনী যে এমনি করে হঠাৎ কেটে পড়বে, ভাবতেও পারিনি। তার এ অভদ্রতার কোন তুলনা হয় না। অন্তত একবার মামুলি ভদ্রতার খাতিরে 'তাহলে চলি'ও বলতে পারত! বলল না তো!

যত রাগ গিয়ে পড়ল বৌদির ওপর। আসবার দিন সকালে জানিয়েছিল, গৌহাটি থেকে প্লেনে যাবার পথে এক আশ্চর্য সঙ্গিনী জুটিয়ে দিচ্ছে—আমার হয়ত ভালোই লাগবে তাতে। নন্দিনী মিত্রের মত ছটফট মেয়ের ক্ষেত্রে এই এসকর্ট দরকার হতে পারে। মুখ টিপে হেসেছিল বৌদি। সেই প্রথাসিদ্ধ হাসি—যার সরল অর্থঃ সাবধান, এগারো হাজার ভোল্ট! সেই হাসির জবাবে বলেছিলাম, প্লেনে সে-সুযোগ কম। নেহাৎ চোখে-চোখে বড়জোর দু-চারটে ঝিলিক! ওতে আমার মত ক্রনিক ব্যাচেলারের চামড়া বেঁধে না! একেবারে শক-প্রুফ হয়ে গেছি এখন।

শুনে বৌদি বলেছিল, রোসো। এক্ষুনি এসে পড়ছে। দেখলেই ভিরমি খাবে।

ভিরমি অবশ্য খাইনি। মনে মনে ভয় পেয়েছিলাম একটুখানি। ঘোড়ার লেজের মত চুলের ছাঁদ আর বিশেষ করে হাতাকাটা লাল ব্লাউস দেখলে আমার অবস্থা হয় দেবর্ষি নারদের মত—হাতে ভরা তেলের পাত্র আর মুখে ঈশ্বরের নাম। দুদিক সামলাতে বড় বিব্রত হওয়া। তার ওপর ওই পক্ষীকণ্ঠশোভন অনর্গল কণ্ঠ-কাকলী। বাড়ি থেকে গাড়ি করে এয়ারপোর্টে আসবার পথটুকুতেই কয়েকশো কথা কয়ে দিচ্ছিল নন্দিনী। সেসব কথায় শুধু ভূগোলের বৃত্তান্ত। পাহাড়, নদী, বন জঙ্গল, তারপর প্রত্নতত্ত্ব, পরিশেষে জলবায়ু-আবহাওয়ার খবর। আমি কী জানি, তার চেয়ে সে কী জানে, তাই নিয়েই আধঘণ্টা পথ কেটে গেল। মুখ খুলবার বিশেষ সুযোগই পেলাম না। তবে মনকে বলেছিলাম, ধৈর্য ধরো—পৃথিবীতে কতকিছু অসম্ভব সম্ভব হয়ে যাচ্ছে, তো এই সামান্য একটুখানি মন দেওয়ানেওয়ার ব্যাপার!

প্লেন ছাড়তে কিছু দেরী ছিল। এয়ার-অফিসের ক্যান্টিনে দুজনে দুটো সফ্‌ট্‌-ড্রিংক্‌ নিয়েছিলাম। দোমড়ানো স্ট্র সোজা করতে গিয়ে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠেছিল নন্দিনী। বলেছিলাম, হাসলেন যে ?

জবাবে ফের এক দমক হাসির আবর্ত। আমার মন থেকে আবর্জনা যতটা বাইরে গেল, বাইরের খড়কুটো এসে জমল তারও বেশি। দমে গিয়ে আর মুখ খুলিনি। আমার চেহারা বা পোষাক-আশাকে কি কিছু হাস্যকর ব্যাপার চোখে পড়েছে ওর। প্লেনে ওঠা অব্দি মনটা কুটকুট করছিল। তারপর প্লেন মাটিছাড়া হতেই গা শিরশির করে ওঠা, বেশ কিছুটা ঝাঁকুনি, কিছু দোলা—এসবের ফলে তখনকার মত নন্দিনীর দিকে কিছুক্ষণ আর মনোযোগ ছিল না। চূড়ান্ত উচ্চতায় প্লেন স্থির হয়ে চলতে থাকলে আড়চোখে দেখলাম, সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

এতে ধরে নিয়েছিলাম, তাহলে নন্দিনীর মন ছুঁতে পেরেছি সম্ভবত। এরপর সব যা-যা হওয়া উচিত, তাই নিয়ে মনে মনে ঘটনা সাজিয়ে ফেলছিলাম। দমদম পৌঁছনোর পর উভয়ের ডায়ালগ হওয়া উচিত নিম্নরূপ ঃ

নন্দিনী। কী চমৎকার না লাগছিল ! অনেকদিন মনে থাকবে।

আমি। আমারও।

নন্দিনী। কই আপনার ঠিকানাটা দিন তো !

আমি। বারে ! আপনারটা ?

না। সে হচ্ছে। আপনারটা আগে চাই। এই নিন কলম।

আ। উঁহু। আগে আপনারটা দিন।

না। উঃ কী সাংঘাতিক মানুষ রে বাবা ! নিন, লিখুন। কিসে লিখছেন ? আমার কিন্তু অটোগ্রাফ বই।

আ। ইস্‌, কত্ত সব প্রখ্যাত লোকের সই নিয়েছেন।

না। (কেড়ে নিয়ে) উঁহু…দেখতে মানা।

এরপর হঠাৎ নন্দিনীর মৃদু টান।…ওকি, ট্যাকসি করুন। পায়ে হেঁটে যাবো নাকি ? অত সোজা নয় মশাই, আগে আমায় পোঁছে দিয়ে তারপর আপনার ছুটি।

আ। চিরকালের ছুটি নয়তো ?

না। (ভ্রূভঙ্গী করে মুখ ফিরিয়ে) জানি নে যান !

না ঃ, এসব কিছুই ঘটল না। আমার দিকে আর চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। নিজেদের গাড়ি চেপে উধাও হয়ে গেল সে। কী নেমকহারাম মেয়ে !

দোটানার দুলতে দুলতে হাঁটছিলাম একা। নিজের অসম্ভব নির্বুদ্ধিতার প্রতি ধিক্কার দিচ্ছিলাম। কে একটা নন্দিনী মিত্তির—বৌদির মাসতুতো বোনের বন্ধু—তার এসকর্টের কোন দরকার ছিল না। একা প্লেনপথে অন্ধও বাড়ি ফিরতে পারে।

শুধু বৌদি ওই 'জুটিয়ে দেওয়া' ব্যাপারটা এনে আমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তার প্রথাসিদ্ধ হাসিটুকু এমন সর্বনাশ করে বসবে কে জানত!

অনেক ছোটোখাটো ব্যাপারে অনেক সময় মানুষের রাগ হয়। কিন্তু মন তো বহতা নদী—একসময় সবই ভেসে হারিয়ে যায় বিস্মৃতির সাগরে। আশ্চর্যের কথা, নন্দিনীর সেই চলে যাওয়ার ঘটনাটা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। সারা মন দিনের পর দিন বিস্বাদে ভরে উঠতে লাগল। দেখা পেলেই তার সেই অভদ্রতার উল্লেখ করে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে না দিলে এ জ্বালার শেষ হবে না।

কিন্তু ঠিকানা তো জানিনে! বৌদি হয়ত জানে। ঠিকানা চেয়ে পাঠালে সে আবার কত কী সব ভেবে বসবে হয়ত। তাই সে পথে গেলাম না।

কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে নন্দিনীকে আমি খুঁজছিলাম সবখানে। যদি হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যায়। হয়ে যেতেও তো পারে। এ শহর এক আজব শহর। কত অ-ধরাকে ধরিয়ে দেয়, আবার কত ধরার জিনিস অ-ধরা করে তোলে। ছেলেবেলার এক প্রিয় বন্ধু সনাতনকে চৌরঙ্গীর মোড়ে দূর থেকে দেখে যেতে-যেতে সে ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। আবার সবচেয়ে শত্রুকে যতই এড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করেছি, সবিস্ময়ে দেখেছি—একই বাসের একই হাতলে ধরে গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি তার।

একদিন রাসবিহারী এভেন্যুর কাছে পিছনফেরা একটি মেয়েকে দেখে তার সঙ্গে ঘুরপথে কালীঘাট অব্দি হেঁটে গিয়ে পরে আবিষ্কার করলাম, সে নন্দিনী নয়। এরকম ভুল প্রায়ই হচ্ছিল। বিশেষ করে ঘোড়ার লেজওয়ালা মাথা আর হাতাকাটা লাল ব্লাউস দেখলে মাথায় জেদ চেপে যাচ্ছিল! এমনি করে কতদিন নন্দিনী মিত্রকে খুঁজে ব্যর্থ হলাম! তাকে না-বলা কটু কথাগুলো কেবল আমাকেই বিস্বাদে ঝাঁঝে বিষিয়ে তুলতে লাগল। তবু যখনই ফাঁক পাই, তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল একরকম।

অবশেষে এক সন্ধ্যায় এতদিন পরে নন্দিনী মিত্রকে আবিষ্কার করলাম। গড়ের মাঠের একপ্রান্তে ঝোপের আড়ালে খুব ঘনিষ্ঠভাবে একটি যুবকের সঙ্গে বসে ছিল সে। একা থাকলে কী হত বলতে পারব না—সঙ্গে ওই নর্দমা-প্যান্ট থাকায় রাগে শরীর জ্বলে উঠল আমার। নির্জন ঝোপঝাড়ে সন্ধ্যেবেলা বেশ চলেছে তাহলে!

কিন্তু, নন্দিনীকে আর যাই ভাবি, এত সাধারণ মেয়ে বলে আদৌ ভাবতে পারিনি কোনদিন! ওই বাজে মস্তানপ্রকৃতির ছেলেটির সঙ্গে এইভাবে সে প্রেম করবে, কল্পনাও করিনি। যাই করুক সে—তার স্থান কিন্তু উঁচুতেই দিয়েছিলাম। ও ছিল আসলে আমার এক অ-ধরা। ওকে ধরবার খেলায় মনও কি চুপিচুপি জীবনের ভিন্ন এক স্বাদ টের পাচ্ছিল না! যখনই ওকে ভেবেছি—দেখেছি, চিরকালের সেই প্রেমিকাদের একজন। অজস্র ভালোবাসার আলো মিলে গড়েছে এক জ্যোতির্বলয়। ওকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তার ছটায় ও আকাশের পরীদের মত সুন্দর আর পবিত্র!

হয়ত কড়া কথা শোনাতে গিয়ে বলে বসতাম, দুষ্টু মেয়ে, সেদিন অমন করে পালিয়ে গেলে কেন বলতো? আমায় কষ্ট দিয়ে কী সুখ পেয়েছ তুমি। নয়ত শুধু মুখ টিপে হেসে বলতাম, মিস মিত্র, মনে পড়ে না?···যদি জবাব পেতাম: বলুন তো কী, বলতাম—কেন, সেই কয়েকটি ঘণ্টার আকাশযাত্রা, যখন ইচ্ছে করছিল যদি উধাও হয়ে যাই অনন্ত শূন্যের মাঝে কোন নীল কবোষ্ণ নক্ষত্রের দিকে, আর (প্লেনের পাইলট বাদে) আর সব যাত্রী হঠাৎ কর্পূরের মত উবে গেছে আমার ভালবাসার যাদুমন্ত্রের বিপুল চাপে, মাত্র আমরা দুজন যাত্রী।···মিস মিত্র কি ভয় পেয়েছিলেন? পাননি। আশ্বস্ত হলাম তাহলে। দেখুন, ব্যাপারটা সামান্য, হয়ত, তুচ্ছ—তবু ওই ইচ্ছেটা যেহেতু আকাশের ওপর জেগে উঠেছিল, ওর মহত্ত্ব আপনি অস্বীকার করতে পারেন না! মাটিতে পা দিলে অবশ্য সবই উদ্ভট বা বাজে লাগে। লাগবার কথা। কারণ, মাটি খুব নোংরা জিনিস দিয়ে তৈরী।

নন্দিনী ছিল আমার কাছে ভালবাসার এক বিশুদ্ধ প্রতীক। আর, সে এখন এক মস্তানের নর্মাপ্যার্টে শরীর এলিয়ে তার কুৎসিত মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাতা-ডালপালার ফাঁক দিয়ে যে আলোর কুচি ওর মুখে পড়েছে, তাতেই চিনতে পারলাম। সেই মুখ, সেই সরু নাক, চাপা চোখের টানা ভুরু, সুন্দর চিবুক। পাকা শশার মত মুক্ত বাহু পাপ-পুণ্যের মাঝামাঝি লোভনীয় সাঁকোর মত আলো-অন্ধকারে দুলছে। দেখতে দেখতে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। ঘৃণায় ক্ষোভে রাগে অস্থির হয়ে দ্রুত কাছে গেলাম। প্রথমে ছেলেটিকেই বলে বসলাম, কী দাদা, খুব যে···

ছেলেটি লাফ দিয়ে উঠল। পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতের মুঠো পাকিয়ে। চোয়ালে প্রচণ্ড ঘা খেয়ে ছিটকে পড়লাম। মেয়েটি চিৎকার করছিল, পুলিশ, পুলিশ! তারপর আর উঠে দাঁড়ানোর ফুরসৎ পাওয়া গেল না। কোত্থেকে কারা সব দুদ্দাড় দৌড়ে আসছিল। এসেই ভীষণভাবে মারতে থাকল আমাকে। একসময় আর কিছু টেরই পেলাম না।

হাসপাতাল থেকে মেজদা ছাড়িয়ে এনেছিলেন। তাঁর তদ্বিরে আর পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি। বেশ কিছুদিন বাড়ি বসে থেকে শরীরটা সারিয়ে নিচ্ছিলাম। পৃথিবীকে বিস্বাদে ভরিয়ে দিল নন্দিনী এমনি করে। কেবল মানুষের নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। প্রতিটি মানুষকে খুন করতে ইচ্ছে করছিল। পেন্সিল-কাটা ছুরিটা দিয়ে জানালার চৌকাঠ পেঁচিয়ে কেটে মানুষের গলাকাটার শোধ তুলি। শূন্যে ঘুরিয়ে তাক করে ছুঁড়ে মারি নন্দিনী মিত্রের দিকে—ছুঁড়েই চমকে উঠে দৌড়ে যাই। কুড়িয়ে নিয়ে মনে মনে বলি, কিছু মনে করো না। এ আমার শূন্যের খেলা।

পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো! এবং এই ভয়ে অবশেষে বাড়ি থেকে বেরোতেই হল।

গড়িয়াহাটের মোড়ে হঠাৎ ফের দেখা পেয়ে গেলাম নন্দিনীর। আমি কাছে যাবার আগেই সে একটা দোতলা বাসে চেপে বসল। দৌড়ে চলন্ত বাসটার দিকে এগিয়ে হাতল খুঁজতে গিয়ে পড়ে গেলাম নীচে। জোর বাঁচা বলতে হয়। কিন্তু উঠে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বাঁ পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। কারা ধরাধরি করে নিয়ে গেল পাশের ডিসপেন্সারীতে। টিপে দেখে ডাক্তার বললেন, কমপাউন্ড ফ্র্যাকচার!

ব্যস! ফের হাসপাতাল। ফের আরও কয়েকটা মাস। বেরিয়ে দেখি, আগের মত আর স্বাভাবিকভাবে হাঁটা যাবে না। একটু খোঁড়াতেই হবে।

নন্দিনী আমার সর্বনাশ করে গেছে টের পেতে এতদিন লেগে গেল। ক্রমশ সে আমাকে আরো জঘন্যভাবে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে আর নিজে বেশ দূরে বোতাম টিপে চলছে। সার্কাসের খেলোয়াড় হতে চেয়েছিল যে, সে হয়ে গেল নিতান্ত লোকহাসানে ভাঁড় মাত্র। নন্দিনীর শূন্যের খেলাটাই জমেছে—আমি হেরেছি। ক্রমশ সে আমাকে পাতালের দিকে নিয়ে চলেছে—সেখানে সম্ভবত নরকের স্থান। আমাকে দিয়ে আরও কত জঘন্য কাজ সে করাবে হয়তো।

এর মধ্যে একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সুব্রতর সঙ্গে। সুব্রত আমার বাল্যবন্ধু। থাকে নৈহাটিতে। একথা-ওকথার পর সে জানাল, সম্প্রতি বিয়ে করেছে। আমার ঠিকানা জানা না থাকায় আমাকে জানাতে পারেনি।

সুব্রত বলল, সামনে রোববার আয় আমার ওখানে। বৌ দেখে আসবি।

শুধু বললাম, দেখি।

সুব্রত চমকে উঠে বলল, আরে, আরে! তুই খোঁড়াচ্ছিস যে! কী ব্যাপার?

বাস থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।

গ্রহের ফের। কোন ভালো জ্যোতিষীর কাছে যা। তোর চেহারাটাও খুব খারাপ দেখাচ্ছে।...হ্যাঁ রে, প্রেমে-ট্রেমে পড়িসনি তো?

সুব্রত হেসে উঠল। কিন্তু এবার আমার চমকানোর পালা। আমার চেহারায় কি প্রেমে পড়ার কোন চিহ্ন ফুটে উঠেছে চর্মরোগের মত? দাড়ি অবশ্য একদিন অন্তর কাটি। আজ ছিল কাটবার দিন। বেশ পরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড় গায়ে চড়িয়েছি। তবু ও কী দেখল আমার মধ্যে? সুব্রতকে বরাবর বুদ্ধিমান আর হিসেবী বলে জানি। আমি বললাম, কী বলিস! এ-ভূতের মত কুচ্ছিত চেহারা নিয়ে প্রেম করার আশা কোথায়?

সুব্রত ধমকাল।...থাম্, থাম্। ওটা ব্যাজস্তুতি। ওরকম কন্দর্পকান্তি থাকলে আমি...যাক্‌গে। তাহলে সামনে রোববার যাচ্ছিস। কেমন? কখন যাবি? সকালে, না বিকেলে?

বিকেলেই যাবো।

মনের মেজাজ বোঝা কঠিন। রোববারের বিকেলে নৈহাটির মত জায়গায় গিয়ে সুব্রতর মত গেরস্থ সাধারণ চরিত্রের ছেলের বৌ দেখবার তাগিদ আদৌ ছিল না।

কিন্তু কিসে কী হয়ে যায়। সুব্রত আমার চেহারার প্রশংসা করেছিল—কথাটা অনেকদিন ভোলা গেল না। আমি জানি, আমি কন্দর্পকান্তি নই; তবু এই মানসিক অবস্থায় সুব্রতর ওই ছোট্ট কথাটুকু সুড়সুড়ি দিচ্ছিল সম্ভবত। কথামত ওর ওখানে গেলাম রোববার বিকেলে।

গঙ্গার ধারে বেশ চমৎকার জায়গায় বাড়ি করেছে সুব্রত। বরাবর ওকে অধ্যবসায়ী ছেলে বলে জানতাম। পৈতৃক ছোট্ট একটা ব্যবসা ছিল। সেটাকে কামধেনুতে রূপান্তরিত করেছে প্রচুর সাধনায়। ওর উদ্যমের প্রতি ঈর্ষাবোধ হচ্ছিল। দিনরাত্তির এত সব স্থূল কার্যকর্মের বোঝা যাকে বইতে হয়, তার অবশ্য আমার মত উটকো মনোবেদনার ব্যাধি না থাকাই সম্ভব। নিষ্কর্মাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা এক ঝক্কিকার।

ওর বাইরের ঘরে যখন অপেক্ষা করছি, তখন পর্দার ওদিকে একটা চাপা কল-গুঞ্জন, তারপর মৃদু ধস্তাধস্তি, শেষে ধমকের ফিসফিস শোনা গেল। কাকে যেন টানাটানি করছে সুব্রত, সে ভারী অবাধ্য। ব্যাপার কী?

একটু পরেই সুব্রত এল পর্দা তুলে। ওর মুখটা কেমন থমথমে আর লাল—অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল, বোস্, বোস্। তোর খারাপ লাগছে না তো?

বললাম, না, না। খারাপ লাগবে কেন?

সুব্রত মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসল। তারপর তার ঘরবাড়ি ব্যবসা-পত্তরের কথা বলতে লাগল। ইতিহাস বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে সে আড়চোখে একবার করে অন্দরমহলের পর্দাঢাকা দরজার দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকাচ্ছিল।

দুম করে বলে ফেললাম, তোর বৌ কোথায়? আলাপ করিয়ে দিলিনে যে!

সুব্রত নীরস মুখে বলল, আসছে এক্ষুনি। মেয়েদের তো জানিস, অতিথি এলে যা সব করেটরে।...

আমি উঠে দাঁড়ালাম।...চল্, ভিতরে গিয়েই আলাপ করে আসি। আপত্তি নেই তো?

সুব্রত হঠাৎ উৎসাহী হয়ে উঠল।...সেই ভালো। যা মুখচোরা মেয়ে, লজ্জায় একাকার। মাইরি, এসব ব্যাপারে ও একটু...যাকে বলে, ভীষণ ইয়ে...

আরও কী বলছিল সুব্রত। ওদিকে ভিতরে ঢুকেই আমি কাঠ। নন্দিনী, হ্যাঁ, নন্দিনীই তো, পলকে লাল বেনারসীর ঘোমটা ছ'ইঞ্চি ঝুলিয়ে পাশ ফিরে দাঁড়িয়েছে। একটা নীচু টেবিলে চায়ের কাপ খাবারের প্লেট রয়েছে। সম্ভবত কাপে চা ঢালছিল—একটা কাপের পুরোটা ভরতিও হয়নি—আমাকে দেখামাত্র চমকে উঠে হাত তুলে নিয়েছে। পিছন ফিরেছে।

সুব্রতর মত সাধারণ গেরস্থ ছেলের সঙ্গে নন্দিনীর বিয়ে হয়েছে! আপাতদৃষ্টে এটা যত বিষম দৃশ্যই বোধ হোক, এর কারণ আমি অনেকখানিই জানি। চরিত্রভ্রষ্টা মেয়েকে বাধ্য হয়ে এমনি সাদাসিধে জায়গায় গছাতে হয়েছে—নৈলে হালে পানি

পেত না ওর বাবা। তাছাড়া আর কোন অর্থ হয় না এ বিয়ের।

সুব্রত ততক্ষণে ওকে টানাটানি করে আমার সামনে দাঁড় করানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। মুখটা একটুখানি দেখলাম ফের। নন্দিনীই তো! তবু নামটা যতক্ষণ না জানছি, আশ্বস্ত হওয়া কঠিন। এর ফাঁকে বললাম, দেখুন, ওসব লজ্জাটজ্জা করার কোন মানে হয় না—আমাকে তো ভালই চেনেন···

সুব্রত বলল, বলিস কী রে! তুই ওকে চিনিস!

বললাম, চিনি মানে—একদিন পথে আসতে-আসতে আলাপ।

তাই বল্‌। সুব্রত ফ্যাচ করে হাসল।···তাহলে তো নন্দা, তুমি খুব অপমান করছ ওকে।

আমি বললাম, ওকে অবিশ্যি নন্দিনী বলেই জানতাম।

সুব্রত অবাক হয়ে বৌর উদ্দেশ্যে বলল, হ্যাঁ গো, তোমার আবার নন্দিনী নাম ছিল নাকি? বেশ মজার ব্যাপার তো!

নন্দিনীর মৃদু আওয়াজ শুনলাম। সেটা হ্যাঁ বা না, কিংবা অন্য কিছু, তা বোঝা গেল না। মনে হল, বেচারা ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। কাঁপছে হয়ত। খুব প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে ভেবে আমার যা আনন্দ হচ্ছিল বলার নয়। এবার যথেষ্ট হয়েছে। ওকে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দেওয়া ভালো। আমরা বেরিয়ে বসবার ঘরে এলাম। নন্দিনীর ঘোমটা পূর্ববৎ রয়েছে—কোনরকমে এ ঘরে ভরা ট্রেটা পৌঁছে দিয়েই কেটে পড়ল। গড়ের মাঠের সেই সাংঘাতিক কাণ্ড নিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেল করব ভেবে হয়ত খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে কিন্তু হঠাৎ আমার মনটা বিস্বাদে ভরে উঠল। নন্দিনী তাহলে ফাঁকি দিয়ে হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল! আর কিছু বলা যাবে না—শোনানো যাবে না কোন কড়া কথা। সেজন্যেও হয়ত নয়—আমি টের পাচ্ছিলাম, এতদিন পরে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আমি নন্দিনীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম এটাই আসল কথা।

নিজের প্রতি রাগে ক্ষোভে অস্থির হয়ে একটা অছিলা দেখিয়ে কেটে পড়লাম তক্ষুনি। সুব্রত নিরাশ হয়ে বলল, খুব জরুরী কাজ যখন বলছিস, তখন আর আটকাবো না। ফের একদিন আয়। আসবি তো?

আমি বললাম, আসবো।

ফেরার পর যতবার মনে পড়ছিল যে নন্দিনী আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে চিরকালের মত—তত আমি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। এবং সেইসব যাবতীয় উদ্ভট আচরণের মূলে ছিল নন্দিনীর প্রতি আমার অন্ধ প্রেম—এই সত্যটুকু বিষের মত পুরনো ক্ষতে সংক্রামিত হয়ে আমার জ্বালা বাড়িয়ে দিচ্ছিল। না, নন্দিনীকে আমি জীবনে সুখী হতে দেব না!

ঝোঁকের বশে সুব্রতকে একটা চিঠি লিখে বসলাম। চিঠিতে নন্দিনীর গড়ের মাঠের সেই গোপন প্রেমচর্চার কাহিনীটুকু সবিস্তারে জানিয়ে দিলাম। সুব্রত এতে ক্ষেপে যাবে নিশ্চয়। কী ভাবে নেবে—সেটা অবশ্য অনুমান করা কঠিন আপাতত। কিন্তু নন্দিনীকে বলবে এবং নন্দিনী মনে মনে শিউরে উঠবে। আমাকে মনে পড়বে। গোহাটি থেকে প্লেনে আসবার কথা—তারপর হঠাৎ কোন কথা না বলে চলে যাওয়ার ঘটনা—সবই ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবে।

চিঠি পেয়েই সুব্রত হাঁফাতে হাঁফাতে হাজির।…আরে, তুই কীসব মাথামুণ্ডু লিখেছিস!

দৃশ্যটা উপভোগ করছিলাম। কোন জবাব দিলাম না।

সুব্রত বলল, গড়ের মাঠে ওর বেড়ানোর চান্স কিছুতেই থাকতে পারে না। ও তো গ্রামের মেয়ে।

চমকে উঠে বললাম, গ্রামের মেয়ে মানে?

সুব্রত বলল, হ্যাঁ। কুতুবপুরের মেয়ে। তিনকুলে কেউ নেই। মামার বাড়ি মানুষ হয়েছে। তোকে বলতে লজ্জা নেই—সামান্য লেখাপড়া জানে মাত্র। তবে বুঝতেই তো পারছিস, ওর স্বাস্থ্য-টাস্থ্য বা চেহারা বেশ ইয়ে—তাই পছন্দ হয়ে গেল।

রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম।…ব্লাফ দিস্ নে সুব্রত। ওর মুখের প্রত্যেকটি রেখা আমার চেনা। কোনমতে ভুল হতে পারে না। গোহাটি থেকে প্লেনে ওকে সঙ্গে করে দমদম আসছিলাম—তারপর…

সুব্রত হাসতে হাসতে ফেটে পড়ল।…মাথায় জল ঢাল্ খানিক। প্লেনে আসছিল নন্দা—হি…হিহিহি…তারপর হাসি থামিয়ে বলল, তোর চোখের ভুল। আসলে সেই মেয়েটিকেই তোর একটুও মনে নেই।

মনে নেই? আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেল। নিঃসাড় হ… কিছুক্ষণ ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। সুব্রত একটা গোপন চাবি—যা এযাবৎকাল আমার হাত এড়িয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ টিপে দিয়েছে! আরে তাই তো! তাই তো! কয়েক ঘণ্টার দেখা মুখ—আমার কি সত্যি সত্যি মনে থাকা সম্ভব? নন্দিনীর মুখ বলে যে সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানি আমি এতদিন যত্ন করে ধরে রেখেছি, তা আমারই বানানো নয়ত? দাদার বিয়ে হয়েছে আজ চার বছরেরও বেশি, থাকে গোহাটিতে—সেই বৌদির মুখও তো স্পষ্ট মনে পড়ে না! মাঝে মাঝে মনে করতে চেষ্টা করি—মনে পড়ে আবার পড়েও না! মাঝে মাঝে যাদের সঙ্গে দেখা হয়—তাদের মুখও স্পষ্ট মনে থাকে না অনেক সময়। শুধু দেখা হলেই যা চেনা যায় এইমাত্র। নন্দিনীকে আমি কতক্ষণই বা দেখেছি!

আর ভুল মুখের বা ভুল চেহারার পিছনে ধাওয়া করা হাস্যকর। কিন্তু পুরনো

ব্যথাটা থেকেই গেল। একবার মাত্র দেখা হলেই যেন সব নিরাময় হয়ে যাবে।

এর কিছুদিন পরে দাদাবৌদি এসে গেল। নির্জন বাড়ি আনন্দে ভরে উঠল। একথা ওকথার পর এক ফাঁকে বৌদিকে বলে বসলাম, আচ্ছা বৌদি, সেই মেয়েটির খবর কী?

বৌদি বলল, কোন্ মেয়েটি? তুমি এখনও মেয়েদের খবর রাখতে ভোলনি দেখছি। ভেবেছিলাম, ক্রনিক ব্যাচেলারদের নারীপুরুষ ভেদজ্ঞান থাকে না। তোমার আবার কী হল?

বললাম, ঠাট্টা নয়। তোমার সেই অদ্ভুত মেয়েটির খবর জানতে চাচ্ছি। বেশ ভালো সঙ্গিনী জুটিয়ে দিয়েছিলে! বাপ্স্!

বৌদি হাসল।···নন্দিনীর কথা বলছ? কেন, কী করেছিল ও?

কিছু না। যা বকবক করছিল সারা পথ!

ও একটু খামখেয়ালী মেয়ে। বৌদি চোখ টিপে ফের বলল—তারপর বুঝি আর পাত্তা দেয়নি?

বাজে বকো না।

বুঝেছি। ওর কাছে পাত্তা পাওয়া কঠিন। চেষ্টা করেছিলে নাকি?

দায় পড়েছে! এবার আমি ফেটে পড়লাম।···ওরকম অভদ্র মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি কিন্তু। দমদমে নেমেই কোন কথা না বলে নিজেদের গাড়িতে কেটে পড়ল! মামুলী ভদ্রতারও বালাই নেই।···

সব শুনে বৌদি একটু চুপ করে থেকে বলল, তাই নাকি! এতসব কাণ্ড হয়ে গেছে! কিচ্ছু জানাওনি তো! আমরা শুনেছিলাম, বাস থেকে পড়ে এ্যাকসিডেণ্ট করেছ। কী আপদ!

বৌদি কেমন দমে গিয়েছিল যেন। বললাম, ওর ঠিকানাটা আমার ভারী দরকার।

ঠিকানাও দেয়নি বুঝি?

না।

ঠিকানা আমার কাছে আছে। কিন্তু যে এমন অভদ্র, তার ঠিকানা নিয়ে কী করবে? গাল দিয়ে আসবে নাকি?

ঠিক তাই।

বৌদি হাসতে হাসতে বাকসো খুঁজে একটা গানের খাতা আনল। তার কোন কোনায় একটা ঠিকানা লেখা রয়েছে। টুকে নিলাম তক্ষুনি। বৌদি বলল, সেই ভালো। ঝগড়া করে এসো। কিন্তু দেখো, ফের মাথা খারাপ না হয়ে যায়! একখানা পা গেছে, ফের আর একখানা না খুইয়ে বসো আবার।

মার্চের সুন্দর সকালে হাল্কা মনে, এতদিন পরে, সত্যিকার নন্দিনীর কাছে পৌঁছতে যাচ্ছিলাম। কিছুদূরে এসে হঠাৎ মনে হল, কে যেন পিছন থেকে পা

দুটোকে টেনে ধরছে ক্রমশ। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে আর পা তুলতে পারলাম না সামনের দিকে। কী দরকার! কেন ক্ষোভ, কেন কটুকথা বলার এত সাধ! ক্ষণিকের এক সঙ্গিনী মেয়ে—আমাকে কী ভেবেছিল, সম্মান না অপমান করেছিল, তা নিয়ে মাথাব্যথার কোন অর্থ হয় না। তার ওই অভদ্রতাটুকুর মূল্যে এদিকে আমি এতগুলো দিন কত কীসব বিচিত্র জিনিস কিনে বসে আছি—সে তো কম নয়!

শুধু একটা তীব্র কৌতূহল শেষঅব্দি থেকে যায়। সত্যিকার নন্দিনীর চেহারাটা কেমন ছিল? পা তোলার চেষ্টা করলাম। নাঃ, থাক্। যা স্বপ্নে আছে, মায়ায় আছে, তা স্বপ্নে বা মায়ায় থাক্—বাস্তবের রক্তমাংসে তা মিলিয়ে নিতে গিয়ে আবার কী ক্ষতি করে বসব কি না কে জানে। ক্ষণিকের দেখা একখানি মুখ অজস্র মুখের পিছনে আমাকে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে, অস্থির করেছে,—তা খুঁজে পাওয়া গেলেই তো সব খেলার শেষ। অ-ধরাকে ধরতে পারলেই যা ছিল, সব হারিয়ে কাঙাল হওয়া। নন্দিনীর ঠিকানাটা ছিঁড়ে ফেললাম। ফিরে এলাম আস্তে আস্তে। সারাজীবন ধরে ভিড়ের মাঝে কোন মেয়ের মুখ দেখে নন্দিনী বলে চমকে ওঠার [illegible] আমি বারবার পেতে চাই।

এতক্ষণ আমার হাতটা শক্ত করে ধরে ছিল। সামনে গাছপালার মাথায় ক্ষয়ের চাঁদ। অন্ধকার মাঠের ওপর ফোঁটা ফোঁটা জ্যোৎস্না—ঘুমের মধ্যে ঘামের কণা জমে ওঠার মত। আর কদাচিৎ পাশফেরার মত মনে হয় মাঠটাকে, যখন হাওয়া আসে হঠাৎ কেঁপে। এতক্ষণ ধরে-থাকা ভীরু হাত তারপর সরেছে পাশ থেকে।
—কী হ'ল! আমি বললাম। আমার গলায় থুথু শুকিয়ে খড়িখড়ি। জিভ আঠা আঠা লাগে। যদিও এখন ভয় অনেক কম, বীরপুরুষ হবার দেরী আছে জেনে শুধু বললাম—কী হ'ল?

ঝুনঝুন হঠাৎ দাঁড়াল। পিছন ফিরে প্রসারিত মাঠের অনেক দূরে আবছায়ায় ডুবে থাকা নদীটাকে বুঝি দেখবার চেষ্টা করছিল সে। তারপর বলল—এতক্ষণ সব জানাজানি হয়ে গেছে। তাই না!

উচিত নয়, তবু সিগ্রেট জ্বাললাম। বললাম—হয়তো হয়েছে। কিন্তু তার আগে আমরা হাতছাড়া।

অস্ফুট জ্যোৎস্নায় খুশী খুশী দেখাচ্ছে ঝুনঝুনকে। তবু আমার চোখে মমতা ঘন হয়—যেন পাশে দাঁড়ান মেয়েটি সুখের ঘরে পৌঁছবার আগেই মিইয়ে যাবে। শিথিল স্খলিত পাপড়ি দিয়ে সুখের ঘর সাজানর ভাবনা আমাকে বিষণ্ণ করছিল। আমি বলতে চাচ্ছিলাম—সতেজ হব। এমনি প্রসন্ন থেক। তোমার সঠিক মূল্য দিতে পৃথিবী এবার রাজী হয়েছে।

তবু ভয় সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে আবছায়ায় কাঁপছে। অলৌকিক যেন ডানা মেলে দিয়েছে ফাঁকা মাঠে। অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটে যেতে পারে মনে হয়। মনে হয়, আঠার বছরের একটি মেয়েকে বৌটাছাড়া করে আনার অপরাধ স্থাবরজঙ্গম ক্ষমা করতে রাজী নয়। হয়ত এখনি চারপাশে সারসার মশাল জ্বলে উঠতে দেরী হবে না। নরকের দরজা খুলে গেলে অজস্র বিভীষিকা বেরিয়ে পড়বে ঝড়ের বেগে। এবং এই রকম গুরুতর গুপ্ত ত্রাস আমাকে আর ঝুনঝুনের প্রতি আসক্ত হতে দিচ্ছে না।

অথচ আমি অন্য কথা ভেবেছিলাম। ইচ্ছে ছিল এমনি নির্জন রাতের মাঠ পেয়ে গেলে ওকে আমি অদ্ভুত ভালবাসা দেখাতে পারব। সারা ছেলেবেলা এবং যৌবন যত রকম ইচ্ছে ওর জন্যে মনে পোষা ছিল, সকলই মিটিয়ে নেব এই অবকাশে। আমি ওকে শিশুর মত আদর করব। মাথায় তুলব। আছাড় দেবার স্থলে ছুঁড়তে গিয়ে আরও শক্ত করে ধরব। আর যা খুশী করতে পারার অবাধ অধিকারের সীমানায় সেই হবে আমার যৌবনের সত্যিকার দিগ্বিজয়। অথচ এখন

আমার মনে দারুণ পাপবোধ। ওর ক্লান্ত অথচ সাহসী, ঋজু অথচ কমণীয় দেহ বিষণ্ণ জ্যোৎস্নার রঙ্ মেখে খুবই অলৌকিক মনে হয়। যেন সংসারের মেলা থেকে চুরি করে আনা একটি সুন্দর খেলনা—প্রতিমুহূর্তে যা এক দুরন্ত শিশুর হাতে চূর্ণ হবার সম্ভাবনা আছে।

এটা পথ নয়, শস্যহীন নির্জন মাঠ। পথ পেতে কিছু দেরী আছে। সে পথের নাম ন্যাশনাল হাইওয়ে। মধ্যরাতে যানবাহন পাওয়া যাবে না। তাই আরো তিন মাইল হাঁটতে হবে আমাদের। তারপর রেল স্টেশন পেয়ে যাবো। তারপর ? ···সামনের যা কিছু, সবই এখন অসম্ভবের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। আমরা জানি না, কী বা কে অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে। তবু যেতে হচ্ছে। আমাদের ভালবাসা, আমাদের বলেছে—বিশ্বাস রেখ, তাতেই আছে অনন্ত সুখ।

অথচ সেই ভালবাসা আমাদের মূলছাড়া করেছে। যে ভালবাসার বেগবতী নদীর পাড়ে আমরা ছিলাম দু'টি অবহেলিত গাছ, উন্মূল হয়ে ভেসে গেলাম অজানা সমুদ্রের দিকে। এখন পথের মাঝে চারপাশ থেকে প্রশ্ন ওঠে—তারপর, তারপর কী ?

একদিন ঝুনঝুনকে বলেছিলাম নির্জনে ইচ্ছে করে, তোমাকে নিয়ে অনেক দূরে চলে যাই। ঝুনঝুন বলেছিল—ইস্, কী বাহাদুর।···ওর এই বলায় আমার মাথার ভিতর বাতি জ্বলেছিল। জ্বালা ছিল, তবু আলো জ্বলেছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস না থাকলে জীবনে বাঁচবার মত ·রম মূল্য মেলে না। কিন্তু ঝুনঝুনের মন্তব্য শুনে তখনকার মত দমেই গিয়েছিলাম যেন। মনে হয়েছিল—তারপর, তারপর কী হবে ? বাতিজ্বলা জ্বালা ও আলোয় দেখেছিলাম—সাদা দেয়ালে কোথাও কিছু লেখা নেই।

আমার ভাবনাভাঙা স্বরে ঝুনঝুন এতক্ষণে কথা বলল ·ফর কী হল, দাঁড়ালে যে ?

আমি বললাম—ঝুনঝুন ?

—বলো।

—তোমার ভয় করছে না তো ?

ঝুনঝুন এমন ভাবে হাসছে, ম্লান জ্যোৎস্নায় ওর সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে—যেন সকল ভয় ভালবাসার বদলে বিক্রী করে ফেলেছে। তারপর ঝুনঝুন নিরুক্তির স্নিগ্ধতা নিয়ে আমার বুক-ঘেঁষে এসেছে। মুখ তুলেছে। ওর নিঃশ্বাসের গন্ধ পাচ্ছিলাম। যেন পবিত্র স্বাক্ষর প্রার্থনার মত একটি চুম্বনের স্বাদ পেতে ওর তীব্র আকাঙ্খা।

ওকে সরিয়ে দেবার ছলে বললাম—আর ভয়ের কারণ নেই, এবার আস্তে আস্তে হাঁটি।

চলতে চলতে অনেক কথা আমার মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল সারা ছেলে-

বেলার কথা। যখন প্রতিবেশিনী এই বালিকার সঙ্গে মাদারসাহের মাজারে কাঠমল্লিকা ফুল কুড়িয়েছি। পুরনো পলেস্তারাচটা চত্বরে সবুজ শ্যাওলায় সতর্ক পা ফেলে হেঁটেছি আর ইতস্ততঃ স্তূপীকৃত ইটের টুকরো সংগ্রহ করে খেলাঘর গড়েছি। করিম খোনকারের দুরন্ত মেয়ে ঝুনঝুন চুলে কাঠমল্লিকার ফুল গুঁজে বলেছে—এই রফি, বাদশাবেগম খেলবি? খেলাটা আমি খুব স্পষ্ট জানতাম না। তবু ওই কথা শুনে হঠাৎ মনে হয়েছে পীরের মাজারে অজস্র ফুল ফুটে ঝরে-ঝরে পড়ছে। চারপাশে গাছ-লতাপাতার ছায়ায় চুপিচুপি বাতাসের শিহরণ, অনেক পাখি ডাকে, অনেক আলোর পৃথিবী বাহিরে অপেক্ষা করে। মাজারের ধূসর গম্বুজে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত আলোর ছটা—বড় পবিত্রতার দীপশিখা যেন। অনেকক্ষণ খেলা করেছি আমরা! তারপর ফিরে এসেছি হাতধরাধরি, জয়ের মুকুট-পরা দু'টি উঁচু উঁচু মাথা, সগর্ব পদক্ষেপ!—ও রফি, কাল এসে সওদাগরের খেলা করব।

—সে কী রে ঝুনঝুন?

—সে খুব সুন্দর খেলা! ঝুনঝুন চোখ বুজে মাথা দুলিয়েছে।—আমার খু-উব ভাল লাগে। ধর্, তুই যাবি দরিয়া পেরিয়ে বাণিজ্য করতে। বলবি—কার জন্যে কী আনব গো? আমি বলব—আমার চাই একটা উড়ন্ত গালিচা···

—তার মানে?

—আব্বা একটা উড়ন্ত গালিচা আর সওদাগরের গল্প বলছিলেন। সেটায় মানুষ চাপলে আকাশে ওড়ে। তবু বড় দুরন্ত মেয়ে ছিল এই ঝুনঝুন। আরো একটু বড় হলে আমরা একইসঙ্গে মাইনর স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। তখনই আমাকে লুকিয়ে সিগ্রেট টানতে দেখে সে আমার আব্বাকে বলে দিয়েছিল। আব্বা প্রচণ্ড মেরেছিলেন আমাকে। মুখ শুঁকেছিলেন। পেয়ারাপাতা চিবিয়েও বুঝি গন্ধ যায় নি। আব্বা বলেছিলেন—যুগটা হ'ল কী! বারো বছর বয়সে সিগ্রেট টানতে শিখল!

পরে ঝুনঝুনকে একা পেয়ে মার লাগাতে গেলুম। ঝুনঝুন চোখ পাকিয়ে বলেছিল—বেশী বাঁদরাম করলে তোর সেই পোড়া সিগ্রেটটা দিয়ে আসব তোর আব্বাকে। এই বলে তার সুটকেশ থেকে কাগজে মোড়া সিগ্রেটের টুকরোটাও দেখিয়েছিল সে।

রাগে দুঃখে আমি প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়েছিলাম। তারপর যখন ভুবনপুর হাইস্কুলে চলে যাই, তখন ঝুনঝুনের পাঠ খতম। শুনলাম, তার বিয়ের আয়োজন চলেছে। আমার করে এলে কখন কেমন করে তাকে সিগ্রেটে দু'টি তিনটি টান দিতে অভ্যস্ত করলাম, আজ আর তা স্মরণ নেই। সে তখন বয়সের বিপুল চাপে কিছুটা শান্ত, আত্মসচেতন। তবু, তবে সেই যে আমার শাস্তি পেতে হয়েছিল, সেই দুঃখটা একদিন অনুভব করতে পেরেছে। তাই আমার কাছ থেকে সিগ্রেট

কেড়ে নিয়ে টান দিতে দিতে হাসির ছলে তার প্রাচীন অপরাধের শাস্তি নিচ্ছিল। প্রচন্ড কাসি হত, চোখ লাল হয়ে যেত, তবু টানা চাই। এমন কি আমার টেবিল থেকে নস্যির ডিবে নিয়ে নাকে নস্যি গুঁজতেও ব্যস্ত হত। বলতাম—তুই তো ভারী এচোঁড়ে পেকেছিস্ রে।

ঝুনঝুন বলত—তুমিই বা কী কম? বলেই জিভ কাটত সে।—এ-মা, রফিকে তুমি বললাম দেখছি। ঠিক আছে, তুমিও আমাকে তুমি বলবে। শোধ হয়ে যাবে।

আমি বলতাম—দায় পড়েছে। একটা কচি খুকীকে তুমি বলতে হবে।

অমনি ঝুনঝুন চোখ নাচিয়ে কেমন যেন অন্য রকম হেসে বলত—না গো মশাই, আর আমি কচি খুকী নই···

আত্মপ্রকাশের তীব্র ইচ্ছা তার মধ্যে কাজ করছিল। কিশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে হয়ত সব মেয়েই পুরুষের চোখ দিয়ে নিজেকে সনাক্ত করতে চায়। আমার চোখে স্পষ্টতা এনে, সেই স্পষ্ট দৃষ্টির ভিতর নিজেকে দেখা বা জানার ইচ্ছে ঝুনঝুনকে যেন মরিয়া করে তুলছিল। সে তার সম্মান পেতে চাচ্ছিল প্রথম আমার কাছ থেকেই।

একদিন ঝুনঝুনকে বলে ফেললাম—তোমার নাকি বিয়ে হচ্ছে শীগ্গীর?

ঝুনঝুন বলল—যাঃ! বিয়ের জন্য বসে আছি কি না! আমি কাকেও বিয়ে করব না।

—তোমার আব্বা কিন্তু ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন।

—ইস্, তোমাকে বলেছেন যেন।

গম্ভীর স্বরে বলেছিলাম—ঝুনঝুন, তুমি জানো না,—তোমার আব্বা আমার আব্বার কাছে কথা পেড়েছিলেন।

ঝুনঝুনের চোখে সেদিন কী ফুটেছিল, স্মরণ নেই বা ধরতে পারি নি; সে কী তীব্র প্রতিশ্রুতি? কোন মিষ্ট আকাঙ্খা? প্রবল প্রত্যাশা? সে লজ্জা দিয়ে নিজেকে লুকোতে চাচ্ছিল যেন। মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, থাম খুব হয়েছে। তোমাকে ইয়ে করার চেয়ে···

আমি বলেছিলাম—কিন্তু আব্বা জবাব দিয়েছেন। বলেছেন, মানানসই হবে না দুটিতে। বয়সের ফারাক খুবই কম। আর রফি আমার কচি ছেলে, সামনে ভবিষ্যত আছে। এখনই বিয়ে দিয়ে পড়াশোনা খতম করা যাবে না। তাকে কলকাতায় ডাক্তারী পড়তে পাঠাবার ইচ্ছে আছে···

কখন ঝুনঝুন নিঃশব্দে চলে গিয়েছে, দেখি নি। আমারও লজ্জা করছিল কথাটা সামনাসামনি বলতে। আমার চোখ ছিল ক্যালেন্ডারের দিকে।

তারপর সে কোনদিনই আসে নি আমার কাছে। আমাদের বাড়ি এলে বড় জোর মায়ের কাছে খানিক গল্প করে চলে গেছে। হয়ত অবহেলায় আমার ঘরের

দিকে দু'একবার তাকিয়েছে। আমার কষ্ট হত। কখন কেমন করে তার প্রতি অন্য ধরনের একটা ইচ্ছা লালিত হয়েছিল আমার মধ্যে, জানতাম। তখন দেখলাম, এতদিন নিভৃতে চুপিচুপি আমার সকল ইচ্ছা সকল কথা তাকে ঘিরেই স্পন্দিত হয়েছিল। তার অনুপস্থিতি আমাকে কী ভীষণ একা করে দিয়েছে।

আমি ঝুনঝুনদের বাড়ি খুবই কম যেতাম। বয়ঃপ্রাপ্তা ঝুনঝুনের উদ্দেশ্যে ও-বাড়ি যাওয়া আর সঙ্গত নয়, জানতাম। করিম খোনকার আব্বার কাছে ব্যর্থ হয়ে আমাদের পরিবারের উপর বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তার বৈষয়িক অবস্থাও খুব ভাল ছিল না। মেয়ের বিয়ে দিতে হলে যা যা দরকার তা ছিল না তাঁর অর্থাৎ ভালো জামাই পেতে হলে, ঘড়ি সাইকেল ইত্যাদি তো আছেই মুসলমান সমাজের ভদ্র বংশ বরপণের প্রথা দেশে তখন সোচ্চার।

তাই বছরের পর বছর গেল, ঝুনঝুনের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হল না। তবু ঝুন-ঝুন তার বাপকে লুকিয়ে আমাদের বাড়ি এসেছে। মায়ের কাছে বসেছে। মা—মা যেন বিরক্ত হয়েছেন তাতে। আড়ালে বলেছেন অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে, পর্দাছাড়া হয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। ওর বিয়ে হবে কেন? বেপর্দা বেশরম কোথাকার। বুড়ো বাপেরও চোখ নেই নাকি।

করিম খোনকারকে দেখতাম স্টেশনারী দোকান খুলেছেন হাটতলায়। বিমর্ষ কাকের মত বসে আছেন চুপচাপ। বেচাকেনার দিকে মনোযোগ নেই।

শহরের কলেজ থেকে ছুটি-ছাটায় বাড়ি ফিরে এই সব আমি লক্ষ্য করতাম আর দুঃখ হত। আমার বাল্যসঙ্গিনীর প্রতি সারা পৃথিবী যেন রুষ্ট—যেন আমিও। যেন আমারও মনে হত হতভাগিনী ঝুনঝুন কেন জন্ম নিয়েছিল দুনিয়ায়? ও সেই গাছ,—যার ফুল ফোটে, ফল ধরে, অবহেলায় সব ঝরে যায়, পাখি কীটপতঙ্গ কেউ ছোঁয় না—যেন বিষাক্ত। অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার। যে মানুষ স্টেশনে দাঁড়িয়ে আপ-ডাউন ট্রেন দেখে, কোথাও যাওয়া হয় না, তেমনি। ইচ্ছে করে; ডেকে বলি—তুমি কোথায় যাবে? কী তোমার ইচ্ছা?

আমার কাছে সে আসে না, তাই এই রকম লোভ যেন। এবং আস্তে আস্তে আমি মরিয়া হয়ে গেলাম। একদিন চিঠি লিখলাম—সেই প্রথম চিঠি। কে জানে, কেন এই চিঠি লেখার ইচ্ছে হ'ল। চিঠি লিখে আমার ছোট বোনকে দিয়ে পাঠালাম। সতর্ক করে দিলাম তাকে। চিঠিতে লেখা ছিল—খুবই দরকার। পীরের মাজারের ওদিকে দেখা করো। সন্ধ্যার পর।

তাকে আমার ঘরে ডাকতে পারতাম। আসতেও তার খুব একটা বাধা ছিল না। পাড়ার মেয়ে পাড়ার ছেলের ঘরে ঢুকে অনায়াসেই বলতে পারে—কবে এলে রফি ভাই, কেমন ছিলে? পড়াশোনা শেষ হতে কত বাকী?......সন্ধ্যার পর পীরের মাজারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তার পাত্তা পাই নি সেদিন। পরদিন সকালে

জবাব এল কিছু অল্পকথায় : কেন ? আমার কাছে এতদিন পরে কী দরকার রফি ? যদি কিছু থাকে, চিঠিতে লিখলেই পারতে। কিন্তু খোদার কসম, আর চিঠি লিখো না।

কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করতে না পেরে নীরব থাকলাম। প্রথম চিঠি ঝুনঝুনের ! স্বাক্ষরবিহীন চিঠি। সেবারেই কলেজের শেষ পরীক্ষা। তারপর ফিরে এলাম বাড়ি। এসে শুনলাম, এতদিনে ঝুনঝুনের বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছে কুতুবপুরে —পাশের গ্রামে। বর ? বরের বয়স চল্লিশের কাছে। তারও একটা ষ্টেশনারী দোকান আছে ছোট্ট রকম। গরীব মানুষ—ওই দিয়ে সংসার চালিয়ে নেয়। তা ঝুনঝুনের কপালে আপদ মন্দ জোটে নি। আগের পক্ষের গোটা দু'তিন কাচ্চাবাচ্চা রয়েছে। বেচারার হাড়মাস কালি করতে ওই যথেষ্ট।

অবশ্য এ-সবই পড়শীর মুখের খবর। সত্যিকার খবর নিতে আমি নিজেই চলে গেলাম একদিন কুতুবপুর। গ্রাম সম্পর্কে ঝুনঝুনের ভাই শুনে ওর স্বামী মনির হোসেন কুট[illegible] আনন্দে থৈ থৈ। লোকটি বেশ ভালোই। ঝুনঝুন সুখে আছে বলে মনে হল।

মনির হোসেন আমাকে সম্মানে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়েছিল। ছোট্ট ঘর, ছোট্ট উঠোন। তিনটি রোগাপটকা শিশু। সর্বত্র দারিদ্র্যের চিহ্ন আঁকা। তবু এর মধ্যে উঠোনে একটি কাঠমল্লিকার গাছ। গ্রীষ্মে ফুল ফুটেছে অজস্র। উঠোনের ধুলোয় ঝরছে থরেথরে। তার গন্ধে দ্রুত অকস্মাৎ আমার সারা ছেলেবেলা উজ্জ্বল হয়ে ফিরে এসেছিল। ঝুনঝুনও কি আমাকে দেখে সেই গন্ধে এবং দেখায় বিহ্বল হয়ে উঠেছিল ? তার চোখ ছলছল করছিল।

তারপর যা ঘটবার ঘটে গেছে। হঠকারীতা[illegible] তুড়ান্ত আবে[illegible] আমরা পথে বেরিয়ে পড়েছি। পাপ-পুণ্য ধর্মা-ধর্ম বেহেশত-দোজখের অতীতে কী এক দারুণ স্রোত আমাদের ভাসিয়ে আনল ; তার নাম ভালবাসা কিনা জানি না। আমি নিঃশব্দ হাতের মত গোপনে মনির হোসেনের সংসারের ফুলটিকে তুলে নিয়ে চলে আসছি। মাঝে মাঝে তাকে করতলে রেখে চেয়ে চেয়ে দেখছি আমারই রক্তের বন্যার আঁশটে গন্ধ গায়ে মেখে সেই ফুল আমারই মত নীরবে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে এসে গেছে এতক্ষণে। সিগ্রেট জ্বালবার জন্যে দাঁড়ালাম। ঝুন-ঝুন ফিস্‌ফিস্ করে বলল—ট্রাক আসছে। ওই দেখ। ট্রাকটা দাঁড় করাও, ওতে চেপে যাবো দু'জনে।

দূরে ট্রাকের আলো। একটু অস্বস্তি লা[illegible]ছিল। চেনা কেউ থাকবে না তো ?

ট্রাকটা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। [illegible] দু'টি আলোর শীষ একাকার হতে হতে ছড়িয়ে পড়েছে বিশাল প্রসারিত মাঠে। কেমন ভয় করতে লাগল। আমরা ধরা পড়ে

যাচ্ছি। অনন্তকাল ধরে আমাদের দু'টি পুরুষ-নারীকে—যুবক-যুবতীকে অমনি করে ধরে ফেলার আলোয় আটকে রাখা হবে। নিশুতি রাতে যারা ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিল, তারা পথের মাঝেই আটকে যাবে।

অল্প কিছু অবসর মাত্র। আমি হঠাৎ ঝুনঝুনকে তীব্রভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। চুম্বনে অস্থির করে তুললাম তার সারা মুখখানাকে। ভীতুর মত ক্লান্ত হাত তুলে ও মুখ ঢাকবার ভান করছিল। তারপর ব্যস্তভাবে বললাম—এস ওই ঝোপটার আড়ালে যাই। শীগ্‌গীর, দেরী করো না। এবং টানতে থাকলাম হাত ধরে।

হঠাৎ ঝুনঝুন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে বলল—না।

—কেন ?

—আমি কাকেও ভয় করিনে।

—ছিঃ ঝুনঝুন, লোকে কী ভাববে ?

—অত ভয় তো সঙ্গে না আনলেই পারতে। আমি যাই।

একটা ট্রাকের দু'টি চক্ষু এক ভয়ানক ভূমিকা নিতে পারে, আমি ভাবি নি। আসলে, আমরা অন্ধকার দেখে ভেবেছিলাম, আলোর কথা মনে ছিল না যেন।

—ঝুনঝুন,……

—আমি বুঝেছি।

—কী বুঝেছ ?

চারপাশ আবছায়াময় বিস্তৃতি। আর তার একটি কেন্দ্র হতে ধাবমান ওই তীব্র আলো আমাদের অবশ করে ফেলেছে ক্রমশ। প্রকাণ্ড এক আগ্রাসী আলোর সমুদ্র ছুটে আসছে। অন্ধকারের দুই অনুচর অস্থির হয়ে উঠছি যেন।

ফের বললাম—কী বুঝেছ ?

জবাব না দিয়ে ঝুনঝুন মাঠের দিকে নামছে। আশ্চর্য, আমার দেহকে টেনে তোলা যায় না, এত স্থির আর গুরুভার। পথিপার্শ্বের ফলকের মত প্রোথিত আমি। নিষ্পলক দেখছি, আবছায়াভরা ভৌতিক জ্যোৎস্নার মাঠে ঝুনঝুন ফিরে চলেছে। যেন কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ছুটির পালা। কিন্তু এতখানি পথ তাহলে ছুটে আসা কী জন্যে ? কী জন্যে চুপিচুপি লুকিয়ে পথে বেরিয়ে পড়া ? হয় তো ওই অব্দি খানিক ভালবাসার সুখের কামনা ছিল, মিটতেই সে তৃপ্ত। আর আমি ?…হঠাৎ ট্রাকের আলো দেখে কী গুরুতর ভয়ে কেঁপে উঠলাম! কিংবা আমারও দীর্ঘলালিত কামনা এইটুকু কাজের পর, ভালোবাসার মেয়েকে পথে আনবার সাধ মিটিয়েই তৃপ্ত! আমরা কেউ কাকেও হয়তো চিরকালের মত চাই নি। চাইলে এমন হত না। দু'টি চলমান আলোকবিন্দু যেন আমাদের উভয়ের দু'টি সত্তা—হঠাৎ পথের উপর এগিয়ে এসে নামিয়ে দিল চলা।

আমি বুঝতে পারলাম, পীরের মাজারে যে খেলা কোনদিন হয় নি, সেই চূড়ান্ত

খেলা—খেলাঘরের বিচিত্র অভিনয়টা এতদিনে কে চুকিয়ে নিল দু'জনকে দিয়ে। এবার পরস্পরকে নিঃসন্দেহে ভুলে যেতে পারব। কেউ কারুর জন্য ভাবব না। এবার আমাদের আপদ গুরুমশাই ভালবাসার ছুটি দিয়েছে দু'জনকে।

ট্রাকটা কাছে এলে হাত তুললাম। দাঁড়াল। কে ভিতর থেকে বলল—লাস্ট বাস ফেল করেছেন বুঝি? কোথায় যাবেন?

—বহরমপুর।

—চলে আসুন।

প্রান্তরে ঝুনঝুন বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায় স্বামীর কাছে ফিরে যেতে যেতে দেখছে কি না, কে জানে।

—নমস্কার। বলুন তো আমি কে?

পুলকেশ চমকে উঠেছিল। শিহরিত বলা যায়। কোন মহিলাকে সে তার এই ডিরেকট নামবার দিয়েছে বলে মনে পড়ছে না। তাছাড়া এমন চটুল প্রশ্ন করার মতো কাকেও তো নয়। কণ্ঠস্বরও চেনা বলে মনে হচ্ছে না। একটু বিব্রত বোধ করল সে। বলল—মানে…ঠিক…কথা আটকে গেল চাপা হাসির শব্দে। —পারলেন না তো?

পুলকেশ আস্তে বলল—না।

—সে কী! সেদিন যে অমন করে বললেন, আপনার কণ্ঠস্বরে কী যেন আছে—সামথিং আনফরগেটেবল! তারপর পুনর্জন্মবাদ নিয়ে কীসব বিগ-বিগ থিওরি শোনালেন!

মুহূর্তে পুলকেশ হেসে উঠল! —হুঁ, চিনেছি।

—রিয়্যালি? ফের আবছা চটুল হাসি।

তারপর—যাক গে। খুব ব্যস্ত বুঝি?

—স্বাভাবিক। এখন তো আপিস করছি।

—তাহলে ছাড়ি।

পুলকেশ ব্যস্তভাবে বলল—না, না। ব্যস্ততা কিছু নেই। বলুন, কেমন আছেন?

—এই পাঁচদিনে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

পুলকেশ হাসতে হাসতে বলল—আপনার মতো স্মার্ট কথাবার্তা বলার ক্ষমতা আমার নেই। হার মানছি। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষে আমি আপনাদের সম্পর্কে ঈষৎ ভীত বোধ করি।

—তাই কি আর এলেন না?

—যাব। আদিত্য কোথায়?

—পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

—আমি ভাবছিলুম ছবি আঁকছে। ওকে বলুন, এখন যেভাবে ফোন করছেন, ঠিক এই ভঙ্গীতে আপনার একটা স্কেচ এঁকে রাখুক। গিয়ে দেখবোখন।

—বলুন তো কী ভঙ্গীতে ফোন করছি?

—হুঁউ, বলছি। আপনি এক্ষুনি স্নান করেছেন। চুলগুলো রাতের ঝর্ণার মতো দেখাচ্ছে। আপনার কপালে লাল টিপ। সেই ঝর্ণার ওপরে সূর্যোদয়ের মতো। আপনি একটা হাল্কা বা ফিকে নীল ভয়েলের শাড়ি পরেছেন—এবং…

—কিচ্ছু মিলল না।

—সে কী?

—আপনি বুঝি ফিকে নীল রং ভালবাসেন?

—কে জানে। মনে হল আপনাকে দেখতে পাচ্ছি।

—আপনার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করা যায়। দৃষ্টিশক্তির নয়। যাক গে, আপনি আসবেন বলেছিলেন—তারপর পাঁচদিন কেটে গেল। তাই স্মরণ করিয়ে দিলুম। ছাড়ি।

—আদিত্যকে দিন। কথা বলব।

—আপনার বন্ধু এখন কথা বলবেন না।

—তার মানে ও নেই।…হ্যালো হ্যালো হ্যালো।

লাইনটা কেটে গেল। ফোন রাখবার শব্দ শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত রিসিভারটা হাতে রাখার পর অন্যমনস্কভাবে ছেড়ে দিল পুলকেশ। সশব্দে প্রায় আছাড় খেল রিসিভারটা।

সে একটা সিগারেট ধরাল। আদিত্যের বউয়ের মাথায় কি ছিট আছে? আলাপের দিন তেমন কিছু তো মনে হয়নি! একটু চঞ্চল প্রকৃতির মহিলা বলা যায়। মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে যায় ভীষণ। তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে। যত কথা বলে, তার বেশি ঠোঁটের কোণায় চেপে রাখতে জানে। আকর্ষণ করার ক্ষমতাও হয়তো অপরিসীম। এই যে পাঁচদিন পুলকেশ যাব-যাব করেও যায়নি, তার কারণ সে নিজের মনের জোরটা পরীক্ষা করছিল। তাছাড়া আদিত্য হয়তো কিছু ভেবে বসবে, সুন্দরী বউ থাকলে অসুন্দর লোকেরা যেমনটি ভাবে—পুলকেশ এটুকু মনে রেখেছিল।

আদিত্য দেখতে শুধু ওর বউয়ের তুলনায় নয়—গড়পড়তা বাঙালীর চেয়ে একটু অন্যরকম। বন্ধু এবং খ্যাতিমান ছবি আঁকিয়ে না হলে অনায়াসে ওকে কুৎসিত বলতে দ্বিধা ছিল না পুলকেশের। থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, চওড়া কপাল এবং মাথার তুলনায় শরীরটা রোগা—এই আদিত্য গোঁফ-দাড়িতে নিজের চেহারাকে আরও বিকট করে তুলেছে। ওর চামড়ার রং ঘোর কালো। ছেলেবেলায় বন্ধুরা ওকে 'নিগ্রোবটু' বলে ঠাট্টা করত। আদিত্য কিন্তু তাতে একটুও রাগ করত না। বরাবর ও কেমন নির্বিকার এবং নিস্পৃহ। ছবি আঁকা ছাড়া জীবনে আর কোন ব্যাপারে ওকে উৎসাহী হতে দেখা যায়নি।

মধ্যে ক'বছর দেরাদুন আর্ট কলেজে চাকরি নিয়ে কাটিয়েছে আদিত্য। বিদেশে কয়েকবার একজিবিশনও করে এসেছে নিজের ছবির। প্রশংসা কুড়িয়েছে প্রচুর।

সম্প্রতি কলকাতা ফিরেছে। আর দেরাদুনে যাচ্ছে না। বিয়ে করেছে দিল্লিতে প্রবাসী বাঙালী পরিবারে। বলছিল, আপাতত কিছু কমার্শিয়াল কাজকর্ম করে রুজিরোজগার চালাব ভেবেছি। মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ আর্টের দু-একটা একজিবিশন করব। কিছু ছবি তো রেগুলার বিক্রি হবে। তাতেই মোটামুটি চলে যাবে।...

পুলকেশ অন্যমনস্কভাবে বেয়ারাকে ডেকে বলল—জল দাও।

বেশ বোঝা গেল, আদিত্য ঘরে ছিল না। কেয়া একা ছিল। একা থাকার সময় হঠাৎ আজ কেয়ার পুলকেশকে ডাকার তাগিদ জেগে উঠেছিল। কেন? পুলকেশ টের পেল, একটা চাঞ্চল্য জাগছে তার মনে। গলা শুকনো লাগছে। এটা শীতকাল। এই সময়টা সে জল এত বেশি খায় না। অথচ পুরো গ্লাসটা ফুরিয়ে গেল।

ফাইলে কেয়া ফুটে উঠছে টের পেয়ে পুলকেশ বিব্রত বোধ করল। নাঃ, সব কাজ পণ্ড করে দিল আদিত্যের বউ! পুলকেশের মনে হল, আচ্ছা—সে যদি বলত, এখনই যাচ্ছে। অবশ্য বলার সুযোগ পেল কই? হঠাৎ ফোনটা ছেড়ে দিল। নাকি ওইসময় আদিত্য দরজায় ঘণ্টা বাজাচ্ছিল? আদিত্য মধ্য কলকাতার একটা বড় বাড়িতে ফ্ল্যাট নিয়েছে। একটা বিশাল ঘরে ওর স্টুডিও। অজস্র ক্যানভাস শোয়া বা দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছে। অনেকগুলোই অসমাপ্ত। ইজেলে আঁটা ক্যানভাসটা পর্দাঢাকা। কৌতূহল হয়েছিল পুলকেশের। কিন্তু জানবার সুযোগ পায়নি। ছবিটা কি কেয়ার?

হঠাৎ চমকে উঠল পুলকেশ। আদিত্যের ছবির একমাত্র বিষয়বস্তু শরীর—মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর এ্যানাটমিকে ভাঙচুর করে সে দেখায়। হঠাৎ দেখলে ধরা যায় না। মনে হয়, চাপচাপ রঙ, আঁটোসাটো আয়তনে ঠাসা, জ্যামিতিক বিন্যাসে গাঁথা। কেন শরীরকে এভাবে দেখে সে? নিজের চেহারা নিয়ে নিশ্চয় একটা হীনমন্যতা আছে ওর মনে।

আছে ওর মনে।

ঠাট্টা করে ওকে জিগ্যেস করেছিল পুলকেশ—মডেল মেয়েকেই শেষে বিয়ে করে বসিসনি তো?

আদিত্য বলেছিল—কেয়াকেই জিগ্যেস কর।

কেয়া তা শুনে বাঁকা হেসে বলেছিল—আমার সে যোগ্যতা আছে নাকি? আপনার বন্ধুকে ভাবছেন ভীষণ মডার্ন—প্রগ্রেসিভ। কিন্তু ঘরে খুঁজেও আমার একটা প্রতিকৃতিও পাবেন না।

তখন আদিত্য সকৌতুকে বলেছিল—ওই যে দেখছ, ওটাই কিন্তু তোমার ফুসফুস। আমি পুরোপুরি কিছু আঁকি না—টুকরো নিয়েই কারবার।...

বেয়ারা এল।—বড় সাব্ সেলাম ভেজা, সাব।

মিঃ মালহোত্রার তলব। পুলকেশ তক্ষুনি আদিত্য ও কেয়াকে ভুলে ঝটপট

উঠে পড়ে।...

তবু যেতে পারল না পুলকেশ। কোথায় একটা প্রচণ্ড দ্বিধা থেকে যাচ্ছিল। প্রতিদিনই আশা করছিল, কেয়া আবার তাকে ফোন করবে এবং তখন সে যাবার সময়টা জানিয়ে দেবে। কিন্তু কেয়া আর ফোন করছে না। একদিন আদিত্যের সঙ্গে দেখা হল রাস্তায়। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ট্যাকসি ডাকছিল। পুলকেশ গাড়ি থামিয়ে বলল—কী ব্যাপার? অত ছোটাছুটি করে কোথায় যাবি?

আদিত্য ওকে দেখে দাঁড়াল। হেসে বলল—তোর যে আর পাত্তা নেই। একদিন আয়।

—যাব। তোর খবর কী?

—মোটামুটি। একটা একজিবিশন করছি।

—কোথায় যাবি এখন?

—হাজরায়। এ্যাপয়েণ্টমেণ্টের সময় চলে যাচ্ছে, ট্যাকসি নেই। কোন মানে হয় না!

—উঠে পড়; পেঁৗছে দিয়ে আসি।

আদিত্য কাঁচুমাচু হাসল।—কিন্তু তোর তো এখন আফিসের সময়!

—তাতে কী? আয়।

আদিত্য গাড়িতে উঠল। একটু এগোতেই ট্রাফিক সিগনালের জন্যে দাঁড়াতে হল।

পুলকেশ হেসে বলল—খুব চুপচাপ যে? ভীষণ জরুরী কিছু?

আদিত্য বলল—নাঃ! মানে ভাবছি, ভদ্রলোক যা বিজি! গিয়ে হয়তো দেখব, নেই। এবং মিছিমিছি তোকে কষ্ট দেওয়া হবে।

পুলকেশ সামনে তাকিয়ে বলল—এমনি ঘুরতে আমার খারাপ লাগে না।

ট্রাফিক সিগনাল পাওয়ার পর গাড়ি আবার চলতে থাকল। আদিত্য বলল—শিগ্গির একদিন আয়। সন্ধ্যার দিকে এলেই ভাল হয়। কিন্তু একটা ফোন করে আসবি। আমি না থাকলেও কেয়া তো থাকবেই। হ্যাঁ, কেয়া কাল তোর কথা জিগ্যেস করছিল।

—তাই বুঝি?

—ওই যে তুই ওকে বলেছিস, আপনাকে খুব চেনা লাগছে! এটা ওকে ইমপ্রেস করেছে। কিন্তু ও তো ভালই জানে, তোর পক্ষে ওকে চেনার চান্স শয়ে এক। কারণ, ও দিল্লির যে এলাকার মেয়ে, সেখানে কোন ভদ্রলোক...

হঠাৎ আদিত্য থেমে গেল। যেন মুখ ফসকে কী গোপন তথ্য ফাঁস করে ফেলছিল। পুলকেশ তাকালে সে একটু হেসে ফের বলল—রিয়্যালি! যাকে বলে পাণ্ডব বর্জিত জায়গা—মানে বাঙালীবর্জিত আর কী। ওখানে যে একটা বাঙালী ফ্যামিলি আছে, কেউ বিশ্বাসই করবে না!

—তুই আবিষ্কার করেছিলি, বল ?

—একজ্যাক্টলি ! ওখানে একদিন কিছু কাশ্মীরী ছাগলের স্কেচ করতে গেলুম। শুনেছিলুম, কাশ্মীরী ছাগল ওখানে লোকেরা পোষে। গিয়ে কেয়ার সঙ্গে আলাপ। পূর্ববঙ্গের মেয়ে। দাদার কাছে মানুষ হয়েছে। তারপর···আদিত্য হঠাৎ থামল।

বাইরে তাকিয়ে সে বলল—এক মিনিট। সময় চলে গেছে। হাজরায় আর গিয়ে লাভ নেই। তুই এখানেই নামিয়ে দে। এখানে কাছেই এক ভদ্রলোক থাকেন। তাঁর সঙ্গেও দেখা করার দরকার ছিল। জাস্ট এক্ষুনি মনে পড়ল।

পুলকেশ গাড়ি দাঁড় করাল।—এখানেই নামবি ?

—হ্যাঁ। তোকে অনেক কষ্ট দিলুম মিছিমিছি। চলি। আসিস একদিন।

আদিত্য চলে গেল। পুলকেশ চুপচাপ বসে ওর চলে যাওয়া দেখতে থাকল। বড় বড় পা ফেলে আদিত্য পাশের রাস্তায় গিয়ে ঢুকছে। গায়ে লাল পানজাবি, পরনে কালো পাতলুন—কাঁধে ব্যাগ। মাথাটা ওর বিশাল চুলের জন্য বিকট দেখাচ্ছে। পুলকেশ সিগারেট ধরাল। তারপর ঘড়ি দেখল। মিনিট দশেক লেট হবে মাত্র। সে আস্তে আস্তে গাড়ি স্টার্ট দিল। ঘোরাল। তারপর কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ যেন প্রচণ্ড আবেগেই ডান দিকের রাস্তায় গিয়ে ঢুকল।

তারপর এরাস্তা-ওরাস্তা ঘুরে যখন আদিত্যের ফ্ল্যাট বাড়িটার কাছে পৌঁছাল, দ্বিধায় পড়ে গেল। এটা উচিত হচ্ছে না। আদিত্য হঠাৎ ফিরে আসতে পারে। না এলেও কেয়া তাকে জানাবে, পুলকেশ এসেছিল সওয়া দশটার সময়। এবং সে একটা বিশ্রী ব্যাপারই হবে। ছিঃ! আদিত্য তাকে কী ভাববে !

পুলকেশ গাড়ি থামিয়েছিল গেটের সামনে। তার গাড়ি ভেতরে ঢুকবে ভেবে দারোয়ান টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

পুলকেশ জোরে বেরিয়ে গেল। তারপর এরাস্তা-ওরাস্তা ঘুরে যখন চৌরঙ্গীর ভিড়ে গিয়ে ঢুকল, মনে হল একটা দারুণ হঠকারী পাপ থেকে সে বেঁচে ফিরতে পেরেছে। কিন্তু তার পা দুটো তখন কাঁপছে। গলা শুকনো লাগছে।···

আপিসে নিজের চেম্বারে বসে আগে জল খেল সে। সিগ্রেট ধরাল। তারপর ধীরে সুস্থে ফোনের রিসিভার তুলল। আস্তে আস্তে ডায়াল করতে থাকল। একটু পরে সাড়া এল—হ্যালো ! কাকে চান ?

পুলকেশ সোজা বলে দিল—আপনাকে। ভেবেছিল, কোন মহিলাকে এভাবে বললে নিশ্চয় অফেন্স নেবে। কিন্তু কেয়ার হাসির শব্দ ভেসে এল। ও! পুলকেশবাবু।

—অন্য কেউ হতে পারতুম। কীভাবে বুঝলেন ?

—বোঝা যায়। মেয়েদের ইনটুইশান বলতে পারেন। যাক গে, কই—এলেন না ?

—গিয়েছিলুম।

—গিয়েছিলুম মানে ? কবে ? কখন ? আমি ছিলুম না ?

—আজই। জাস্ট মিনিট সতের আগে।

—সে কী ! আমি তো আছি। যাঃ ! মিথ্যে বলছেন।

—মিথ্যে বলার অভ্যেস নেই। দরকার হয় না।

কেয়া ব্যস্তভাবে বলল—পাজলিং ! অসম্ভব। হতেই পারে না।

—হয়তো পারে। আমি আপনাদের গেটের পাশ দিয়ে আপিসে এলাম।

—তাই বলুন। তাহলে গিয়েছিলুম বলছেন কেন ? যাঃ ! আপনি অদ্ভুত মানুষ !

—রাস্তায় আজ হঠাৎ আদিত্যের সঙ্গে দেখা হল। ওকে একটা লিফট দিলুম এলগিন রোড অব্দি। তারপর আপনাদের বাড়ির সামনে দিয়ে আপিসে এসেছি।

—আশ্চর্য ! আপনি একবার নক করে এলেও পারতেন। আমি তো ছিলুম।

—পারিনি।

—আপনার বন্ধুর কথা ভেবে, এই তো ? জানেন—আপনার এই ব্যাপারটার মধ্যে সরলতা টের পাচ্ছি না কিন্তু।

—আমাকে তিরস্কার করুন।

—অধিকার নেই।

—আচ্ছা কেয়া, হঠাৎ এভাবে গিয়ে পড়লে—মানে এই অসময়ে এবং আদিত্যকে অন্যত্র দেখে আসার পর—আপনি কি বিব্রত বোধ করতেন ?

—নিশ্চয় করতুম না। কিন্তু গিয়ে পড়েননি বলেই করছি।

ও, সরি। ভেরি সরি।...হ্যালো ! হ্যালো !

—বলুন। আছি।

—দেখতে পাচ্ছি, আপনি ক্রুদ্ধ। ঠোঁটে চিবুকে এই শীতেও ঘামের ফোঁটা জমেছে। আপনার চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে—ভীষণ আগুনের মতো, আই মিন এ ব্ল্যাক ফায়ার ! এবং...

কেয়ার হাসির শব্দ ভেসে এল।—বলে যান, শুনছি।

—আশ্বস্ত হলুম।

—আমাকে আপনি কি ভয় করেন ? রিয়েলি ?

—একথা কেন ?

পুলকেশ দুম করে বলে দিল—কবিরা অনেকের চোখে নিজের দারুণ সর্বনাশ দেখেন, জানেন তো ? অবশ্য আমি কবি নই। কিন্তু অনেকের সঙ্গে পরিচয়ের পর কবি ভাবতে ইচ্ছে করে নিজেকে।

—আপনার সর্বনাশ করার ক্ষমতা কোথায় ? কেয়ার এই কথাটা যেন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হল।

—সামনাসামনি মুখোমুখি অনেক কিছু বলা যায় না। দূরে থেকে বলা যায়।

পুলকেশ শান্তভাবে বলতে থাকল।—অনেক সময় কী হয় জানেন? দূরের হ্যালু-সিনেশান অনেক ক্ষতি করে। না, না—বলছি না, আমার কোন ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু এসবই তো হ্যালুসিনেশান! রজ্জুতে সর্পভ্রম!

—আমি সাধারণ মেয়ে। অত তত্ত্বটা মাথায় ঢোকে না। অতএব ভাবনাও ভাবি না। যাক গে, একদিন আসুন।

—ঠিক আছে। আগামীকাল সকালে, ধরুন সাড়ে নটা নাগাদ।

—অপেক্ষা করব কিন্তু।

—হ্যাঁ যাব····

পুলকেশ ফোন রাখল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো একটা ক্লান্তি ও আরাম তাকে পেয়ে বসল। দুর্বলতাটা কোথাও এখনও রয়ে গেছে শরীরের মধ্যে আনাচে কানাচে। সে হাই তুলল। আড়ামোড়া দিল। জল খেল। তারপর ফাইল খুলল।

সেদিনই আপিস থেকে ফেরার সময় মেট্রোর কাছে পুলকেশ আদিত্যকে আবার দেখতে পেল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একবার ভাবল, ডাকবে না—আবার ভাবল, কাল সকালে ওর ওখানে যাচ্ছে, ও থাকছে কিনা জেনে নেওয়া যাক। গাড়িটা ফুট-পাত ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে পুলকেশ ডাকল—আদিত্য!

আদিত্য এগিয়ে এল। কী ব্যাপার? ছবি দেখবি নাকি?

—নাঃ, তোকে দেখে দাঁড়ালুম। তুই কি ছবি দেখবি নাকি?

—হ্যাঃ আর বলিস নে! আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না ছবিটবি দেখার। কেয়ার ইন্টারেস্টে। ও এসে যাবে এক্ষুনি।

পুলকেশ হাসল। বউ তাহলে লেজ ধরে ঘোরাচ্ছে তোকে। তুই তো হিন্দি ছবি দেখিস না!

আদিত্যও হাসল। নাঃ! মানে, হাতে সময় ছিল তাই। নয়তো ওকে একা আসতে বলতুম। বাইদা-বাই, তোকে তখন বলব ভাবছিলাম, তারপর ভুলেই গেলুম ···বলে আদিত্য গাড়ির জানলায় ঝুঁকে এল। চাপা হেসে বলল—ইয়ে, মানে কেয়ার বাচ্চাটাচ্চা হবে। এ সময় ওকে চাঙ্গা মুডে রাখা দরকার। এদিকে আমার তো সময়ই থাকে না। ও ভীষণ একা বোধ করে। তাই আজকাল ছবিটবি দেখতে সঙ্গ দিই! একদিন বরং তিনজনে···

পুলকেশ বলল—চলি। ট্রাফিক সিগনাল! সে বেরিয়ে গেল। ভিড়ে ঢুকল। মোড় পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ টের পেল, মনের মধ্যে চাপা একটা রাগ ফুঁসছে। কার ওপর রাগ, আদিত্যের ওপরই কি? ঠোঁট কামড়ে সে স্পিড বাড়াল। স্কাউনড্রেল! আর্টিস্ট না ফাটকাবাজ! বউয়ের বাচ্চা হবে, তাই তাকে হিন্দি ফিলম দেখাবে এবং তার জন্যে অপেক্ষা করছে! এই হ্যাংলা আটপৌরে আচরণ আর্টিস্টের নয়—ছাপোষা গেরস্থের!

পরদিন আপিসে পুলকেশ ফাইলে নোট লিখছে। ফোন বাজল। ফাইলে দৃষ্টি রেখেই সে রিসিভার তুলে কেজো গলায় বলল—ব্যানার্জি বলছি।

হ্যাঁ, তার প্রাইভেট ফোনের রিসিভার তার হাতে। কিন্তু ওপক্ষে কোন সাড়া নেই। বিরক্ত হয়ে সে বলল—হ্যালো! ব্যানার্জি বলছি।

—আপনি এলেন না। অপেক্ষা করছিলুম।

—ভেরি সরি। আমার হঠাৎ একটা···

—বাজে কথা। আমাকে কেন আপনি এত ভয় পান, বলুন তো?

—ভয় পাবার কী আছে!

—হঠাৎ আপনাকে খুব···এলার্ট মনে হচ্ছে।

—তাই কি?

—হ্যাঁ। সেজন্যেই আপনার আসার দরকার ছিল।

হঠাৎ পুলকেশ টের পেল, কেয়ার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক নয়। খুব বৃষ্টির পর গাছ থেকে ফোঁটা ঝরে পড়ার শব্দ ওর কথায়। পুলকেশ বলল—আপনার কি শরীর ভাল নেই?

—আপনিও কি আপনার বন্ধুর মতো সবার শরীর নিয়ে ব্যস্ত?

—কথাটা খুব রূঢ় শোনাল, কেয়া।

—ক্ষমা করবেন।

—কে কাকে ক্ষমা করে। যাক গে, আদিত্য কোথায়?

—পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

—নেই। আমি দেখছি না।

—দেখছেন। সব সময় ওকে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। কী? ঠিক বলছি না?

—হয়তো তা স্বাভাবিক।

—সেজন্যেই আমার মুখোমুখি হবার সাহস পান না।

পুলকেশ হেসে উঠল।—আপনার ফেমিনিন লজিক অবশ্য অন্য রকম। যাক গে, এখন যাব?

—বেশ তো সাহস থাকলে আসুন।

—যেন ডুয়েল লড়ার কল দিচ্ছেন!

—দিচ্ছি।

ফোন রাখার শব্দ হল। পুলকেশ গুম হয়ে ভাবতে থাকল। যাবে একবার? কোথাও একটা গুরুতর সম্পর্ক যেন প্রথম দিনেই গড়ে উঠেছিল কেয়ার সঙ্গে সেটা ক্রমশ অকারণে জটিল হয়ে গেছে। একটা বোঝাপড়া করা অবশ্যই দরকার। নৈলে সে নিজেও সারাক্ষণ ভুগবে।···

একটু পরে সে বেরিয়ে পড়ে। শেক্সপিয়র সরণীর সেই বাড়ির গেট খুলে দেয়

দারোয়ান। গাড়ি লনে রেখে সে আস্তে আস্তে পা ফেলে এগোয়।

লিফটে পাঁচ তলায় উঠে সে আদিত্যের ঘরের সামনে দাঁড়ায়। বুকটা একবার কাঁপে। সাদা বোতামটা টেপে। একবার টিপে অপেক্ষা করে দীর্ঘ এক মিনিট। দ্বিতীয় বার টেপে। আবার একটা অথবা দুটো মিনিট কেটে যায়। তৃতীয় বার টেপে। তবু কোন সাড়া নেই।

তখন পর্দা তুলেই দেখে দরজায় তালা ঝুলছে।

মুখের চামড়া কালো হয়ে যায় পুলকেশের। আস্তে আস্তে লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আশি বছরের বৃদ্ধের শরীর নিয়ে ফিরে আসে সে।...